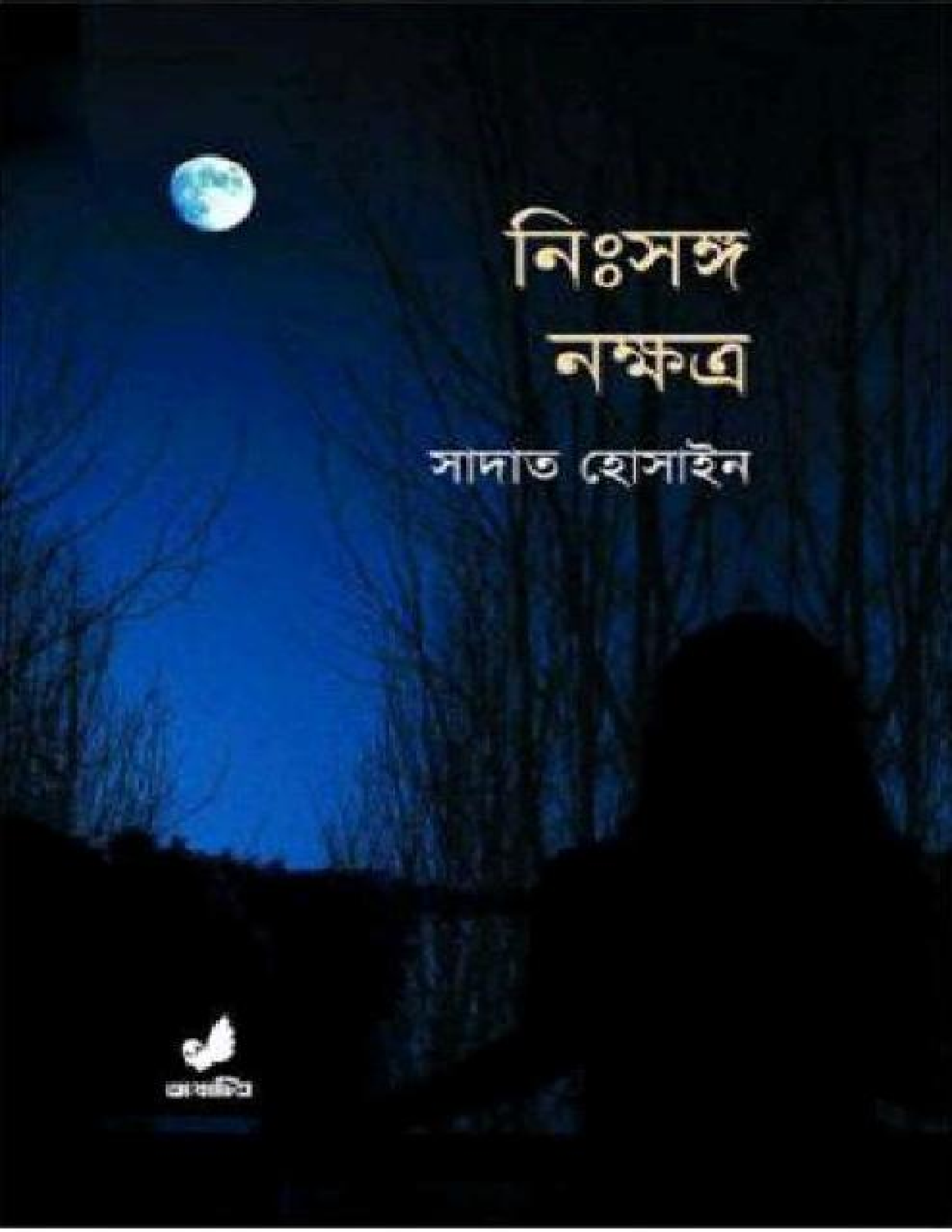

নিঃসঙ্গ
নক্ষত্র
সাদাত হোসাইন

নিঃসঙ্গ নক্ষত্র

১

উৎসর্গ

নুসরাত
চোখের ভেতর মন দেখতে মনের আলো লাগে

এই জগতে সেই ক্ষমতা সবার থাকে না, কারো কারো থাকে
কিংবা শুধু কোনো একজনেরই।

ভূমিকা

এই ঘটনা সত্য, না মিথ্যা?

মিথ্যা।

মিথ্যা ঘটনা লিখেছেন কেন?

সরি, এটা আসলে সত্য ঘটনা।

সত্য ঘটনা এমন হয়? এমন কেন?

এই প্রশ্নে আমি চুপ করে থাকি, আমার কষ্ট হয়। আসলেই কী জীবন এমন? হয়তো এমনই, হয়তো এমন নয়। তবে আমি সবসময়ই বলি, জীবনে যেমন গল্প থাকে, তেমনি গল্পেও থাকে জীবন। সেই সব গল্পের কতটুকুই আমাদের জানা থাকে? আমরা কতজন কত কত নিঃসঙ্গ দিন-রাত্রির গল্প বুকে পুষে কাটিয়ে দেই একাকি জীবন, সেই জীবনের খবর কে রাখে? হয়তো সেই নিঃসঙ্গ মানুষটি ছাড়া আর কেউ-ই না।

নিঃসঙ্গ নক্ষত্র তেমনি গল্প কিংবা জীবন। এই গল্পটা কী কোথাও শুনেছি আমি? আমার ধারণা আমি শুনেছি। গল্পের মেয়েটার মুখ থেকেই শুনেছি এবং মেয়েটিকে চিনিও আমি। কিন্তু গল্পটা কী একটু অন্য রকম হয়ে গেল? না-কি আরো খানিকটা অন্যরকম হতে পারতো? অনু কী জানতে পারতো না, জীবন কেবল এমন নয়, জীবন হতে পারে আরো অন্যরকমও?

কলম অবশ্য বলে গেল, কেউ জানে না জীবন কেমন, জীবনের রকম কী! তা কেবল জীবনই জানে। তাই সে লিখে গেল জীবন। সেই জীবন সত্য না মিথ্যা, তা ধরতে পারে সাধ্য কার!

নিঃসঙ্গ নক্ষত্র সেই সত্য-মিথ্যার জীবন।

সাদাত হোসাইন
১৩ জানুয়ারি ২০১৩

*

মাগরিবের আজান হচ্ছে।

অনু দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। এই বারান্দায় সে সাধারণত আসে না। এলেই এক ধরনের গা ঘিনঘিনে বিদঘুটে অনুভূতি হয় তার। এই অনুভূতির কারণ পাশের বাসার খোলা জানালাটা। জানালার সাদা ফিনফিনে পাতলা পর্দাটা মৃদু হাওয়ায় কাঁপছে। পর্দার ওপাশে একজোড়া টকটকে লাল চোখ। অন্য কোনো সময় হলে অনু এখানে এক মুহূর্তও দাঁড়াতো না। কিন্তু আজ সে দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে আছে, এবং অদ্ভুত ব্যাপার হলো তার ভাবনায় এসব কিছুই নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাগরিবের আজান শেষ হবে। অনু জানে, রোজকার মতো আজান শেষ হবার সাথে সাথেই আজও দুটি ঘটনা ঘটবে। প্রথমত ইলেক্ট্রিসিটি চলে যাবে। তারপর, তার মা সালমা বেগম একঘেয়ে গলায় চিৎকার করে বলতে থাকবেন, এই ঘরে আয় উন্নতি হবে না। এই আমি বলে দিলাম, এই ঘরে আয় উন্নতি হবে না। আয় উন্নতি হবে কেমনে? যেই ঘরে নামাজ নাই, রোজা নাই, সন্ধ্যাবেলা কেউ ঘরে বাতি পর্যন্ত দেয় না, সেই ঘরে আয় উন্নতি হবে কেমনে? হবে না।

সন্ধ্যাবেলা ঘর অন্ধকার থাকা সালমা বেগমের পছন্দ নয়। এই নিয়ে তিনি প্রতি সন্ধ্যায় চেঁচামচি করেন। সেই চেঁচামেচি অবশ্য অনু রোজ শুনতে পায় না। শুক্রবার বাদে সপ্তাহের অন্য দিনগুলোয় এই সময়টাতে সে থাকে অফিসে। ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়। বাড়িতে থাকে তার ছোট ভাই অয়ন আর মেজো বোন তনু। অনুরা তিন বোন, এক ভাই। অনু সবার বড়। ছোট দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট বোন বেনু থাকে তার শ্বশুরবাড়ি মাদারীপুরে। মেজো বোন তনুর প্রথম বাচ্চা হয়েছে বলে সে আছে মায়ের বাসায়।

সবার ছোট অয়ন। অয়নের সামনে এইচএসসি পরীক্ষা। কোচিং শেষ করে বাসায় ফিরতে ফিরতে তার সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। এই সন্ধ্যাবেলাটা তাই ভাই বোনদের মধ্যে একমাত্র তনুই বাসায় থাকে। ফলে মায়ের বকুনির বেশিরভাগই শুনতে হয় তাকে একা। তনুর কোলে তার তিন মাস বয়সের মেয়ে হাফসা। এই মেয়েকে নিয়ে তার আনন্দের চেয়ে দুঃখের গল্প বেশি। সেই দুঃখের গল্পে মায়ের এই রোজ সন্ধ্যাবেলার ঝড়ঝাপ্টা যেন একটু বেশিই কাঁটা হয়ে বেঁধে।

সন্ধ্যার অন্ধকার এখনো গাঢ় হয়নি। তবে যে-কোনো সময় ঝুপ করে নেমে আসবে। অনুর উচিত এখনই ভেতরে চলে যাওয়া। এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা তার মোটেই ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু তারপরও অনু দাঁড়িয়ে আছে। কারণ আজ তার কোনো বোধবুদ্ধি কাজ করছে না। তার মনে হচ্ছে, জগতের কোনো কিছুতেই আর কিছু যায় আসে না।

অনুর ঠিক সামনেই সরু গলির মাঝ বরাবর আড়াআড়ি চলে গেছে একজোড়া ইলেক্ট্রিকের তার। সেখানে মুখোমুখি দুটি কাক বসা। যেন সন্ধ্যা নামার আগে দিনের সব হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে নিতে চাইছে তারা। কিন্তু কোনো এক রহস্যময় কারণে তাদের সেই হিসেব মিলছে না। অনু কি তাদের দেখছিল? সে জানে না। তবে হঠাৎ অন্য একটা কাক এসে কাক দুটোর মাঝখানে থপ শব্দে বসে পড়তেই যেন সম্বিৎ ফিরল অনুর। ইলেক্ট্রিকের তারটি প্রচণ্ড গতিতে দুলে উঠতেই ভারসাম্য হারিয়ে উড়ে গেল তিনটি কাক। অনু এতক্ষণে খেয়াল করলো, আজান শেষ হয়েছে। ইলেক্ট্রিসিটিও চলে গেছে। চারপাশ জুড়ে কেমন গুমোট এক অন্ধকার। এ সবই খুব সহজ সাধারণ রোজকার ঘটে যাওয়া ঘটনা। কিন্তু অনুর বুকটা কেমন ভার ভার লাগতে লাল। কেমন বিষাদে ছেয়ে যাওয়া চারধার। আচ্ছা, সন্ধ্যাটা সবসময় এমন বিষণ্ন কেন হয়?

অনু বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকলো। ঘর অন্ধকার, এখনো কেউ বাতি দেয়নি! অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, তার মা এখনো চিৎকার চেঁচামেচি করে কাউকে ডাকেননি। সারা বাড়ি জুড়ে গোরস্থানের নিস্তব্ধতা। অন্য কোনো দিন হলে অনু ভারি অবাক হতো। এই নিয়ে মায়ের সাথে খানিক হাসি ঠাট্টাও করতো, কিন্তু আজ কিছুই করলো না সে। অবাকও হলো না। রান্না ঘর খুঁজে মোমবাতি জ্বালালো। মেজো বোন তনুর ঘর থেকে তার মেয়ে হাফসার ঘুমভাঙা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। অনু উঁকি দিয়ে তনুর ঘরের ভেতরটা দেখলো। অন্ধকার ঘরে জায়নামাজে বসে আছে তনু। বিছানায় সদ্য ঘুমভাঙা হাফসা কাঁদছে। তনুর অবশ্য সেদিকে খেয়াল নেই। সে স্থির বসে আছে জায়নামাজে। দরজায় দাঁড়িয়ে জায়নামাজে বসা তনুর আবছা অবয়বের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল অনু। তারপর সন্তর্পণে হাফসাকে কোলে তুলে নিলো। হাফসার কান্না অবশ্য তাতে থামলো না।

মে'র মাঝামাঝি প্রচণ্ড গরম পড়েছে। সন্ধ্যাবেলায় ইলেক্ট্রিসিটি যাওয়াটাও যেন অলিখিত নিয়ম হয়ে গেছে। এই সময়ে সরু বারান্দাটায় দাঁড়ালে খানিক ফুরফুরে হাওয়া পাওয়া যায়। অনু হাফসাকে কোলে নিয়ে আবারো বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো।

.

দূরে ল্যাম্পপোস্টের হলুদ আলোয় অয়নকে দেখা যাচ্ছে। অয়নের কাঁধে ব্যাগ। তার গা ঘেঁষে হেঁটে আসছে একটা কুকুর। কুকুরটাকে হাতের প্যাকেট থেকে খাবার ছুঁড়ে দিচ্ছে অয়ন। মজার ব্যাপার হচ্ছে খাবারের টুকরোগুলো মাটিতে পড়ার আগেই কুকুরটা শূন্যে লাফিয়ে লুফে নিচ্ছে। দৃশ্যটার ভেতরে কী যেন কী একটা আছে। অনু চোখ ফেরাতে পারছে না। সে এক দৃষ্টিতে অয়নের দিকে। তাকিয়ে আছে। তার মনে হচ্ছে এমন একটা দৃশ্য সে আগে কখনো কোথাও দেখেছে। কিন্তু কোথায় দেখেছে, মনে করতে পারছে না। কোনো সিনেমায় কী?

অয়ন আরো খানিকটা কাছে আসতেই বারান্দায় দাঁড়ানো অনুকে দেখলো। সামান্য গলা তুলে সে বলল, ঘরে মোম আছে আপু? না-কি নিয়ে আসবো?

অনু বলল, নিয়ে আয়। সাথে কয়েলও আনিস এক প্যাকেট। যা মশা!

অয়ন ঘুরে গলির ছোট দোকানটার দিকে এগুলো। অনু দাঁড়িয়েই রইল। তার মনে হলো, অয়নকে যতটা পারে দেখে নিতে চাইছে সে। যেন প্রচণ্ড তেষ্টা পেলে যতটা সম্ভব পানি খেয়ে নেয়ার মতো ব্যাপার। অয়নের সাথে কথা বলার সময় অনুর গলাটা কি খানিক কাঁপছিল? কাঁপছিলই বোধহয়। অনু অবশ্য দুপুরের পর থেকে নিজেকে অনেক বুঝিয়েছে। ভেতরে ভেতরে যা-ই হোক, অয়নের সামনে সে যতটা সম্ভব স্বাভাবিকই থাকবে। তাকে স্বাভাবিক থাকতেই হবে। এছাড়া আর উপায় কি? বাবার মৃত্যুর পর থেকে এই এতগুলো বছর তো সে এমন করেই স্বাভাবিক থেকেছে। নিজেকে নিজের ভেতর লুকিয়ে রেখে কী অস্বাভাবিকভাবেই না সে স্বাভাবিক হয়ে থেকেছে!

অবাক ব্যাপার হলো, অয়ন ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই ইলেক্ট্রিসিটি চলে এলো। অনু বারান্দা থেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। তার চোখ পড়েছে সরাসরি অয়নের চোখে। অয়ন ফিক করে হেসে উঠল, বিশ্বাসই তো করিস না যে আমি ম্যাজিক জানি, এখন বিশ্বাস হলো?

অনুও হাসলো, আমাকে ম্যাজিক দেখাস তুই? সব তো দেখাস কোচিংয়ের মেয়েদের!

অয়ন খানিক দমে যাওয়া গলায় বলল, এহ্! তুই কিন্তু আবার শুরু করেছিস আপু।

অনু বলল, তাহলে বল যে আজ আমাকে ম্যাজিক দেখাবি?

আজ? কীভাবে? তুই জানিস, আমার পরীক্ষা আপু।

হ্যাঁ জানি। আর এও জানি, আমাকে দেখানোর কথা এলেই তোর নানান বাহানা।

ধুর। মাঝেমধ্যে তুই কিছুই বুঝতে চাস না আপু। বাচ্চাদের মতো করিস।

অয়ন চেয়ারে বসে উবু হয়ে জুতোর ফিতে খুলছে। অনু মুগ্ধ চোখে সেইদিকে তাকিয়ে রইল। অয়ন কী খানিক শুকিয়ে গেছে? অনু এখনো ঠিকঠাক ধরতে পারছে না। তবে তার চোখের নিচে খানিক কালির আভাস। এতে অবশ্য অয়নের মুখটা আরো মায়া মায়া লাগছে। অনুর মনে হলো, অয়ন তাদের ঘরে না জন্মালে নিশ্চিত করেই কোনো রাজপুত্র হয়ে জন্মাতো। মাথাভর্তি ঘন কালো কোঁকড়া চুল। খাড়া নাক। ধবধবে ফর্সা ছিপছিপে গড়নের ছেলেটার নাকের নিচে গোঁফের আভাস। অয়নের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনুর বুকের ভেতরটা কেমন চিনচিন করে উঠল। চোখে পানি চলে এলো তার। অদ্ভুত ব্যাপার বৈকি!

অনু চট করে ওড়নায় চোখ মুছে নিলো। খুব বেশি স্বাভাবিক আচরণ করতে গিয়ে কি সে খুব বেশি অস্বাভাবিক আচরণই করে ফেলছে?

অনু বলল, রাতে কি খাবি বল। আমি রাঁধবো।

অয়ন মাথা না তুলেই বলল, কেন? মা কই?

কেন? মা থাকলে আমি রান্না করতে পারি না?

তোর রান্না আমি খেতে পারি না আপু। রাজ্যের ঝাল দিয়ে রাখিস, খেতে। বসলে চিনির শরবত নিয়ে বসতে হয়।

অনু মিথ্যে অভিমান মাখা গলায় বলল, ও আচ্ছা, আমার রান্না এখন এতটাই বিশ্রি না? এই সেদিন অব্দিও তো মায়ের রান্না মুখে দিতে চাইতি না!

অয়ন এই কথার কোনো জবাব দিলো না। সে জুতা খোলা শেষ করে দৌড়ে বাথরুমে ঢুকলো। হাতমুখ ধুয়ে বের হয়েই বলল, মা কইরে আপু।

অনু বলল, নামাজে।

নামাজে? এখন কটা বাজে?

সে অনুর উত্তরের অপেক্ষা না করেই মায়ের ঘরে ছুটলো। এই ঘরে তনুর সাথে মাও থাকেন। ঘরে আলো নেই। তবে আশপাশ থেকে আলো এসে ঘরের অন্ধকার কিছুটা ফিকে হয়ে আছে। অয়ন ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালো। সাদা শাড়ি পরা সালমা বেগম মেঝেতে পাতা জায়নামাজে সেজদার ভঙ্গিতে বসে আছেন, আর তনু বসে আছে বিছানায়। থেকে থেকে সালমা বেগমের পিঠ কাঁপছে, তিনি কাঁদছেন! চেষ্টা করেও কান্নার শব্দ চেপে রাখতে পারছেন না তিনি। অয়ন বুঝতে পারছে না সে কী করবে! সে কি মাকে ডাকবে? না-কি চলে যাবে? মা নিশ্চয়ই নামাজে আছেন, এই সময়ে তাকে ডাকা ঠিক হবে না। কিন্তু মা এভাবে কাঁদছেন কেন?

অয়ন সামনের ঘরে এসে অনুকে বলল, মা কাঁদছে কেন রে আপু?

অনু বলল, এ আর নতুন কি? মা তো প্রায়ই নামাজে কাঁদে।

অয়ন কিছু বলতে গিয়েও আচমকা চুপ করে গেল। এই প্রথম তার মনে হলো বাড়িতে কিছু একটা হয়েছে। সেই কিছু একটা সে ধরতে পারছে না এবং কেউ চায়ও না সে বিষয়টা ধরতে পারুক। বরং সবাই চাইছে বিষয়টা তার থেকে লুকিয়ে রাখতে। কিন্তু কী এমন হয়েছে যে, সে ছাড়া আর সকলেই জানে!

.

রাতে খাবার টেবিলে সালমা বেগম আসলেন দেরি করে। অয়ন বলল, এতক্ষণ ধরে কী নামাজ মা? সেই সন্ধ্যাবেলা বসলে আর এই উঠলে?

সালমা বেগম জবাব দিলেন না। তিনি নির্বিকার ভঙ্গিতে অয়নের পাশে এসে বসলেন। অনু খাবার বাড়ছিল। তনু তার মেয়েকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছে। হাফসাকে ঘুম পাড়াতে নানান আহ্লাদ করতে হয়। অদ্ভুত অদ্ভুত সব শব্দ করতে হয় মুখে, কিন্তু তারপরও হাফসা ঘুমায় না, বরং তারস্বরে কাঁদে। আজও কাঁদছে। অন্য সময় হলে অনু বা সালমা বেগম গিয়ে হাফসার ঘুম পাড়ানি উৎসবে যোগ দিত, কিন্তু আজ কেউ গেল না। যেন কেউ কিছু শুনছে না।

সালমা বেগম অয়নের কপালে হাত দিয়ে বললেন, জ্বর আর এসেছে?

অয়ন বলল, না মা, জ্বর আর আসেনি। তবে গলায় কিছুটা ব্যথা।

সালমা বেগম বললেন, গরম পড়েছে খুব। এর মধ্যে বাইরে বেশি বের হোস না। আর তোর যা ঘাম হয়, দেখা গেল বুকে ঘাম জমে গিয়েই আবার ঠান্ডা বাধাবি।

অয়ন বলল, ধুর। তুমি আজকাল উদ্ভট উদ্ভট সব কথা বলো মা। এর চেয়ে বেশি গরমে স্কুলের মাঠে রোজ ফুটবল খেলতাম আমি। কই, কখনো তো কিছু হয়নি। আর এখন তো এই রোদ এই বৃষ্টি।

অনু খাওয়া শেষ করে উঠতে উঠতে বলল, এই রোদ এই বৃষ্টি হলেই সমস্যা অয়ন। শরীরের মানিয়ে নিতে সমস্যা হয়।

অয়ন বলল, কিন্তু আমার পরীক্ষা সামনে। টিউশন করাতে যেতে হয়, আবার কোচিংয়ে পড়তে যেতে হয় রোজ।

অনু বলল, তোর আর টিউশন করাতে হবে না। এখন থেকে তোর হাত খরচের টাকা সব আমিই দেব।

তুই কোত্থেকে দিবি আপু? মা যে বলল, বাসা ভাড়া আবার বেড়েছে। আর আমার পরীক্ষাও তো সামনে। অনেক খরচ।

ও নিয়ে তোর ভাবতে হবে না।

অয়ন খানিক হাসলো। তারপর বলল, আমাকে ভাবতে হবে আপু। আমি বড় হচ্ছি, আর এই ঘরে আমি একাই তো ছেলে। ছেলেদের অনেক দায়িত্ব নিতে হয়।

কথাটা শেষ করেই অয়ন বুঝলো কথাটা বলা তার ঠিক হয়নি। এখন সবাই মিলে তাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করবে। পরিবারে সবার ছোট হওয়ার এই এক সমস্যা। কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না যে, সে বড় হয়েছে। অয়ন আতঙ্ক নিয়ে আড় চোখে মা আর বোনের দিকে তাকালো। অবাক ব্যাপার হলো অয়নের কথা শেষ হয়ে গেলেও কেউ কোনো কথা বলল

না, হই হুল্লোড় করলো না। বরং সবাই যেন কেমন চুপচাপ হয়ে গেল আরো। আরো বেশি নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ।

অয়ন খানিক চুপ করে থেকে বলল, আজ তোমাদের সবার কী হয়েছে। বলো তো?

অনু বলল, কী হবে?

অয়ন বলল, কিছু একটা তো হয়েছেই। সবাই কেমন অন্যরকম।

অনু কী বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলো। তারপর ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ঝুলিয়ে বলল, আমার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে রে অয়ন!

অয়ন মুহূর্তের জন্য উচ্ছ্বসিত হতে গিয়েও আচমকা থমকে গেল। এই বাড়িতে অনুর বিয়ে এক রহস্যময় আতঙ্কের নাম। ভীষণ লজ্জা আর সংকোচেরও বিষয়। সেই ছোটবেলা থেকে অয়ন দেখে এসেছে, বড় আপুর বিয়ে নিয়ে নানান কথা, হাজার ঝাট। ছোট আপু বেনু, মেজো আপু তনুর অব্দি বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু বড় আপুর বিয়েটা আটকেই রইল, তার বয়সও হয়ে গেল কত! চারপাশে ফিসফাস, অনুর বুঝি আর কখনোই বিয়ে হবে না। আর যদি হয়ও, তবে তা কোনো বুড়ো ভাম পুরুষের সাথে। সতীনের সংসার করতে হবে অনুকে। এই নিয়ে রোজ রোজ কত হিসেব-নিকেশ, কেচ্ছা কাহিনি! আজকাল অবশ্য অনুর বিয়ে নিয়ে কেউ আর প্রকাশ্যে কোনো কথাও বলে না। মা বা ছোট আপুরা যে বলতে চায় না, তা নয়। কিন্তু অনুকে সবাই কম বেশি ভয় পায়। তা পাবে না কেন? এই ঘর, এই সংসার, এই তনু, বেনু, অয়ন, সব তো অনুর ওই শীর্ণ কাঁধ আর ক্রমাগত ন্যুজ হয়ে যাওয়া পিঠে ভর করেই বেড়ে উঠেছে। সেই মানুষটার দিকে তাকিয়ে কথা বলতে যে শক্তির দরকার, তনু, বেনুরা তা অর্জন করতে পারেনি।

অয়ন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকালো, মা?

সালমা বেগম যেন হতচকিত হয়ে গেলেন। তিনি খানিক অনুর দিকে তাকালেন, খানিক অয়নের দিকে। অনুকে কিছু বলতে গিয়েও আবার থেমে গেলেন। তারপর আলতো হাতে টেবিলের উপর থেকে পানির জগটা তুলে নিয়ে গভীর মনোযোগে গ্লাসে পানি ঢালতে লাগলেন। খুব ধীরে। যেন সময়টাকে এই জগ, গ্লাস আর ঝরতে থাকা পানির মধ্যে তিনি আটকে রাখতে চাইছেন। অনু কী বুঝলো কে জানে, সে ধীর পায়ে হেঁটে এসে অয়নের কাছে দাঁড়ালো। তারপর অয়নের কাঁধে আলতো হাত রেখে বলল, আমাকে ছাড়া থাকতে তোর কষ্ট হবে অয়ন?

প্রশ্নটা খুব সহজ, সাধারণ। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই সহজ সাধারণ প্রশ্নের উত্তরই হয় সবচেয়ে বেশি কঠিন। অয়নের মনে হলো, এই প্রশ্নের উত্তরটাও সেই সবচেয়ে বেশি কঠিন উত্তরের একটি। অনু আপুকে ছাড়া থাকতে কী তার কষ্ট হবে? অয়ন অনেক ভেবেও এই প্রশ্নের উত্তর বের করতে পারল না। তার হয়তো বলে দেয়া উচিত যে, হ্যাঁ,

তার খুব কষ্ট হবে, কিন্তু এই মুহূর্তে অয়নের কেন যেন এই অনিশ্চিত উত্তরটি দিতে ইচ্ছে করলো না।

অয়ন বলল, তুমি এখানেই থেকে যেও। বিয়ে হলেই কি সবাইকে চলে যেতে হবে?

অনু মৃদু হাসলো। তারপর দুষ্টুমির ভঙ্গিতে বলল, তাহলে তোর বিয়ে হলেও কী তোর বউটাকে আমরা তার বাবার বাড়িতেই রেখে আসবো?

অনু আপু যে এমন কিছু একটা বলবে, অয়ন শেষ মুহূর্তে এসেই বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু ততক্ষণে যা বলার সে বলে ফেলেছে। অয়ন করুণ ভঙ্গিতে অনুর দিকে তাকালো।

অনু বলল, নুহা মেয়েটা কেমন আছে অয়ন? ওকে তো আর বাসায় নিয়ে এলি না!

অয়নের এবার সত্যি সত্যি রাগ হয়ে গেল। অনু আপু সবসময় তার সাথে যেন কেমন করে কথা বলে। তাকে পাত্তাই দিতে চায় না। তার সবকিছুকে ছেলেমানুষি ভেবে উড়িয়ে দেয়। এই নিয়ে অয়নের ভারি অভিমান হয়। রাগও হয় মাঝেমধ্যে। সে খাবার ছেড়ে উঠে পড়লো। মা বার কয়েক ডাকলেন, কিন্তু অয়ন শুনলো না। সে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দায় চলে গেল। আবছা আলোয় বারান্দা ছাড়িয়ে উঠে যাওয়া আম গাছটার ডালপালা দেখা যাচ্ছে। সেখানে থোকায় থোকায় মুকুলও ধরেছে। এবার কি অনেক আম ধরবে গাছটায়? ধরলেও অবশ্য লাভ নেই। বাড়িওয়ালা আজিজুল মিয়ার স্ত্রী সারাক্ষণ এই আম গাছে শ্যেনদৃষ্টি রাখে।

.

গুড়িগুড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। অয়নের মনে হলো তার গা একটু গরম লাগছে। আবারো জ্বর এলো না-কি! আজকাল কী যে হয়েছে, যখন তখন ঠান্ডা জ্বর লেগে যাচ্ছে তার! আজ শেষ বিকেলেও বৃষ্টি হয়েছিল। অনেক চেষ্টা করেও সেই বৃষ্টিটা এড়াতে পারেনি অয়ন। নিজের কোচিং শেষ করে নুহার জন্য অপেক্ষা করছিল সে। নুহার কোচিং তখনো শেষ হয়নি। সন্ধ্যাবেলা নুহাকে একা ফেলে চলে যেতেও মন সায় দিচ্ছিল না। অয়ন তাই নুহার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। আচমকা বৃষ্টি শুরু হতেই সে দৌড়ে গিয়ে কোচিংয়ের পাশের ঘিঞ্জি চায়ের দোকানটাতে দাঁড়ালো। কিন্তু সেখানে এত মানুষের ভিড় ছিল যে নিজেকে বৃষ্টির ছাট থেকে পুরোপুরি বাঁচাতে পারেনি সে। নুহাকে বাড়ি অব্দি পৌঁছে দিয়েই এসেছে অয়ন। অয়নের এই একটা জিনিস ভেবে খুব ভালো লাগে, কিছুটা সময়ের জন্য হলেও সে কারো দায়িত্ব নিতে পারে। এই যে সন্ধ্যাবেলা নুহাকে সে বাড়ি অব্দি পৌঁছে দিয়ে আসে, এই সময়টা নিজেকে খুব বড় বড় লাগে অয়নের। মনে হয় সে কারো দায়িত্ব নিতে পারছে।

নুহা আর সে একই ক্লাসে পড়ে। তারা দু'জন ভালো বন্ধু। অয়ন অবশ্য খুব যে কারো সাথে মেশে, তাও না। নুহা ছাড়া তার বন্ধু বলতে মাসুদ আর রনি। এছাড়া যাদের সাথে

সে মেশে, তাদের বরং বন্ধুর চেয়ে ক্লাসমেটই বেশি বলা যায়। তবে নুহার সাথে তার সম্পর্কটা একটু বেশিই অন্যরকম। সবাই অবশ্য ভাবছে, তার আর নুহার মধ্যে আলাদা কোনো ব্যাপার আছে। কিন্তু অয়নের কখনো তা মনে হয়নি। সে নুহাকে নিয়ে আলাদা করে কখনো কিছু ভাবেওনি। তবে হ্যাঁ, নুহার সাথে কথা বলতে তার ভালো লাগে। একসাথে থাকা সময়টুকু কেমন আর সকল সময়ের চেয়ে অন্যরকম। তা এমন তো হতেই পারে, ভালো বন্ধু হলে এমন হওয়াটাই তো স্বাভাবিক!

.

এখানে একা একা দাঁড়িয়ে কী করছিস? দেখছিস না-কি মশা? অনুর গলা শুনে অয়ন মাথা ঘুরিয়ে তাকালো, তবে কথা বলল না। অয়নের আরো খানিকটা কাছে এসে অনু রীতিমত আঁতকে উঠল, তুই আবারো বৃষ্টিতে ভিজছিস অয়ন? এক্ষুণি ঘরে আয়, এক্ষুণি।

অয়ন চুপচাপ ঘরে চলে এলো। অনু বারান্দা থেকে ফিরতে গিয়েও অবচেতনেই যেন জানালাটার দিকে তাকালো। অন্ধকার জানালা। বাইরের ল্যাম্পপোস্টের খানিক আলো তেরছাভাবে পড়েছে জানালার গ্রিলে। অনুর মনে হলো, সেই সামান্য আলোয় জানালার পর্দা এবং ভেতরের অন্ধকার ভেদ করেও অনু সেই গা ঘিনঘিনে চোখজোড়া দেখতে পেল।

ঘরে ঢুকে একখানা গামছা এনে অয়নের মাথা মুছিয়ে দিলো অনু। তারপর অয়নের বিছানা করে দিলো, মশারি টানিয়ে দিলো। অয়ন অবাক চোখে অনুর দিকে তাকিয়ে রইল, এসব কাজ তাকে কেউ কখনো করে দেয় না। সে বরং নিজে নিজেই করে, কিন্তু আজ হঠাৎ কি হলো?

অয়নের থাকার আলাদা ঘর নেই। সে থাকে ড্রইংরুমের একপাশে পাতা ছোট্ট খাটটাতে। খাটের একপাশে টেবিল। টেবিলের সাথে আলাদা করে চেয়ার বসানোর জায়গা নেই বলে সে খাটে বসেই পড়াশোনা করে। মাঝেমধ্যে অবশ্য হেলান দিতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু খাটে বসে হেলান দেয়া যায় না। মেরুদণ্ড টানটান করে বসে থাকতে হয় সারাক্ষণ। এই কারণেই কি-না কে জানে, অয়ন হাঁটে একদম সোজা হয়ে।

রাতে ঘুমাতে গিয়ে অয়ন যেন খানিক জড়সড়ই হয়ে গেল। সে অবাক হয়ে দেখলো, তার মা সালমা বেগম একটা বালিশ নিয়ে তার সাথে ঘুমাতে চলে এসেছেন। অয়নের খাটটা অনেকটা সরু ডিভানের মতো। এখানে সে একাই ঘুমায়। সালমা বেগম ঘুমান তনুর সাথে। রাত-বিরাতে তনু একা তার মেয়েকে সামলাতে পারে না। সালমা বেগম থাকলে তার ভারি সুবিধা হয়। ফলে তিনি ঘুমান তনুর সাথেই, কিন্তু আজ হঠাৎ কী এমন হলো যে মা তার সাথে ঘুমাতে চলে এলো!

অয়নের আচমকা মনে হলো, বাড়িতে খুব খারাপ কিছু একটা ঘটেছে। সবাই চেষ্টা করছে সেই খারাপ কিছু একটা তার কাছ থেকে আড়াল করে রাখতে। কিন্তু পারছে না। বরং

সেটি করতে গিয়ে অনু আপু, মা তার সাথে আরো বেশি বেশি অস্বাভাবিক আচরণই করে ফেলছেন। অনু আপুর বিয়ে বা তনু আপুর সংসার নিয়ে নয়, সমস্যাটা অন্য কিছু নিয়ে। কিন্তু সেই অন্য কিছুটা কী, যা সবাই তার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চাইছে?

অয়ন চুপচাপ মশারির ভেতর ঢুকলো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে অয়নের মনে হলো সমস্যাটা আর কাউকে নিয়ে নয়, সমস্যাটা তাকে নিয়েই!

.

অনু পরপর আরো দুদিন অফিসে গেল না। ইচ্ছেমত যখন তখন অফিস কামাই দেবার মতো সৌখিন চাকরি অনুর নয়। বরং উল্টোটাই, কিন্তু তারপরও গুরুতর কারণেই অনুকে অফিস কামাই দিতে হয়েছে। রবিবার সন্ধ্যা ঠিক সাতটায় সে এসেছে প্রফেসর আশফাক আহমেদের চেম্বারে। আশফাক আহমেদ হেমাটোলজির নামকরা ডাক্তার। তার এপয়েন্টমেন্ট পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। অনু এপয়েন্টমেন্ট পেয়েছে অফিসে তার প্রজেক্টের ম্যানেজার এবং একইসাথে ব্রাঞ্চ হেড আলতাফ হোসেনের কল্যাণে। প্রফেসর আশফাক আহমেদ সময় নিয়ে রিপোর্টগুলো দেখলেন। তারপর ধীরে সুস্থে চোখ থেকে চশমাটা খুললেন। তার মাথাভর্তি চকচকে টাক। অনুর কেন যেন আশফাক আহমেদের মুখের দিকে তাকাতে ভয় হচ্ছে। সে তাকিয়ে আছে তার চকচকে টাকের দিকে। আশফাক আহমেদ খানিক ঝুঁকে তার হাত দুটি লম্বালম্বি টেবিলের উপর রাখলেন। তারপর স্বাভাবিক গলায় বললেন, তোমার বয়স কত?

অনু আশফাক আহমেদের কাছ থেকে এই প্রশ্ন আশা করেনি। সে খানিকটা থতমত খাওয়া গলায় বলল, স্যার, রিপোর্টগুলো আমার নয়, আমার ছোট ভাইয়ের।

।আশফাক আহমেদ আবারো একইরকম গলায় বললেন, বয়স হয়েছে, আজকাল অনেক কিছুই মনে থাকে না, ভুলে যাই। কিন্তু রিপোর্টগুলো কার, সেটা তো লেখাই আছে।

অনু মিনমিন করে বলল, এই পঁয়ত্রিশ হলো।

আশফাক আহমেদ বললেন, ওহ। তোমাকে দেখে অবশ্য আমি আরো ছোট ভেবেছিলাম। ইউ লুক মাচ ইয়াংগার দ্যান ইওর এজ।

এই আলোচনাটা অনুর ভালো লাগছিল না। কেমন অস্বস্তি হচ্ছে। একইসাথে প্রচণ্ড দুশ্চিন্তাও। আশফাক আহমেদ অবশ্য এবার সরাসরি কাজের কথায় চলে এলেন। তিনি বললেন, এখানে ছাড়াও আগে আর কোথাও টেস্ট করিয়েছিলে?

অনু বলল, জি স্যার।

আশফাক আহমেদ বললেন, সেই রিপোর্টগুলো কোথায়?

অনু রিপোর্টগুলো বের করে টেবিলে রাখলো। আশফাক আহমেদ এবার অবশ্য খুব একটা সময় নিলেন না রিপোর্টগুলো দেখতে। তিনি রিপোর্ট দেখে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, আমার ধারণা পেশেন্টের অবস্থাটা তুমি জানো। আগের ডাক্তার নিশ্চয়ই তোমাকে বলেছেন, কিন্তু এইসব সিচ্যুয়েশনে সামান্য কনফিউশনেও থাকতে চাই না আমরা। সে জন্যই হয়তো তুমি আরো কনফার্ম হতে এখানে আবার টেস্ট করিয়েছ।

অনু দমবন্ধ করে আশফাক আহমেদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এবার আর তার মুখের দিকে তাকাতে ভয় করছে না অনুর। আশফাক আহমেদ সামান্য সময় নিয়ে বললেন, দিস ইজ একিউট মায়লয়েড লিউকোমিয়া। রক্তের শ্বেত কণিকায় ক্যান্সার সেল অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গেছে। ইভেন ব্রেনেও ছড়িয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় কেমোও কাজ করে না। বাইরে থেকে একদম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কিছু বোঝা যায় না। মনে হয় সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ। মাঝেমধ্যে জ্বর ঠান্ডা হবে তবে এর বেশি কিছু না।

তিনি একটু থামলেন। তারপর শান্ত, গম্ভীর গলায় বললেন, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, দেয়ার ইজ নো চান্স ফর হিজ সারভাইভাল। অ্যান্ড হি ইজ আউট অফ এনি ট্রিটমেন্টস। কোনো লাভ নেই। কেমো দিলে শুধু শুধু কষ্টটা বাড়বে। আই থিঙ্ক, পেশেন্ট ম্যাক্সিমাম তিন মাস, বা ধরো চার মাস সারভাইভ করতে পারে। ম্যাক্সিমাম। বাইরে থেকে ওই ঠান্ডা, সর্দি, কাশি, জ্বর ছাড়া আলাদা করে কিছু বোঝার উপায় নেই। বাট...।

আশফাক আহমেদ কথা শেষ করলেন না। তিনি সম্ভবত বুঝতে পারছেন, তার সামনে বসা এই বাচ্চা চেহারার মেয়েটা এই ধকলটা নিতে পারবে কি! যদিও মেয়েটা বলেছে তার বয়স চৌত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ, কিন্তু আশফাক আহমেদ এখনো নিশ্চিত হতে পারছেন না। তিনি হঠাৎ কী মনে করে অনুর মাথায় হাত রাখলেন। পেশেন্টের যত খারাপ অবস্থাই হোক, এই কাজটি তিনি কখনো করেন না।

.

অনু চেম্বার থেকে বের হয়ে রিকশা নিলো। তাদের বাসা মোহাম্মদপুর তাজমহল রোড। কলাবাগান থেকে তাজমহল রোড রিকশায় যেতে অনেকটা পথ। এই পুরো সময়টা অনু হুড খোলা রিকশায় আকাশের দিকে তাকিয়ে মাথা উঁচু করে বসে রইল। আকাশ ভর্তি অগুনতি তারা। সেই তারার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনুর মনে হলো তার চারপাশে আর কোনো কোলাহল নেই, গাড়ির হর্ন, রিকশার টুংটাং শব্দ কিছু নেই। সে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক নিঃশব্দ চরাচরে। এই নিঃশব্দ চরাচর থেকে অনু আর কখনো কোলাহলের পৃথিবীতে ফিরে যেতে চায় না।

*

বিদঘুঁটে সন্ধ্যাটা চোখের সামনে অদ্ভুত সুন্দর হয়ে গেল অয়নের। কোচিং শেষে আজও নুহাকে বাসায় দিয়ে আসছিল সে। স্যারের বাসা থেকে নুহার বাসা অব্দি হেঁটে যেতে ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় তিরিশ মিনিট লাগে। হাঁটার জন্য তিরিশ মিনিট লম্বা সময়। কিন্তু অয়নের মনে হয়, এই তিরিশটা মিনিট যেন এক ফু-তে উড়ে চলে যায়। রিকশায় গেলে তো সময় আরো কম। অয়ন তাই এই সময়টা হেঁটে যেতেই চায়।

নুহার কোচিং থেকে বের হবার মিনিট পাঁচেকের মাথায় বৃষ্টি শুরু হলো। অয়ন একবার ভাবলো, কোনো দোকান বা ছাউনির নিচে গিয়ে দাঁড়াবে। এই মুহূর্তে তার মনে পড়লো, মা আজ জোর করে ছাতা দিয়ে দিয়েছেন। অয়ন ব্যাগ খুলে ছাতা বের করলো। আর সাথে সাথেই নুহা বলল, এই অয়ন, ছাতাটা রাখনা। চল, আজ ভিজি।

অয়ন অসহায়ের মতো নুহার দিকে তাকালো। নুহা বলল, তুই দিন দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছিস অয়ন। আগের সেই অ্যাডভেঞ্চারাস ব্যাপারটা আর তোর মধ্যে নেই।

অয়ন বলল, আমার শরীরটা আজকাল হুটহাট খারাপ হয়ে যাচ্ছেরে নুহা। যখন তখন ঠান্ডা, জ্বর।

অয়নের হাত থেকে ছাতাটা কেড়ে নিতে নিতে নুহা বলল, লাগুক ঠান্ডা, জ্বর। আমার বড় মামা ডাক্তার। তার কাছ থেকে ফ্রি ট্রিটমেন্ট করিয়ে দেব তোকে।

অয়ন কী বলবে! সে নুহার দিকে তাকিয়ে রইল। নুহা ছাতাটা ভাঁজ করে অয়নের পিঠের ব্যাগের ভেতর ঢুকিয়ে দিতে দিতে বলল, মা আমাকেও রোজ ছাতা দিয়ে দেয়। আমি নানান বাহানায় রেখে আসি। এই জন্য অবশ্য বকাও খেতে হয়। তবে আজ মা বাসায় নেই। বৃষ্টিতে ভেজার এমন সুযোগও আর পাব না।

অয়ন বলল, তোর বাবা কিছু বলবে না?

নুহা বলল, আরে ধুর! বাবা এসব খেয়ালই করবে না!

অয়নের শরীরটা খারাপ লাগছিল। ভয়ও হচ্ছিল খুব। কারণ এখন বৃষ্টিতে ভিজে বাসায় ফিরলে এই নিয়ে তুলকালাম হবে নিশ্চিত, কিন্তু নুহা এমন করে বলল যে, সে না করতে পারল না। আজকাল রোজ বৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তার এখানে সেখানে খানাখন্দগুলোয় বৃষ্টির জল জমে রাস্তাগুলোও বিপদজনক হয়ে আছে। অয়ন তাই খুব দেখেশুনে সতর্ক হয়ে হাঁটছিল, কিন্তু নুহার সেসবের বালাই নেই। সে যেন ডানা মেলা প্রজাপতি। এই খানাখন্দ ভরা রাস্তায়ও নুহা যেন। উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। অয়ন বার দুই তাকে সতর্কও করলো, কিন্তু নুহা দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সত্যিকারের প্রজাপতির মতোই অয়নের কাছে উড়ে এলো। তারপর হাসতে হাসতে বলল, তুই এত ভীতু হয়ে যাচ্ছিস কেন রে অয়ন?

অয়ন নুহার কথার জবাব দিতে গিয়েও পারল না। তার আগেই জলের নিচে ডুবে থাকা কিছুতে হোঁচট খেলো নুহা। তাল সামলাতে না পেরে রাস্তার জল কাদার ভেতরই প্রায় পড়ে যাচ্ছিল সে। শেষ মুহূর্তে নুহাকে ধরে তার পড়ে যাওয়া ঠেকালো অয়ন।

নুহা অবশ্য সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারল না। তার স্যান্ডেল ছিঁড়ে গেছে। তবে তার চেয়েও বাজে ব্যাপার হচ্ছে তার ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ উঠে গেছে। উঠে যাওয়া নখ থেকে দরদর করে রক্ত বের হচ্ছে। প্রচণ্ড ব্যথায় মুখ বিকৃত করে আছে সে। অয়ন এদিক-সেদিক তাকিয়ে রিকশা খুঁজলো, কিন্তু এই বৃষ্টিতে কোথাও কোনো খালি রিকশা নেই। অয়ন কিছুক্ষণ সেখানেই দিশেহারার মতো দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নুহাকে এক হাতে আগলে ধরে তার শরীরের ভার অনেকটাই নিজের শরীরে নিয়ে বাকি পথটুকু হেঁটে এলো সে। খানিক আগের উড়ে বেড়ানো নুহা যেন মুহূর্তেই ভেজা তুলোর মতো মিইয়ে গেল। নুহাকে যখন বাড়ির গেটে পৌঁছে দিলো, তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। ইলেক্ট্রিসিটি নেই বলে বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যাটা খানিক বেশিই গাঢ়। অয়ন আর নুহা কিছুক্ষণ গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। অয়নের এক হাতে তখনো নুহার ভেঁড়া স্যান্ডেল জোড়া। নুহা অচমকা দুষ্টুমির স্বরে বলল, তুই এখনো আমার স্যান্ডেল হাতে দাঁড়িয়ে আছিসরে গাধা!

অয়ন একবার হাতের স্যান্ডেলের দিকে তাকালো। তারপর মৃদু হেসে বলল, সবসময় তো পায়েই থাকে, আজ না হয় কিছুক্ষণ হাতে থেকে দেখুক কেমন লাগে!

নুহাও হাসলো। তারপর বলল, তখন ভুল বলেছিলাম। তুই কিন্তু মোটেই আনঅ্যাডভেঞ্চারাস হয়ে যাসনি। বরং অনেক বেশি অ্যাডভেঞ্চারাস হয়ে গেছিস। তবে সাথে কেমন একটা সেন্সিবল ব্যাপারও চলে এসেছে। এই মানে ধর রেসপন্সিবল টাইপ।

অয়ন বলল, বাসার সবার তো উল্টো ধারণা।

নুহা বলল, বাসায় এমনই হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে মনে হয় তারা বড় হয়ে গেছে, আর ছেলেদের ক্ষেত্রে মনে হয় তারা ছোট রয়ে গেছে।

অয়ন খানিক চুপ করে থেকে বলল, আমি যাই নুহা। বাসায় বকবে।

নুহা ঘাড় কাঁত করে বলল, আচ্ছা।

অয়ন ভেবেছিল নুহা তাকে আরো কিছু বলবে। কিন্তু নুহা আর কিছুই বলল। অয়ন ঘুরে গেট থেকে বের হলো। আশেপাশে একটাও খালি রিকশা নেই। রাস্তায় জমে থাকা জল ছিটিয়ে দিয়ে একটা গাড়ি ঝুপ করে ছুটে গেল। অয়ন বিরক্তি নিয়ে গাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল। ঠিক এই মুহূর্তে পেছন থেকে নুহা ডাকলো। অয়ন ঘুরে তাকাতেই সে বলল, এদিকে আয়।

অয়ন অবাক চোখে নুহার দিকে তাকিয়ে রইল। নুহা আবারো বলল, কী হলো? আয় এদিকে।

নুহার গলায় কিছু একটা ছিল। অয়ন ঘোরগ্রস্তের মতো সিঁড়ির পাশের অন্ধকার জায়গাটাতে গেল। সেখানে নুহা দাঁড়িয়ে। নুহা হঠাৎ বলল, আমি তোর সন্ধ্যাটা নষ্ট করে দিলাম তাই না অয়ন?

অয়ন একটা চোরা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। সে ভেবেছিল নুহা তাকে অন্য কিছু বলবে। কিন্তু সেই অন্য কিছুটা কী, অয়ন নিজেই তা জানে না। সে অনেক ভেবেও সেই অন্য কিছুটা খুঁজে বের করতে পারেনি। নুহা এক পা সামনে এগিয়ে আলতো করে অয়নের গালে হাত রাখলো। এতক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজে অয়নের কেমন শীত শীত লাগছে। নুহাও ঠান্ডায় কাঁপছে। কিন্তু নুহার হাতের ওইটুক স্পর্শ অয়নের কাছে কী উষ্ণ মনে হলো! কী আরামদায়ক মনে হলো? নুহা আচমকা ফিসফিস করে বলল, তুই খুব ভালো অয়ন। তুই খুব ভালো।

অয়নের খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, তার গালের সাথে নুহার হাতটিকে আরো শক্ত করে চেপে ধরতে, কিন্তু কোনো এক অদ্ভুত কারণে তা সে পারছিল না। অয়ন যেমন ছিল, তেমনই ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। নুহা আরো খানিকটা ঘনিষ্ঠ হয়ে তার হাতটি বাড়িয়ে অয়নের চুলের ভেতর ডুবিয়ে দিলো। অয়নের মনে হলো সে নুহার তপ্ত নিঃশ্বাস টের পাচ্ছে।

সেই তপ্ত নিঃশ্বাস আরো কিছুটা বাড়িয়ে দিয়ে নুহা কেমন একটা অদ্ভুত গলায় বলল, এমনই থাকিস অয়ন।

অয়ন হঠাৎ বলল, কেমন?

নুহা বলল, এই যে এমন সহজ, ভালো। এমন আর সকলের চেয়ে আলাদা।

অয়ন জানে না কেন, তার চোখে হঠাৎ জল চলে এলো, কিন্তু সে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল সেই জলটুকু ঝরতে না দিতে, নুহাকে দেখতে না দিতে। নুহা আবারো তার গালে হাত রাখলো। তারপর বলল, মনে থাকবে অয়ন?

অয়ন কী জবাব দেবে? নুহা আজ এমন করে বলছে কেন? এই বলার কী বিশেষ কোনো অন্য অর্থ রয়েছে?

অয়ন মুখে কিছু বলল না। কেবল শেষ মুহূর্তে সে তার মাথাটা সামান্য নিচু করে ফেলল। এই নিচু করে ফেলার অর্থ হতে পারে নুহার প্রশ্নের উত্তর, হ্যাঁ, মনে থাকবে। হতে পারে অয়ন তার চোখ থেকে ঝরে পড়া রহস্যময় জলের ফোঁটাটুকু নুহার কাছ থেকে লুকিয়ে ফেলতে চাইছে।

.

অয়নের সাথে শামীমের দেখা হয়ে গেল বাসার কাছের গলির মোড়ে। শামীম তনুর হাজবেন্ড। সে একটা বন্ধ দোকানের সামনে ভেজা কাপড়ে জড়সড় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে

আছে। তার পাশে মাটিতে সিলভারের বড়সর একটা চকচকে পাতিল। পাতিলের মুখ কাগজ দিয়ে আটকানো। শামীমের চোখে চশমা। খানিক পরপর সে ভেজা শার্টের খুঁটে তার চশমা মুছছে। এতে চশমার কাঁচ পরিষ্কার হবার বদলে আরো ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। সে সেই ঝাপসা চোখে অয়নকে কীভাবে দেখলো কে জানে! অয়ন রিকশা থামিয়ে শামীমের সামনে। দাঁড়ালো। শামীম অত্যন্ত নরম গলায় বলল, দুঃখিত অয়ন, তোমাকে বিরক্ত করলাম।

অয়ন বলল, এটা কোনো কথা হলো ভাইয়া?

শামীম বলল, নাহ্! তুমি এতটা পথ বৃষ্টিতে ভিজে এলে, তোমাকে আবার দাঁড় করালাম।

অয়ন বলল, কিন্তু আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বাসায় যাননি?

শামীম বলল, গিয়েছিলাম। নিচের কলাপসিবল গেটের বাইরে থেকে অনেকক্ষণ ধরে কলিংবেলও চাপলাম। কিন্তু উপর থেকে কারো কোনো সাড়াশব্দ নেই। তারপর হঠাৎ মনে হলো, আরে, কী বোকা আমি, কারেন্টই তো নেই, কেউ শুনবে কী করে! আর এই দেখো, বৃষ্টিতে পানি ঢুকে ফোনও বন্ধ হয়ে গেছে। কী দুরবস্থা বলো তো!

শামীম পকেট থেকে ফোন বের করে অয়নকে দেখালো। ফোন সত্যি সত্যিই বন্ধ হয়ে গেছে। শামীমের চোখ-মুখ জুড়ে বিব্রত হাসি। যেন ফোন বন্ধ হয়ে যাওয়া বড় কোনো অপরাধ। সে অবশ্য এমনই। সবসময়ই কেমন এক দ্বিধাগ্রস্ত মানুষ। চলনে-বলনে সাদাসিধে, বিনয়ী। দেখতে ছিপছিপে, ফর্সা, লম্বা। হাঁটার সময় সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে হাঁটে। দেখে মনে হয় তার চারপাশের জগত সংসারে কি ঘটছে তা নিয়ে তার কোনো আগ্রহ নেই।

অয়ন বলল, আপনার পাশে এটা কী?

শামীম কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বলল, মাছ। জিওল মাছ।

অয়ন বলল, জিওল মাছ কী?

শামীম বলল, জীবন্ত কই আর মাগুর মাছ। আমাদের পুকুরের মাছ। পাতিলের মধ্যে পানি দিয়ে নিয়ে আসছি। এই যে সাঁতার কাটছে, শব্দ শুনতে পাচ্ছ?

অয়ন কান পেতে শব্দ শোনার চেষ্টা করলো, কিন্তু কোনো শব্দ শুনতে পেল। শামীম বলল, এই মাছ খেলে শরীরে রক্ত হয়। তনুর শরীরে এখন রক্ত দরকার। হাফসা হবার সময় অনেক রক্ত গেছে। আমি তো সেই একবার মাত্র। আসতে পারলাম। আর পারলাম না। প্রথম সন্তান, অথচ স্ত্রী-সন্তানের জন্য কিছুই করতে পারলাম না। কী করব বলো? হুট করে চাকরিটা চলে গেল। প্রথম সন্তান হবার আগে আগে চাকরি চলে যাওয়ার চেয়ে

খারাপ কিছু আর হয় না। মাথায় নানান টেনশন। নতুন ব্যবসা শুরু করেছি। সেখানেও সমস্যা, মাথা কাজ করে না।

শামীমের করুণ মুখ দেখে অয়নের মায়াই লাগল। তারা বাসার সামনের গেটে এসে দেখলো অনুও ঢুকছে। অনুকে দেখে অয়ন ভয় পেয়ে গেল। এই ভেজা চুপচুপে অবস্থায় তাকে দেখে অনু নির্ঘাত লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে দিবে। কিন্তু অয়নকে অবাক করে দিয়ে অনু কিছুই বলল না। সে শামীমকে দেখে বলল, শামীম, ভালো আছ?

অন্ধকারেও শামীম অনুর মুখের দিকে তাকালো না। সে মাটির দিকে তাকিয়ে বলল, জি আপা ভালো আছি। আপনারা সবাই ভালো?

অনু এই কথার জবাব দিলো না। হয়তো অন্ধকারে মাথা নাড়লো বলে অনুর অভিব্যক্তিও কেউ দেখতে পেল না। সে ব্যাগ থেকে চাবি বের করে গেট খুললো।

.

সেই রাতে অনুর সাথে আর কারো খুব একটা কথা হলো না। সালমা বেগম রাতে অনুর সাথে কথা বলতে এলেন। অনু তার সাথেও তেমন কিছুই বলল না। পরদিন ভোরে সে অফিসে চলে গেল। অফিসে যাওয়ার আগে অয়নকে বলে। গেল সন্ধ্যাবেলা তার অফিসে আসতে। সারাদিন অফিসে একটানা কাজ করলো অনু। তার চাকরিটা স্থায়ী কোনো চাকরি নয়, কাজের চাপও প্রচুর। একটা। এনজিও'র দুই বছর মেয়াদি প্রজেক্টের ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর সে। তবে এই মেয়াদ আরো বাড়বে বলে কানঘুষা চলছে। অনুরও ধারণা প্রজেক্টের মেয়াদ বাড়বে। এই কারণেই খানিক নিশ্চিন্ত বোধ করছে সে। যদিও জানে, এনজিওর চাকরিতে নিশ্চিন্ত বলে কিছু নেই।

অনু যখন অফিস থেকে বের হয়েছিল, তখন সন্ধ্যা ঘনিয়েছে। অয়ন আসতে কিছুটা দেরি করলো। রিকশায় অয়নের সাথে নানান এলোমেলো, অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতে লাগল অনু। যেন সে জানে না, অয়নের সাথে তার কী কথা বলা উচিত। কিংবা সে এমন কিছু বলতে চায়, যেটি অয়নকে বলা উচিত নয়। এমন প্রবল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যেই অনু বলল, আসতে এত দেরি করলি যে?

অয়ন বলল, কোচিং শেষ করে এলাম তো!

নুহাকে পৌঁছে দিয়ে এলি?

নাহ্। ও আজ আসেনি। গতকাল হোঁচট খেয়ে পায়ের নখ উঠে গেছে।

এখন কী অবস্থা?

পা ফুলে গেছে। ব্যথা খুব।

নুহার জন্য খারাপ লাগছে অনেক? তুই ওকে খুব পছন্দ করিস, না?

অনুর আচমকা এমন প্রশ্নে অয়ন সামান্য থমকে গেল। সে জবাব দিল না। চুপ করে রইল। অনু যেন বুঝতে পারল, অন্তত এই অবস্থায় তার এমন করে বলাটা ঠিক হয়নি। বিষয়টা স্বাভাবিক করার জন্যই সে বলল, তোরা খুব ভালো বন্ধু, তাই না?

অয়ন বলল, হু। ও আমার খুব ভালো বন্ধু আপু।

অনু বলল, জীবনে ভালো বন্ধু খুব দরকার অয়ন। নিঃসঙ্গতার চেয়ে খারাপ কিছু আর নেই।

অয়ন কী ভেবে হঠাৎ বলল, বন্ধু না হলেই কী মানুষ নিঃসঙ্গ হয়ে যায়? তার চারপাশে তো কত মানুষই থাকে?

অনু বলল, মানুষের অভাবে মানুষ নিঃসঙ্গ হয় না, মানুষ নিঃসঙ্গ হয় ভালো বন্ধুর অভাবে, কাছের মানুষের অভাবে।

তুই কী তাহলে নিঃসঙ্গ মানুষ?

কেন? এটা বললি কেন?

তোর তো কোনো বন্ধু নেই আপু। না, মানে কখনো দেখিনি তো।

সব কিছু কী দেখা যায়?

দেখা যায় না?

উঁহু। পৃথিবীতে বেশিরভাগ জিনিসই দেখা যায় না অয়ন। আর যেসব জিনিস দেখা যায় না, সেগুলো দেখা জিনিসের চেয়েও বেশি শক্তিশালী।

অয়ন বুঝতে পারছে, আজ অনুর কিছু একটা হয়েছে। অনু কখনো তার সাথে এমন করে কথা বলে না। অয়নের সাথে যে অনুর অনেক কথা হয়, তা নয়। তবে যেটুকুই হয়, তাতে বেশিরভাগ সময়ই থাকে হাসি ঠাট্টা। এমন গম্ভীর অন্য অচেনা মানুষের মতো করে তার সাথে অনুকে কখনো কথা বলতে দেখেনি অয়ন। অয়ন কী বলবে ভেবে পেল না। অনুর সাথে এমন রিকশা ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও তার তেমন একটা নেই। পাশাপাশি চুপ করে বসে থাকতেও যেমন অস্বস্তি হচ্ছে অয়নের, তেমনি কথা বলতে গিয়েও সে ভেবে পাচ্ছে না কী নিয়ে কথা বলবে!

অনু বলল, ধর ভালোবাসা। এটা কখনো দেখা যায়? মায়া, স্নেহ, ঘৃণা, কষ্ট? এগুলো কিছুই কি কখনো দেখা যায়? যায় না। অথচ এগুলোই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী, তাই না?

অয়ন আচমকা বলল, তোর আজ কী হয়েছে আপু?

অনু সতর্ক গলায় বলল, কী হয়েছে মানে? আমার আবার কী হবে?

কিছু একটা তো হয়েছেই।

অনু হাসার চেষ্টা করলো। বলল, কেন, দার্শনিকদের মতো কথা বলছি?

নাহ্। অচেনা মানুষের মতো কথা বলছিস। মনে হচ্ছে তোকে আমি চিনি না। অন্য কোনো মানুষের সাথে রিকশায় বসে আছি।

আচ্ছা, তাহলে বল, চেনা মানুষের মতো হতে হলে কীভাবে কথা বলতে হবে? নুহাকে নিয়ে তোকে খোঁচাতে হবে?

এই ধুর, তুই না আপু! এই বড় মানুষ হয়ে যাস্ তো আবার সাথে সাথেই বাচ্চাদের মতো করিস।

তুই নিজে কী?

আমি তো বড় হতেই চাই, কিন্তু তোদের জন্যই তো পারি না।

কত বড় হতে চাস? সামনের ওই বিল্ডিংটার সমান, না তার চেয়েও বেশি?

খুব সিরিয়াস হয়ে ওঠা পরিবেশটা খানিক হালকা করতে চাইছিল অনু। কিন্তু অয়ন হাসলো না। কথার পিঠে কোনো কথাও বলল না। সে চুপ করে গেল। তারপর হঠাৎ গম্ভীর গলায় বলল, আমি একটা বড় চাকরি করার মতো বড় হতে চাই আপু।

বড় চাকরি করার মতো বড়?

হু।

কেন?

অনেক কারণ।

বল, শুনি?

এই ধর, মা সবসময় কেমন তেতে থাকে, কিছু বললেই ঝাঁঝিয়ে ওঠে। রাত-বিরাতে একা একা কান্নাকাটি করে। মাকে আমি শেষ কবে হাসতে দেখেছি, ভুলেই গেছি আপু। আমার খুব ইচ্ছে জানিস, আমার বন্ধুদের মায়েদের মতো করে মাও সবসময় হেসে হেসে কথা বলবে।

তোর কী ধারণা, তোর চাকরি হচ্ছে না বলে মা এমন করছে?

অয়ন এই কথার জবাব দিল না। খানিক চুপ করে থেকে বলল, অনেক টাকা থাকলে সব কিছু অনেক সহজ হয়ে যায় আপু। সবাই অনেক আদর যত্ন করে, মান্যগণ্য করে। বন্ধুরাও আলাদা দাম দেয়। ধর হাতে একটা দামি মোবাইল ফোন থাকলেও চারপাশের মানুষের আচরণ বদলে যায়। ক্লাসে, কোচিংয়ে টিচাররা পর্যন্ত অন্যরকম করে দেখে। এমনকি...।

কিছু একটা বলতে গিয়েও অয়ন থেমে গেল। অনু বলল, কী?

কিছু না আপু।

বল?

নাহ্, কিছু না।

বললাম তো বল, আমি কিছু বলব না।

তোর মন খারাপ হবে আপু।

উঁহু, হবে না। তুই বল।

আমাদের অনেক টাকা থাকলে তোর বিয়ে নিয়েও এত সমস্যা হতো না। আপু। এখন যে সবাই একথা-সেকথা বলছে, তাও বলার সাহস পেত না। অনেক ভালো দেখে একটা বিয়ে হয়ে যেত তোর। তোর জন্য আমার খুব কষ্ট হয় আপু। দেখিস, আমার একদিন অনেক টাকা হবে। আমি আমাদের সবার সব দায়িত্ব নিয়ে নিতে পারব। আর তোর অনেক রিলিফ লাগবে সেদিন, দেখিস।

অনু অয়নের দিকে তাকালো। অয়ন তাকিয়ে আছে রিকশার সামনের চাকার দিকে। অনুর খুব ইচ্ছে করছে অয়নের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরতে। এই তো সেইদিনের অয়ন। এই এতটুকু একটা কাপড়ের পুটলির ভেতর পেঁচানো অয়ন। অয়ন কতটা মায়ের সন্তান? তার চেয়ে ঢের বেশি তাদের তিন বোনের। যেন একটা জীবন্ত খেলনা। অনুর বুকের ভেতরটা হঠাৎ ভেঙেচুরে চুরমার হয়ে যেতে লাগল। তার ইচ্ছে করছিল অয়নকে বুকের সাথে চেপে ধরে চিৎকার করে কাঁদতে। এত জোরে চিৎকার করে কাঁদতে, যেন সেই চিৎকারের শব্দ এই শহর, এই কোলাহল, এই পৃথিবী ছাড়িয়ে মাথার ওপরের ওই আকাশ অব্দি পৌঁছে যায়। সেখানে গিয়ে যেন কৈফিয়ত চাইতে পারে, তিনি এমন কেন করলেন?

আমরা এখন কই যাচ্ছি আপু?

কোথাও না। তোকে নিয়ে আমার হঠাৎ ঘুরতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপু?

হু। কর।

আমার কী বড় ধরনের কোনো অসুখ করেছে?

অনু চট করে অয়নের দিকে তাকালো, কেন? তোর বড় কোনো অসুখ রবে কেন?

না, মানে, এই যে পরপর দুবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে কত কিছু টেস্ট করিয়ে আনলি! প্রথমবার টেস্টের পরপরই মা কেমন করতে লাগল, তুইও হঠাৎ হঠাৎ কেমন করে কথা বলিস। মনে হয় আমার থেকে সবাই কিছু একটা লুকাতে চাইছিস।

অয়নের মাথায় আলতে চাটি মেরে অনু বলল, ধুর। কী যে বলিস তুই!

অয়ন অবশ্য অনুর কথা গ্রাহ্য করলো না। সে বলল, এই অসুখের ট্রিটমেন্ট করতে কি অনেক টাকা লাগে? তুই টাকা নিয়ে খুব টেনশন করছিস, তাই না? এখন বুঝেছিস তো, আমি কেন বড় চাকরি করার মতো বড় হতে চাই? এই যে কিছু একটা লাগলেই তোকে আর তাহলে এত টেনশন করতে হতো না আপু।

অনু অয়নের হাত ধরলো। তার হাতের মুঠোয় অয়নের হাতটা অস্বাভাবিক ঠান্ডা। অয়ন বলল, একটা কথা বলি আপু?

হু।

ট্রিটমেন্টে কি অনেক সময় লেগে যাবে? যদি তেমন হয়, তবে ট্রিটমেন্টটা আমার পরীক্ষার পরে করাবি প্লিজ?

অনু কোনো কথা বলল না। সে মনোযোগ দিয়ে রাতের ঢাকার নিয়ন আলো দেখছে। সেই আলোয় ভেসে যাচ্ছে শহর, শহরের বিলবোর্ড, বিলবোর্ডের বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপনের হাসিমুখ তরুণ-তরুণী। হুড তোলা রিকশা, রিকশার পেইন্টিং, ঝলমলে যুগল। বাসের দরজায় ঝুলতে থাকা বাড়ি ফেরা ক্লান্ত মুখ। অনুর মনে হলো, এই শহরে দেখার মতো কত কিছুই যে রয়েছে। কিন্তু মানুষ এত বেশি নিজের জীবন দেখতে ব্যস্ত যে তার নিজেকে ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পায় না!

অয়ন বলল, তুই টাকা নিয়ে অত ভাবিস না আপু। একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে। আমার এক বন্ধুর বড় ভাইয়ের কি এক অসুখ হলো, অনেক টাকা দরকার। তার বন্ধুরা সবাই মিলে চিকিৎসার ফান্ড কালেকশনে নেমে গেল ফেসবুকেও হেল্প ইভেন্ট খোলা হলো। মাত্র ক'দিনেই পুরো টাকা ম্যানেজ হয়ে গেল জানিস? এখন সে পুরোপুরি সুস্থ, তুই একদমই ভাবিস না। জাস্ট দেখিস ট্রিটমেন্টটা যেন আমার পরীক্ষার পর হয়। আর আমি তো এখন সুস্থই। কোনে সমস্যাও হচ্ছে না। পরীক্ষার পর পর্যন্ত একটু দেখিস আপু, একবার পরীক্ষ। মিস করলে আমি আরো একটা বছর পিছিয়ে যাব। আমার পিছিয়ে যেতে ইচে করে না।

ক্লাসমেটদের চেয়ে জুনিয়র হয়ে যাবি বলে?

না আপু, আমার মনে হয় আমার দ্রুত বড় হবার অনেক তাড়া।

যাতে তাড়াতাড়ি চাকরি করতে পারিস?

অয়ন মাথা নিচু করে বলল, হ্যাঁ।

অনু হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টালো, চল, আমরা আজ বাইরে কোথাও খাই।

অয়ন মাথা নিচু রেখেই বলল, আচ্ছা।

বাইরে অবশ্য তাদের খাওয়া হলো না। অনুর হাতে খুব একটা টাকা-পয়সা নেই। মাসের শেষ, তার ওপর অয়নের ডাক্তার, ওষুধ, ডায়াগনোসিসে অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে গেছে। তারপরও সে অয়নকে নিয়ে ধানমন্ডির একটা রুফটপ রেস্টুরেন্টে গেল। আজকাল এই রেস্টুরেন্টগুলো খুব হচ্ছে শহরজুড়ে। বহুতল ভবনের ছাদের উপর খোলা আকাশের নিচে রেস্টুরেন্ট। অনুরা বসতেই হুড়মুড় করে বৃষ্টি এলো। সাথে প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া আর বজ্রপাত। দু'মিনিটেই যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল সব। ভেতরে যদিও বসার ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু এত মানুষ আর কোলাহলে অয়নের আর ভালো লাগছিল না। তারা নেমে এলো তিন তলায়। সেখানে মোবাইল ফোনের দোকান। অনু অয়নকে চমকে দিয়ে একটা মোটামুটি ভালো দামের মোবাইল ফোন কিনে ফেলল। অয়ন বার কয়েক জিজ্ঞেস করলো, ফোনটা কার? অনু নাম বলল না। কেবল বলল, একজনকে উপহার দিবে। কিন্তু পছন্দটা করে দিতে হবে অয়নকে। তা অয়ন পছন্দ করেও দিলো। আবার মনে মনে অবাকও হলো। মাসের শেষে অনুর হাত যে খালি থাকে, তা অয়ন জানে। আর খালি না থাকলেও এতগুলো টাকা দিয়ে কাউকে ফোন কিনে দেয়ার মতো অবস্থা যে অনুর নেই, সেটাও তো সত্যি!

রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ফোনটা অয়নকে দিলো অনু। অয়ন অবাক গলায় বলল, কি?

অনু স্বাভাবিক গলায় বলল, এটা রাখ।

কাউকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে? কিন্তু কাল যে পারব না আপু। সারাদিন অনেকগুলো ক্লাস।

অনু মৃদু হাসলো, কাউকে দিয়ে আসতে হবে না।

তাহলে?

তোর কাছে রেখে দে।

আমার কাছে? কেন?

এটা তোর।

আমার!

অয়নের মুখ হা হয়ে গেল। তার কতবার যে ইচ্ছে হয়েছে এমন একটা ফোনের। এমন নয় যে নিজের হতে হবে, অনুর, মা'র বা তনু, যারই হতো, সে তো অন্তত খানিক গেম খেলতে পারতো। সিনেমা দেখতে পারতো। আরো কত কিছু যে করা যায় আজকাল ফোনে, কিন্তু কখনোই কাউকে বলার সাহস হয়নি অয়নের। তার বন্ধুদের অনেকেরই ফোন আছে। দামি দামি ফোন। কত কত রকমের গেম যে তাতে খেলা যায়! যদিও কলেজ থেকে ফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বিধিনিষেধ আছে, কিন্তু তারপরও তো লুকিয়ে-চুরিয়ে সবাইই করে।

অয়ন বাকিটা সময় আর কথাই বলতে পারল না। সে চেষ্টা করছে তার উচ্ছ্বাসটা চেপে রাখতে, কিন্তু পারছে না। অনু কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। তারপর বলল, তুই খুশি হয়েছিস অয়ন?

অয়ন কী বলবে বুঝতে পারছে না। সে অনুর দিকে তাকালো না। দু'হাতে ফোন চেপে ধরে কিছু একটা করছে সে। তারপর হঠাৎই যেন শুনতে পেল অনুর কথা, এমন ভঙ্গিতে অনুর দিকে তাকিয়ে বলল, অনেক।

অনু বলল, কতটা অনেক?

অয়ন অনুর দিকে তাকিয়ে বিরক্ত গলায় বলল, তুই যা তো আপু। পরে কথা বলছি।

অনু গেল না। সে বসেই রইল। নিস্পলক তাকিয়ে রইল অয়নের দিকে। কিন্তু অয়ন তখন ডুবে আছে অন্য কোনো জগতে। তার পুরো জগত তখন আচ্ছন্ন হয়ে আছে ওই ছোট্ট অবোধ যন্ত্রটার ভেতর। অয়নের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনুর মনে হলো, এমন একটা মুহূর্তের জন্য জীবনের অসংখ্য অপ্রাপ্তি ভুলে যাওয়া যায়। এই জগতে কাউকে আনন্দ কিনে দেয়ার চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছুতে নেই। আচ্ছা, এই এইটুকু প্রাপ্তির আনন্দের মুহূর্ত কী অয়নের সারাজীবনের অসংখ্য অপ্রাপ্তির কষ্টকে ভুলিয়ে দিতে পারছে?

অনুর ঘরের পর্দার আড়াল থেকে তখন একজোড়া চোখ অবিরাম ভিজে যাচ্ছে। সেই ভিজে যাওয়া চোখের জলের ভাষা পড়তে পারার সাধ্য কারো নেই, কারো না। সালমা বেগম তার বুকের ভেতর পৃথিবীর তীব্রতম চিৎকার চেপে রেখে নিঃশব্দ জলের যন্ত্রণাময় কান্নার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। দিচ্ছেন।

*

শামীমের কোলে হাফসা। শামীম মুগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। তার ধারণা মেয়ে তার বাবাকে চিনতে পেরেছে। সে তনুকে ডেকে বলল, তোমার কাছে ভাংতি টাকা আছে?

তনু বলল, কত?

এই ধরো পাঁচশ টাকা?

পাঁচশ টাকা ভাংতি হলে আস্ত টাকা কত?

আস্ত টাকা হলো এক হাজার টাকা। আছে পাঁচশ টাকা?

পাঁচশ টাকা দিয়ে কী করবে?

মেয়েটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখেছ? গা ভর্তি ঘামাচি উঠেছে। এই সময়ে পাউডার মাখতে হয় গায়ে।

ঘরে পাউডার আছে।

কই দেখি, কি পাউডার কিনেছ? আমার মেয়ের জন্য আজেবাজে জিনিস কিনবে না।

তনু পাউডারের কৌটা এনে দেখালো। শামীম সময় নিয়ে সেই কৌটা দেখলো। তারপর ভ্রু কুঁচকে বলল, এইসব দেশি আজেবাজে জিনিস কে এনেছে আমার মেয়ের জন্য? এই জিনিস আমার মেয়ের গায়ে মাখলে গায়ে ঘা হয়ে যাবে। তুমি এক্ষুণি টাকাটা দাও, আমি পাউডার নিয়ে আসি।

তনু বলল, বড়'পু এনেছে। তুমি ভালো করেই জানো, বড়পু হাফসার জন্য আজেবাজে জিনিস আনবে না।

আমি ভালো করে জানি বলেই তো বলছি। এই জিনিস আমার মেয়ে গায়ে মাখবে না।

না মাখলে নিজের মেয়ের জন্য নিজে কিনে আনো যাও। মেয়ে হয়েছে, একটা টাকা দিয়েছ এখন পর্যন্ত?

সব টাকার হিসেব করে রেখো, একসাথে দিয়ে দিব। এখন পাঁচশ টাকা দাও।

আমার কাছে অত টাকা নাই।

তোমার কাছে থাকবে না, তা তো জানিই। যাও তোমার বড়'পুর কাছ থেকে আনো।

আমি এখন বড়পুর কাছে টাকা চাইতে পারব না।

শামীম হাফসাকে তার কোল থেকে নামিয়ে পাশে বিছানায় রাখলো। তারপর তার চারপাশে বালিশ দিয়ে ঘেরাও করে দিলো। কিছুক্ষণ হাফসার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সামান্য ঝুঁকে আলতো করে হাফসার কপালে চুমু খেলো। তারপর নরম গলায় তনুকে ডাকলো, এই, এদিকে আসো।

তনু ভীত চোখে শামীমের দিকে তাকালো। শামীম তার জায়গা থেকে উঠল। তারপর দুই পা হেঁটে তনুর সামনে এসে দাঁড়ালো। তারপর বলল, শব্দ করো না, শব্দ করলে বিষয়টা খারাপ দেখাবে। সবাই জানবে, তোমার হাজবেন্ড। তোমাকে মারে, এটা তোমার জন্য গর্বের কোনো বিষয় না।

শামীম কথা শেষ করার সাথে সাথে তনুর গালে কষে চড় বসালো। তনু বিছানায় ছিটকে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিলো। সে শামীমের দিকে তাকালো না। এক হাতে নিজের মুখ চেপে ধরে বিছানায় বসে পড়ল। শামীম আলনা থেকে শার্ট নিয়ে গায়ে দিতে দিতে বলল, আমার চাকরি নাই। ব্যবসাপাতিও ভালো যাচ্ছে না। এই সব মুহূর্তে পুরুষের মাথার ঠিক থাকে না। তুমি কিছু মনে করো না তনু। পুরুষ মানুষের পকেট ঠিক থাকলে সব ঠিক থাকে। জঘন্য ডাইনি চেহারার বউকেও মনে হয় পরি। সেই দিক থেকে তোমার চেহারা ভালো। কিন্তু পকেটে পয়সা নাই বলে তোমাকেও আমার সহ্য হচ্ছে না। মনে হচ্ছে চোখের সামনে একটা পেতনি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শামীম লুঙ্গি ছেড়ে প্যান্ট পরলো। তারপর শার্টের হাতায় চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে বলল, তাহলে এখন তোমার দায়িত্ব হচ্ছে তোমার নিজেকে আমার কাছে পরির মতো মনে করানো। এই জন্য দরকার আমার পকেটে পয়সা। কিছু টাকা-পয়সা হলে ব্যবসাটা দাঁড় করাতে পারতাম। তখন দেখতে, তোমাকে দেখলেই আমার মন ফুরফুরে হয়ে যেত। তুমি তোমার বড় বোনকে বলল, আমার লাখ দুই টাকা লাগবে।

তনুকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ঘর থেকে বের হয়ে গেল শামীম। ড্রইংরুমে সালমা বেগমের সাথে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল তার। শামীম সামনের দিকে যতটা সম্ভব ঝুঁকে গিয়ে বিগলিত গলায় বলল, আম্মা, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। আপনার কিছু লাগবে?

সালমা বেগম বললেন, না বাবা, কিছু লাগবে না। এই সময়ে বাইরে যাচ্ছ যে?

শামীম আরো বিগলিত গলায় বলল, তনুর হঠাৎ দাঁতে ব্যথা শুরু হয়েছে, ওর জন্য ওষুধ আনতে যাচ্ছি আম্মা। আপনার প্রেসার বা এসিডিটির ওষুধ আছে? না থাকলে বলেন, আমি নিয়ে আসি? কোন ওষুধ খান আপনি?

না বাবা, আমার ওষুধ লাগবে না। তুমি এই সন্ধ্যাবেলা আবার বের হবে কেন? অনুকে ফোন করে বলে দিলেই তো অনু আসার সময় নিয়ে আসতো!

কী যে বলেন না আম্মা! বড় আপু এমনিতেই অনেক ব্যস্ত থাকেন, তাকে এখন আবার এটা বলা অন্যায়। সারাদিন কী অমানুষিক খাটেন মানুষটা।

শামীমের চোখে মুখে স্পষ্ট কষ্টের ছাপ। যেন অনুর জন্য কষ্টে তার বুক ফেটে যাচ্ছে। সালমা বেগম বললেন, আচ্ছা যাও।

শামীম ঘর থেকে বের হয়ে গলির মোড়ে চায়ের দোকানে এসে দাঁড়ালো। তারপর এদিক-সেদিক তাকিয়ে একটা সিগারেট ধরালো। মিনিট পাঁচেক পরে যে লোকটা এসে শামীমের পাশে দাঁড়ালো, শামীম তাকে আগে কখনো দেখেনি। লোকটার মাথার সামনের দিকে কোনো চুল নেই। কানের দুইপাশ থেকে মাথার পেছন অব্দি ঘন কালো চুল। লম্বায় পাঁচ ফুটের মতো। ভোতা নাকের নিচে বিছার মতো চ্যাপ্টা গোঁফ। দেখলেই কেমন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়। সে এসে শামীমকে ফোন দিলো। শামীম পকেট থেকে ফোন বের করতেই শামীমের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো। তারপর ফিসফিস করে বলল, শামীম ভাই?।

শামীম উপর নিচ মাথা নাড়ালো।

লোকটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আমি আজম।

শামীম লোকটার সাথে হ্যান্ডশেক করলো, এমন পাথরের মতো শক্ত হাত সে আগে কখনো ধরেনি। লোকটা অন্য হাত উঁচু করে রিকশা ডাকলো। লোকটাকে দেখে শামীমের সামান্য ভয় করছে, কিন্তু সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঝুঁকিটা সে নেবে।

.

শামীম বাসায় ফিরল গভীর রাতে। তাকে গেট খুলে দিলো অনু। অনুরও বাসায় ফিরতে দেরি হয়েছে আজ। অনুকে দেখে শামীম অপরাধীর মতো গলায় বলল, আমি খুবই দুঃখিত আপু, এত রাত পর্যন্ত আপনাকে জাগিয়ে রাখলাম।

অনু বলল, সেটা সমস্যা না। কিন্তু আমরা সবাই তোমার জন্য টেনশন করছিলাম। তোমার ফোনও বন্ধ ছিল।

শামীম কাঁচুমাচু গলায় বলল, সেদিন বৃষ্টিতে ভেজার পর থেকে ফোনটা যখন তখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আপু। আসলে হয়েছে কি, তনুর জন্য দাঁতে ব্যথার ওষুধ কিনতে বের হয়েছি, এই মুহূর্তে আমার বন্ধুর ফোন। তার ছোট ভাই অ্যাকসিডেন্ট করেছে, জীবন-মরণ অবস্থা। তার রক্তের গ্রুপ আর আমার গ্রুপ এক। সাথে সাথে হাসপাতালে গেলাম, অবস্থা খুবই খারাপ। অবশ্য রক্ত আমাকে দিতে হয়নি, তার আগেই আরো অনেক ডোনার চলে এসেছিল।

ওহ্, এখন কী অবস্থা?

কাল সকাল না হওয়া পর্যন্ত বলা যাচ্ছে না আপু।

আচ্ছা। তুমি টেবিলে বসো, আমি তনুকে ডেকে দিচ্ছি।

না না আপু, এত রাতে আর তনুকে ডাকতে হবে না। ও সারাটা দিন হাফসাকে নিয়ে এত পরিশ্রম করে। এখন এত রাতে আবার ওকে কষ্ট দেয়ার দরকার নেই। আমি নিজে নিজেই খেয়ে নিতে পারব আপু।

অনু অবশ্য শামীমকে একা একা খেতে দিলো না। তনু বাথরুমে ছিল, সে আসা পর্যন্ত অনু নিজেই পাশে দাঁড়িয়ে থেকে শামীমকে ভাত খাওয়ালো। ভাত খেতে খেতে শামীম বলল, আপনার চাকরির কী অবস্থা আপু?

অনু বলল, হ্যাঁ ভালো।

শামীম বলল, এখন চাকরির যা বাজার, তাতে আবার ভালো মন্দ কী? চাকরিতে চাকরিই, তাই না আপু?

অনু বলল, তা অবশ্য ঠিক।

আচ্ছা আপু, বিজনেস করলে কেমন হয় বলুন তো?

কিসের বিজনেস?

সেটাই ভাবছি। অবশ্য সবাই বলে আমাকে দিয়ে বিজনেস হবে না। কিন্তু আমার ধারণা হবে। তবে সমস্যা একটাই...।

কী সমস্যা?

সমস্যা তো আপু ক্যাপিটালের, এই জায়গাটাতেই আসলে ভয়। ক্যাপিটাল ছাড়া বিজনেস হয় না।

এই সময়ে তনু এলো, তনুর চোখ মুখ ফোলা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে অনেক কেঁদেছে। অনু তার ঘরে চলে যাওয়ার আগে ড্রইং রুমে উঁকি দিলো। অয়ন মশারির ভেতর শুয়ে মোবাইলে কিছু একটা করছে। অনুর একবার মনে হলো, সে অয়নকে কিছু বলে। এত রাতে এই শরীরে জেগে থাকলে শরীর আরো খারাপ করবে। আর তাছাড়া এভাবে সারাক্ষণ ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকা কোনোভাবেই শরীর বা মনের জন্য ভালো কিছু নয়। কিন্তু সাথে সাথেই অনুর মনে হলো, সে একজন সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষের সাথে তুলনা করে অয়নের কথা ভাবছে। সে আসলে ভুলে যাচ্ছে, এই অয়ন সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনের কোনো মানুষ নয়। তার জীবন এখন সকল মন্দের ঊর্ধ্বে। এখানে যতটুকু ভালো, তার সবটুকুই কেবল আনন্দপ্রাপ্তির মধ্যে। বাদবাকি সকলই শূন্য, অর্থহীন। তার এই জীবনে যতটুকু আনন্দ পাওয়া যায়, সেটুকুই কেবল সত্যি। সেই আনন্দের বিনিময়

মূল্য যত চড়াই হোক না কেন, তা মূল্যহীন। কেবল যে কোনো মূল্যে ভালো থাকা, একটু আনন্দপ্রাপ্তিই কেবল মূল্যবান।

অনু কিছু বলল না, অন্ধকারে মশারির ভেতরে মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে নিমগ্ন হয়ে থাকা অয়নের দিকে তাকিয়ে রইল সে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনুর আচমকা মনে হলো, আর মাত্র কয়েকটা দিন, কয়েকটা মাস, তারপর ডিভানের মতো ছোট্ট ওই বিছানাটা এখানে এমনই থাকবে। ঠিক এমনই। কেবল বিছানার ওপর ওই মানুষটা থাকবে না। বিছানাটা শূন্য পড়ে থাকবে! শূন্য পড়ে থাকবে ওই টেবিলটা। ওখানে আর কেউ বসবে না। ওই ব্যাগটা, ওই বইগুলো, ওগুলো আর কেউ কখনো পড়বে না। দরজার কাছের ওই জুতোজোড়া, আলনায় ঝুলতে থাকা ওই জামাগুলো, দেয়ালে ঝোলানো ওই র‍্যাকেট, অমনই পড়ে থাকবে। কেবল মানুষটাই আর থাকবে না। কী ভয়ংকর এক সত্য! এই ভয়ংকর সত্যটা সে কীভাবে মেনে নিচ্ছে?

মানুষ এত অসহায় কেন? বুকের ভেতর অসহনীয় প্রলয় বয়ে গেলেও অসহায় চোখে দেখে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই। সেই প্রলয় থামানোর উপায়ও মানুষের জানা নেই। অনু অন্ধকারে ঘুরতে গিয়ে আবিষ্কার করলো তার পেছনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে, আচমকা ধাক্কা লেগে পড়তে পড়তেও সালমা বেগমকে ধরে সামলে নিলো সে। সেই সারাটা রাত মা আর মেয়ে পরস্পরকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে, কাল্পনিক আশ্রয় পাওয়ার ভান করতে করতে কাটিয়ে দিলো। কেউ কাঁদলো না, কথা বলল না। কেবল পরস্পরের বুকের ভেতর বয়ে গেল অব্যক্ত এক অনুভূতির তীব্র বাঅয় যন্ত্রণা।

*

আলতাফ হোসেন সদালাপী স্বভাবের মানুষ। কেউ কেউ অবশ্য আড়ালে আবডালে তাকে গায়ে পড়া স্বভাবেরও বলেন। তার বয়স পঞ্চাশ। যদিও দেখে। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশের বেশি মনে হয় না। অনুর প্রজেক্টের ম্যানেজার এবং একই সাথে অফিসের এই গুলশান শাখার শাখা প্রধানও তিনি। অন্যসময় সদালাপী হলেও কাজের সময় গম্ভীর, সিরিয়াস। বুধবার আলতাফ হোসেন অফিসে ঢুকলেন দুপুরের পর। বাইরে কোথাও জরুরি মিটিং ছিল। অফিসে ঢুকেই তিনি অনুকে ডাকলেন। তার টেবিলের ওপর অগোছালো কাগজের স্তূপ। চোখে ভারি চশমা। চশমার ভেতর থেকেই চিন্তিত চোখ দেখা যাচ্ছে। অনু ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, একটা বড় ঝামেলা হয়ে গেছে অনু।

অনু বলল, কী ঝামেলা ভাইয়া?

আমাদের লাস্ট সার্ভের ফিল্ড রিপোর্টের ক্রস চেকে না-কি ডাটা সংক্রান্ত ঝামেলা পাওয়া গেছে?

মানে?

মানে ক্রস চেকে ডাটা সেম আসে নাই।

এটা কীভাবে হলো?

কীভাবে হলো সেটা জানি না, বাট ইটস আ সিরিয়াস ইস্যু।

অনু মনে মনে ভয় পেয়ে গেছে। সে এই প্রজেক্টের ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর, ফিল্ড সার্ভের রিপোর্টে ডাটা সংক্রান্ত কোনো ভুল থাকলে সেসবের মূল দায় বর্তায় তার কাঁধেই। সে দমে যাওয়া গলায় বলল, এখন কী হবে ভাইয়া?

কী হবে এখনো জানি না। তবে আজ হেড অফিসের মিটিংয়ে জীবনের সবচেয়ে বাজে পরিস্থিতি ফেস করতে হয়েছে। আমাদের বার চাকরি চলে যাওয়ার মতো অবস্থা।

অনু ঢোক গিলে বলল, সমস্যাটা কীভাবে হলো, আমি তো বুঝতে পারছি না! পুরোটা সময় আমি আমার সাধ্যমতো চেক করেছি, কিন্তু আপনি তো জানেনই, ফিল্ড সার্ভে টিমের ছেলে-মেয়েগুলো একদম নতুন। ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। এই ধরনের কাজের কোনো প্রিভিয়াস এক্সপেরিয়েন্সও তাদের নাই। রিক্রুটমেন্টের সময় এটা...।

আমি জানি অনু, কিন্তু আপনিও জানেন, উনাদের কাছে এসব জাস্ট একটা অজুহাত ছাড়া আর কিছুই না।

অনু যে এটা জানে না তা নয়, কিন্তু এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় কী? এই উপায় খুঁজতে খুঁজতেই অনেক রাত অব্দি অফিসে থাকতে হলো অনুকে। অসংখ্য ডাটা রিপোর্ট মিলিয়ে দেখতে হলো, কিন্তু সারাক্ষণ ভেতরে ভেতরে অয়নের জন্য কেমন অস্থির রইল সে। অফিসের কাউকেই এখনো অয়নের কথা জানায়নি অনু। এসব বিষয়ে কাউকে বলতে অনুর ভালোও লাগে না। যদিও আলতাফ হোসেন খানিকটা জানেন। প্রফেসর আশফাক আহমেদের কাছে অনুকে তিনিই পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে অয়নের বিষয়টা হয়তো তার মাথায়ই নেই। অনু অফিস থেকে বের হলো রাত এগারোটায়। বাইরে তখন তুমুল বৃষ্টি, রিকশা, সিএনজি কিছু নেই। যা-ও কিছু বাস আছে, তাতে ওঠার মতো অবস্থা নেই। আলতাফ হোসেন বললেন, এখন যাবেন কী করে আপনি?

অনু বলল, আপনি চিন্তা করবেন না ভাইয়া, আমি চলে যেতে পারব।

আলতাফ হোসেন গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করলেন। কিছুদিন ধরে তার ড্রাইভার নেই বলে নিজেকেই ড্রাইভ করতে হচ্ছে। অনু ছাতা মাথায় ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ছিল। আলতাফ হোসেন অনুর পাশে এসে গাড়ি থামালেন। তারপর সামনের জানালার গ্লাস ফাঁক করে বললেন, উঠে আসেন, যাওয়ার পথে যতটা সম্ভব কাছাকাছি নামিয়ে দিয়ে যাই।

অনু গাড়িতে উঠল। এমনিতেই অনেক রাত হয়ে গেছে। গাড়িতে উঠে চুপচাপ বসে রইল অনু। আলতাফ হোসেন বললেন, এত টেনশন করে কি সমস্যার সমাধান হবে বলুন?

অনু বলল, নাহ্, টেনশন কিসের?

টেনশন করার মতোই বিষয়, কিন্তু এত ভাববেন না। দেখি কি করা যায়, একটা কিছু ব্যবস্থা তো করতেই হবে।

আমার মাথায় কিন্তু কিছু আসছে না ভাইয়া।

এই বৃষ্টির রাতে এমন মনমরা হয়ে বসে থাকলে মাথায় কিছু আসবেও না অনু। মাথাটাকে একটু রিল্যাক্সড হতে দিন। গান শুনবেন?

অনুর এখন গান শুনতে ইচ্ছে করছে না। বৃষ্টি তার অসম্ভব পছন্দ। তার ওপর গাড়ির কাঁচের ভেতর থেকে রাতের ঢাকার এমন বৃষ্টি দেখা নিঃসন্দেহে বিশেষ এক আনন্দের অনুভূতি। কিন্তু এই মুহূর্তে এসব উপভোগ করার মতো মানসিক অবস্থা তার নেই। আলতাফ হোসেন বললেন, বলুন, কার গান শুনবেন?

অনু আলতাফ হোসেনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো। তারপর বলল, আপনার যার ভালো লাগে ভাইয়া।

শ্রীকান্তের গান শুনি কি বলেন? এই মেঘলা দিনে একলা, ঘরে থাকে না তো মন, কাছে যাব, কবে পাব, ওগো তোমার নিমন্ত্রণ...।

আলতাফ হোসেন গানের সিডি খুঁজতে খুঁজতে নিজে নিজেই গুনগুন করে গান গাওয়া শুরু করলেন। তার এক হাতে স্টিয়ারিং হুইল, আরেক হাতে তিনি অনুর সামনের গাড়ির ড্যাসবোর্ড থেকে সিডি বের করার চেষ্টা করলেন। সিডি বের করতে গিয়ে অনুর দিকে অনেকটাই ঝুঁকে আসতে হলো আলতাফ হোসেনকে। অনু কিছুটা সরে গিয়ে তাকে জায়গা করে দেয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু তারপরও কিছুটা সময়ের জন্য আলতাফ হোসেনের শরীরের স্পর্শ এড়াতে পারল না সে। আলতাফ হোসেন একগাদা সিডি বের করতে গিয়ে সিডিগুলো একহাতে সামলাতে পারলেন না। সবগুলো সিডি একসাথে ছড়িয়ে পড়লো অনুর কোলের উপর। আলতাফ হোসেন বিব্রত ভঙ্গিতে বার কয়েক সরি বলতে বলতে সিডিগুলো অনুর কোলের উপর থেকে কুড়িয়ে নিলেন। কিন্তু মুহূর্তের জন্য অনুর কেমন অস্বস্তিকর অনুভূতি হলো। তার মনে হলো আলতাফ হোসেনের হাত কয়েক সেকেন্ডের জন্য হলেও ইচ্ছাকৃতভাবেই তার উরুতে চেপে বসেছে।

এই অফিসে প্রায় বছর দুই হবে অনু আছে। এই দুই বছরে আলতাফ হোসেনের কাছ থেকে কখনোই কোনো আপত্তিকর আচরণ সে পায়নি। এমন নয় যে এই সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা অনুর কম। বরং অন্যান্য অনেক মেয়ের তুলনায় এই অভিজ্ঞতা তার বেশিই।

তার বাস্তবতা তাকে অহরহ এমন সব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করে। যেন সকল পুরুষেরই ধারণা, এই প্রায় মধ্য বয়সে চলে আসা, অথচ অবিবাহিতা একটি মেয়ে নিশ্চয়ই খুব সহজলভ্যই হবে।

আলতাফ হোসেন সম্পর্কে হুট করে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেতে অনুর খারাপই লাগছে। তারপরও ঘটনাটা অনু মাথা থেকে তাড়াতে পারল না। ভেতরে ভেতরে সে গুটিয়ে গেল। আলতাফ হোসেন বললেন, না-কি অঞ্জন দত্তের গান শুনবেন? একদিন বৃষ্টিতে বিকেলে, থাকবে না সাথে কোনো ছাতা...। এখন অবশ্য বিকেল না, রাত। আচ্ছা রাতের বৃষ্টি নিয়ে কি কোনো গান নেই?

অনু জবাব দিল না। আলতাফ হোসেন নিজ থেকেই বললেন, নেই মানে? আছে তো। সেই বিখ্যাত রোমান্টিক গান, এই বৃষ্টি ভেজা রাতে চলে যেও না...। গানটা কেমন লাগে আপনার? আমার তো অসাধারণ লাগে। খেয়াল করে দেখেছেন, গানটা কিন্তু খুব সিডাকটিভ! রুনা লায়লার কণ্ঠটাও এখানে অনেক অ্যাপিলিং।

অনু হঠাৎ বলল, আমার না মাথাটা খুব ধরেছে ভাইয়া। আপনি কিছু মনে না করলে গানটা আপাতত থাকুক?

আলতাফ হোসেন বিচলিত গলায় বললেন, অবশ্যই, অবশ্যই। আমি বোধহয় গান নিয়ে খুব ছেলেমানুষি করে ফেলছিলাম, না? আসলে চারদিক থেকে এত প্রেসার, মাঝেমধ্যে মনে হয়, কিছু সময়ের জন্য হলেও সব ভুলে একটু রিল্যাক্স হই। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে না বুঝলেন? আচ্ছা অনু, আপনার বিয়ে টিয়ের কি হলো, কিছু ভাবছেন বিয়ে নিয়ে?

অনু ঠান্ডা গলায় বলল, এটা নিয়ে আপনার সাথে আরেকদিন কথা বলি ভাইয়া? আজ আমার শরীরটা ভালো লাগছে না। আপনি এক কাজ করুন, আমাকে আসাদ গেট নামিয়ে দিন। আমি ওখান থেকে রিকশা করে চলে যেতে পারব।

আলতাফ হোসেন যেন আঁতকে উঠলেন, এই বৃষ্টির মধ্যে আপনি আসাদ গেট নেমে যাবেন? পাগল নাকি?

আলতাফ হোসেন অনুকে আসাদ গেট নামিয়ে দিলেন না, তিনি অনুকে নামিয়ে দিলেন অনুদের বাসার গেটে। তবে অনুদের বাসার গেট অব্দি পৌঁছানোর পথটুকু তিনি অনর্গল কথা বলে গেলেন। তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক জীবনের কথা। সেই জীবনে তিনি প্রচণ্ড দুঃখী একজন মানুষ। তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল তার স্ত্রীকে বিয়ে করা। কিন্তু মেয়ে দুটির মুখ চেয়ে তিনি কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। বাইরে বাইরে সবাই তাকে দেখে ভাবে তিনি একজন অতি সদালাপী, হাসি-খুশি মানুষ। কিন্তু ভেতরে ভেতরে। তার চেয়ে দুঃখী মানুষ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। মাঝেমধ্যে সুইসাইড করে মরে যেতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু ওই মেয়ে দুটির মুখ চেয়েই পারেন না। তিনি খুব চান, কেউ

একজন তার এই দুঃখটা বুঝুক। তাকে একটু শান্তি দিক, আশ্রয় দিক। কিন্তু এমন কেউ কী আছে?

অনু একইসাথে জড়সড় ও সতর্ক হয়ে আলতাফ হোসেনের এইসব কথা শুনলো। কারো সামনে কেউ এমন দুঃখের কথা বললে তার উচিত মানুষটাকে সান্ত্বনা দেয়া। অন্তত হা হুঁ গোছের কিছু একটা বলা। কিন্তু এই পুরোটা সময় অনু একদম চুপ করে রইল। সে কথা বলল আলতাফ হোসেন যখন তাকে তাদের বাসার গেটে নামিয়ে দিলেন তখন। কথা বলেই অনুর মনে হলো সে কথা বলে ভুল করে ফেলেছে। কথা না বলাই বরং ভালো ছিল। অনু গাড়ি থেকে নেমে সামান্য ঝুঁকে গাড়ির ভেতর উঁকি দিয়ে বলল, ভাইয়া, এত রাতে অনেক কষ্ট দিলাম আপনাকে।

আলতাফ হোসেন বললেন, না, না। কষ্ট কী!

অনু বলল, এক কাপ চা খেয়ে যান ভাইয়া?

অনুর ধারণা ছিল না যে, এই এতরাতে অনুর চায়ের দাওয়াত আলতাফ হোসেন গ্রহণ করবেন। সে স্রেফ সৌজন্যতাবশত বলেছে। কিন্তু অনুকে চমকে এবং একইসাথে প্রচণ্ড বিরক্ত করে দিয়ে আলতাফ হোসেন বললেন, এই ওয়েদারে এক কাপ চা পেলে মন্দ হয় না। তবে কফি হলে সবচেয়ে ভালো হতো। বাসায় কফির ব্যবস্থা আছে?

অনু যেন সামান্য হলেও আশার আলো দেখতে পেল। সে চট করে বলল, না ভাইয়া, আমাদের বাসায় তো কফির ব্যবস্থা নেই।

আলতাফ হোসেন উচ্ছ্বসিত গলায় বললেন, কোনো সমস্যা নেই, চা হলেই চলবে। একটু কড়া লিকারের চিনি ছাড়া চা। খাওয়ার সময় চোখ বন্ধ করে ভাববো, কফি খাচ্ছি, ব্ল্যাক কফি, হা হা হা।

আলতাফ হোসেনকে নিয়ে গেটের ভেতর ঢোকার ঠিক আগ মুহূর্তে অনুর মনে হলো দোতলার সেই জানালাটা খুলে গেল। এত দূর থেকেও জানালার কাঁচের শার্সিতে একটা লোমশ কঠিন হাত যেন মুহূর্তের জন্য হলেও দেখতে পেল সে!

বাসায় ঢুকে অনুর বুকটা ধক করে উঠল। তার বড় চাচি সুফিয়া বেগম এসেছেন তাদের বাসায়। চাচাঁদের সাথে অনুদের সম্পর্ক নেই বললেই চলে। এর পেছনে অবশ্য করুণ এক গল্প আছে। অনুর বাবারা দুই ভাই, এক বোন। অনুর বাবা মোফাজ্জল হোসেন সবার ছোট। মাঝখানে বোন। বড় ভাইয়ের তুলনায় অনুর বাবা প্রায় বার বছরের ছোট। তাদের গ্রামের বাড়ি মাদারীপুরের কালকিনি থানায়। কিন্তু তোফাজ্জল হোসেন তখন ছোট ভাইকে নিয়ে ঢাকায় থাকেন। তাকে পড়াশোনাও করিয়েছিলেন তিনি। হয়তো ছোট ভাইকে নিয়ে নানান স্বপ্ন, পরিকল্পনাও তার ছিল। কিন্তু ইন্টারমিডিয়েটে থাকতেই সালমা বেগমের সাথে তুমুল প্রেম হয়ে যায় মোফাজ্জল হোসেনের। লুকিয়ে বিয়েও করে

ফেলেন তারা। এই ঘটনা মোফাজ্জল হোসেনের বড় ভাই জানতে পারেন। তিন বছর পর।

মোফাজ্জল হোসেন তখন অনার্স থার্ড ইয়ারের ছাত্র, কিন্তু পড়াশোনাটা তার কেবল ওই নামেই ছিল, কাজকর্মে তিনি তখন ফুল টাইম টিউটর। সালমা বেগমদের টানাটানির সংসার। সালমা বেগমের বাবা দ্রুত মেয়েকে ঘাড় থেকে নামাতে চাইছিলেন। মোফাজ্জল হোসেন উপায়ান্তর না দেখে দিন রাত টিউশন করানো শুরু করলেন।

ঘটনা জানতে পেরে মোফাজ্জল হোসেনের বড় ভাই যে খুব হৈ চৈ কিছু করেছিলেন তা নয়। তবে মোফাজ্জল হোসেনকে একটা চিঠি পাঠিয়ে তিনি লিখেছিলেন, মোফাজ্জল হোসেনের পেছনে এ পর্যন্ত তার যত টাকা খরচ হয়েছে, সেই টাকার পাই টু পাই হিসেব তার কাছে রয়েছে। টাকা পরিশোধ করার আগ পর্যন্ত মোফাজ্জল হোসেন যেন আর কখনো তার সামনে না যায়। তাদের মধ্যে এখন থেকে আর ভাই-ভাইয়ের সম্পর্ক নেই। এখন থেকে তাদের মধ্যে সম্পর্ক কেবল দেনাদার আর পাওনাদারের।

চিঠির সাথে তিনি টাকার বিস্তারিত হিসাবও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মোফাজ্জল হোসেনও একগুঁয়ে লোক। সেই চিঠি পেয়ে তিনিও প্রতিজ্ঞা করলেন, টাকা শোধ না করা অব্দি তিনি আর বড় ভাইয়ের সামনে যাবেন না। এই নানাবিধ জটিলতায় পড়াশোনাটাও আর শেষ হলো না মোফাজ্জল হোসেনের। সালমা বেগমও গর্ভবতী হয়ে পড়লেন। অনুর জন্ম হলো। সব মিলিয়ে মোফাজ্জল হোসেনের অবস্থা তখন দিশেহারা। দিনরাত টিউশন করিয়েও কুলাতে পারেন না। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও এতটুকু শিক্ষা হলো না তার। পুত্র সন্তানের আশায় আশায় আরো দুটি সন্তান নিলেন তিনি। সেই সন্তানদের নাম তনু আর বেনু।

মোফাজ্জল হোসেন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন। উপার্জনের নানান উপায় খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু ভাগ্যের শিকে আর তার ছেড়েনি। বড় ভাইয়ের সেই টাকাও আর শোধ করতে পারেননি। অল্প বয়সেই শারীরিক মানসিকভাবে বৃদ্ধ হয়ে গেলেন মোফাজ্জল হোসেন। অনু যখন ক্লাস সেভেনে পড়ে, তখন স্ট্রোক করে ডান দিকটা প্যারালাইজড হয়ে গেল তার। শুরু হলো অনু, তনু আর বেনুর বিভীষিকাময় শৈশব। কিন্তু অনু তার শীর্ণ বাহু আর ছোট্ট ছায়া মেলে সেই বিভীষিকাময় সময় থেকে আগলে রাখতে চাইলো পাঁচ আর আট বছরের ছোট দুই বোন তনু আর বেনুকে।

মোফাজ্জল হোসেন কোনোমতে একটা মুদি দোকান দিলেন। যদিও তার অর্ধেক সচল শরীর নিয়ে সেই দোকান কেরোসিনের নিভে যেতে থাকা কুপির মতো জ্বলতে থাকল। অয়নের জন্ম তারও বহু পরে। একটা পুত্র সন্তানের গোপন, গভীর স্বপ্ন বা লোভ থেকে বের হতে পারেননি চিরকালের একগুঁয়ে মোফাজ্জল হোসেন। তবে সেই পুত্র সন্তানটিকেও বেশিদিন দেখার সৌভাগ্য হলো না তার। অয়নের এক বছর এক মাসের মাথায় মারা গেলেন মোফাজ্জল হোসেন। অনু তখন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থী, তনু ক্লাস

এইটে, আর বেনু ফাইভে। মোফাজ্জল হোসেনের মৃত্যুর খবর শুনে অবশেষে তার বড় ভাই। এসেছিলেন। তবে অনুদের সাথে খুব একটা কথাবার্তা বলেননি তিনি। মাঝেমধ্যে সালমা বেগমকে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে তিনি সাহায্য সহযোগিতা করেছেন বলে অনু শুনেছে, তবে তাতে তাদের পরিবারে কোনো পরিবর্তন অনুর চোখে পড়েনি।

অনুর চাচি সুফিয়া বেগম কালেভদ্রে এ বাড়িতে আসতেন। তার সেই আসায় যতটা না সম্পর্ক রক্ষার বিষয় থাকতো, তার চেয়ে বেশি থাকতো নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য জাহির আর নানা বিষয়ে খবরদারি করা। সুফিয়া বেগম এ বাড়িতে আসলেই অনুর মা সালমা বেগম তাই সারাক্ষণ ভীত সন্ত্রস্ত খরগোশের মতো কুঁকড়ে থাকতেন। এখনো থাকেন। অনু যে সুফিয়া বেগমকে তার মায়ের মতো ভয় পায়, বিষয়টি এমন নয়। তবে তারপরও আজ ঘরে ঢুকেই সুফিয়া বেগমকে দেখে অনুর বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। এই ধক করে ওঠার পেছনে সুস্পষ্ট যৌক্তিক কারণ রয়েছে। এতরাতে অনু বাইরে থেকে ঘরে ফিরেছে এই নিয়ে সালমা বেগমের হাড় জ্বালিয়ে খাবেন তিনি। তার ওপর অনুর সাথে অচেনা-অজানা একজন পুরুষ মানুষ! সুফিয়া বেগমের সামনে এতরাতে এভাবে মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে খারাপ ঘটনা আর হতে পারে না।

অনু অবশ্য সুফিয়া বেগমকে দেখে খুব স্বাভাবিক গলায় সালাম দিলো। তারপর বলল, কখন এসেছেন চাচি?

সুফিয়া বেগম অনুর প্রশ্নের জবাব দিলেন না। তিনি অনুর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা আলতাফ হোসেনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আলতাফ হোসেন ঝুঁকে তাকে সালাম দিলেন। অনু বলল, উনি আমার অফিসের কলিগ চাচি।

সুফিয়া বেগম কিছু বলতে চাইছিলেন। তার আগেই অনু খানিক গলা চড়িয়ে বলল, মা, আলতাফ ভাই এখুনি বেরিয়ে যাবেন। উনার স্ত্রী, বাচ্চারা টেনশন করছেন। চট করে একটু চা করে দাও না?

অনু ইচ্ছে করেই এমন করে বলল। অনেকটা এক ঢিলে দুই পাখি মারার মতো ব্যাপার। আলতাফ হোসেনকেও বুঝিয়ে দেয়া যে এখানে বেশিক্ষণ বসা যাবে না। আবার সুফিয়া বেগমকেও বুঝিয়ে দেয়া যে আলতাফ হোসেন বিবাহিত, তার স্ত্রী-সন্তান রয়েছে। তার চেয়েও বড় কথা, স্ত্রী সন্তানের সাথে তার সম্পর্ক ভালো। এই এতরাতেও তারা তার জন্য দুশ্চিন্তা নিয়ে অপেক্ষায় রাত্রি জেগে আছে। যদিও অনু এও জানে যে, আদতে এতে খুব বেশি কাজও হবে না। কারণ সুফিয়া বেগমকে সে হাড়ে হাড়ে চেনে। অন্যরা কেঁচো খুঁড়তে সাধারণ সাপ বের হয়ে আসলে, তিনি খুঁড়লে বের হয়ে আসবে কমপক্ষে অ্যানাকোন্ডা।

আলতাফ হোসেন অবশ্য বেশিক্ষণ বসলেনও না। সুফিয়া বেগমের বিচিত্র সব প্রশ্নে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে গেলেন। সুফিয়া বেগম কোমল গলায় বললেন, কি নাম তোমার বাবা?

আলতাফ হোসেন।

কি করো তুমি?

জি, অনু যেই অফিসে জব করে, আমিও সেই অফিসেই জব করি।

তোমার পোস্ট কি?

প্রজেক্ট ম্যানেজার।

প্রজেক্ট ম্যানেজার কি বড় পোস্ট?

জি, মোটামুটি।

বেতন কত তোমার?

এই তো, চলে যায় খালাম্মা।

চলে গেলে হবে? বয়স তো কম হয় নাই তোমার। মাথার চুলও পড়ে গেছে অর্ধেক। এখনো কোনোমতে চলে গেলে হবে? হবে না।

জি খালাম্মা।

বেতনের কথা যে বলো নাই, এইটা ভালো। তুমি বুদ্ধিমান পুরুষ। বুদ্ধিমান পুরুষ মানুষের এক নম্বর পরিচয় কী জানো?

জি না খালাম্মা।

বুদ্ধিমান পুরুষ মানুষ স্ত্রীর কাছে বেতনের বিষয়ে সঠিক কথা বলে না।

জি খালাম্মা।

বিয়া করছ কত বছর?

এই একুশ বছরে পড়বে।

ছেলেমেয়ে কয়জন?

দুই মেয়ে। মে

য়েরা কি করে?

এই একজন ক্লাস নাইনে পড়ে, আরেকজন এইবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে।

বউ কিছু করে?

জি, একটা কলেজে পড়ায়।

বাহ্! তোমার তো শিক্ষিত, সুখী পরিবার। তাইলে এত রাইতে অন্য জোয়ান মেয়ে নিয়ে ঘোরো কেন?

এই প্রশ্নে আলতাফ হোসেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। তিনি আমতা আমতা করে বললেন, বুঝি নাই খালাম্মা।

বুঝছ ঠিকই, না বোঝার ভান ধরতেছ। শোনো, তোমাকে একটা কথা বলি, পুরুষ মানুষ সবসময় ভাবে নিজের ঘরে আনন্দ নাই। আনন্দ সব বাইরে বা অন্য ঘরে। এই জন্য তারা সবসময় বাইরে, অন্যের ঘরে ঘোরাঘুরি করতে চায়। কিন্তু বাইরে বা অন্যের ঘরে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে শেষে দেখে আনন্দ আসলে নিজের ঘরেই। নিজের ঘর ছাড়া অন্য কোথাও আনন্দ নাই। এই কথা মনে রাখবা? বুঝলা?

জি, খালাম্মা।

.

আলতাফ হোসেন মনে মনে প্রচণ্ড বিরক্ত এবং হতভম্ব বোধ করছেন। এমন অদ্ভুত মানুষ তিনি তার জীবনে দেখেননি। তার ইচ্ছা করছে সুফিয়া বেগমের মুখের উপর উল্টাপাল্টা কিছু একটা বলে দিতে। কিন্তু সেটা শোভন হবে না বলে বলতে পারলেন না। কত আগ্রহ নিয়েই না তিনি এই বাসায় এসেছিলেন। এই বাসায় নিশ্চয়ই একটা বারান্দা আছে। ভেবেছিলেন আধো অন্ধকারে সেই বারান্দায় বসে অনুর সাথে গল্প করতে করতে বৃষ্টি দেখবেন আর চা খাবেন। একটা চমৎকার মুহূর্ত কাটিয়ে বাসায় ফিরে যাবেন। কিন্তু এই অদ্ভুত মহিলা সব নষ্ট করে দিলো। তিনি আচমকা উঠে দাঁড়ালেন, আমি এখন যাব খালাম্মা। রাত অনেক হয়ে গেছে। আসলে বাইরে অনেক ঝড় বৃষ্টি তো। এদিকে অফিসে জরুরি কাজ থাকায় দেরি হয়ে গিয়েছিল। বের হয়ে দেখি যানবাহন কিছু নেই। অতরাতে অনু একা বিপদে পড়ে যেত। আমার সাথে গাড়ি ছিল বলে ভাবলাম পৌঁছে দিয়ে যাই।

সুফিয়া বেগম বললেন, যাও। বউ বাচ্চা ঘরে রেখে বেশি রাত পর্যন্ত বাইরে থাকা ভালো না। অফিস শেষ হবার সাথে সাথে বাসায় চলে যাবে।

সুফিয়া বেগম হয়তো আরো কিছু বলতেন। কিন্তু তার আগেই অনু চলে এলো। সে এই ফাঁকে হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছে। আলতাফ হোসেনকে রাতে খেয়ে যেতে বলা হলো। কিন্তু তিনি তাতে আর আগ্রহ দেখালেন না।

আলতাফ হোসেন চলে যেতেই সুফিয়া বেগম বললেন, অনু, তোর সাথে আমার গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে।

অনু ততক্ষণে ভাত খেতে বসে গেছে। সে সুফিয়া বেগমের দিকে না তাকিয়েই বলল, জি, বলেন।

তোর জন্য আমার খোঁজে ভালো একটা ছেলে আছে। ছেলে আমেরিকান সিটিজেন। বয়সটা একটু বেশি। তা পুরুষ মানুষের আবার বয়স কী? আর তোরও কী বয়স কম হয়েছে? তোর বয়সি মেয়েদের অনেকের নাতী-নাতনিও আছে।

অনু কথা বলল না। সে চুপচাপ ভাত খেয়ে যাচ্ছে। এই মহিলাকে হজম করা কঠিন। কিন্তু সে প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে তাকে হজম করতে। আগামীকাল অফিসে গিয়ে তাকে কী পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে অনু জানে না। এই নিয়ে তার মাথার ভেতরটা চিনচিন করছে। অয়নের সাথেও আজ এখন পর্যন্ত কথা হয়নি। সন্ধ্যার পরপর কোচিং থেকে ফিরে বৃষ্টি পেয়ে অনুর ঘরেই ঘুমিয়ে পড়েছিল অয়ন। এখনো সেখানেই ঘুমিয়ে আছে।

ছেলের আগের ঘরের দুই মেয়ে এক ছেলে আছে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট মেয়েরও বিয়ে ঠিকঠাক। এই সময় ওয়াইফ মারা গেল। এখন ছোট মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেলে একদম নির্ঝঞ্ঝাট। শোন, এই ব্যাপারে তোর ফালতু নাক উঁচু ভাবটা বাদ দে। বাস্তব চিন্তা কর। এই যে বছরের পর বছর এত এত সম্বন্ধ আসলো, কই, কেউ শেষ পর্যন্ত আগালো? আগাবে না। কারণ ছোট দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেছে, বাচ্চা হয়ে গেছে। অথচ বড় বোনের বিয়ে হয় নাই। তার বয়স পঁয়ত্রিশ। এইটা শুনলেই তো যে কেউ ভাববে এই মেয়ের সিরিয়াস কোনো সমস্যা আছে, বড়সর কোনো সমস্যা। এখন সমস্যা থাকলে তো ভালো। না থাকলেই বরং খারাপ। যদি বড়সর কোনো সমস্যা না দেখানো যায়, তখন পাত্রপক্ষ ভাবে সমস্যা এতই গুরুতর যে সেটা প্রকাশ করার মতো না। তারপর ধর, পাত্র যে বিয়ে করে বউ নিয়ে চলে যাবে, সেই উপায়ও নাই। শ্বশুর নাই, বড় শালা সম্বন্ধি নাই, টাকা-পয়সাও নাই, শ্বশুরবাড়ির অবস্থা খারাপ। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির খরচও চালাতে হবে পাত্রের। এই ঘরে জেনে শুনে কে বিয়ে করবে আমাকে বল? শুধু তো স্বপ্ন দেখলেই হবে না। বাস্তবতাটাও তো চিন্তা করতে হবে, তাই না? আমার কথা শুনতে খারাপ লাগে। কিন্তু কী বলি একটু খেয়াল করে শুনলেই বোঝা যাবে। এর চেয়ে ভালো আর। কিছুতে নাই।

সুফিয়া বেগম এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলো কথা বলে দম নিলেন। তারপর আবার বললেন, তার উপর তোর ছোট ভাইটাও পড়াশোনা করে। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করলে শুরু হবে আসল খরচ। সেই খরচ কে চালাবে? এই খরচও তো তোর জামাইকেই চালাতে হবে, না-কি? তা আমাকে বল, তুই ছেলে হলে কি এমন ফ্যামিলিতে, এমন মেয়েকে বিয়ে করতি? করতি না। তোর ভাইকেও করাতি না। কারণ সবাই নিজের ভালো চায়। এখন তুই যদি গো ধরে। থাকিস যে ফ্রেশ, আনম্যারেড ছেলে ছাড়া বিয়ে করবি না। ম্যারেড, ডিভোর্সি, বাচ্চার বাপ হলে তোর সমস্যা, তাহলে তুইই আমাকে বল, সেইটা কি সম্ভব? অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ হলে তো জীবনেও সম্ভব না। কোনো ফ্যামিলিই জেনেশুনে তার ফ্রেশ

ছেলেকে এমন মেয়ের সাথে এমন ফ্যামিলিতে বিয়ে দিবে? দিবে বিয়ে? দিবে না। এখন প্রেম-ট্রেম করে থাকলে আলাদা কথা। প্রেমে দুনিয়ার সবই সম্ভব। কিন্তু সেরকম কিছুও তো শুনি না। এতই যখন ফ্রেশ, আনম্যারেড ছেলের শখ, তাহলে এইসব বুড়াদের সাথে রাত বিরাতে না ঘুরে, ফ্রেশ, আনম্যারেড কোনো ছেলের সাথে ঘুরলেই তো পারিস। তোর চেহারা, ফিগার তো খারাপ না, দেখে তো বয়সও বোঝা যায় না। আনম্যারেড একটাকেও বড়শিতে গাঁথতে পারিস না?

অনুর ভাত খাওয়া শেষ হলো। তার ঘরের পর্দার আড়াল থেকে সালমা বেগম অসহায় চোখে তাকিয়ে আছেন। সুফিয়া বেগম যে কথাগুলো বলছেন, তার সবই বাস্তবতা। এর চেয়ে তিক্ত সত্য আর নেই। গত কয়েক বছরে এই ঘরের প্রতিটি মানুষ তার সাক্ষী। সাক্ষী আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী যে। যেখানে আছে সবাই। অনুর বিয়েটাই এখন সবার আলোচনার বিষয়, মাথাব্যথার কারণ। এই বাস্তবতা যে অনু জানে না, তা নয়। সেও জানে। কিন্তু তারপরও বিবাহিত কাউকে বিয়ে করতে তাকে কিছুতেই রাজি করানো যায়নি। আবার অবিবাহিত পাত্রের পক্ষ থেকে যে বিয়ের সম্বন্ধ একদমই আসেনি, তাও না। কিন্তু একটা দুটো যা-ই এসেছে, তাও নানান অনিবার্য কারণেই কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্যও নয়।

এ বাসায় ইদানীং অনুর বিয়ে নিয়ে কেউ আর কোনো কথা বলে না। কেবল সুফিয়া বেগমই যখন বছরে দুয়েকবার আসেন, তখন এভাবে একদম নগ্নভাবেই কথাগুলো বলেন। সালমা বেগমের তখন অনুর জন্য খুব খারাপ লাগে। কিন্তু অনু বিষয়টা নিয়ে কেমন নির্বিকার হয়ে গেছে। আজও যেমন সে ভাত খাওয়া শেষে হাত ধুতে ধুতে স্বাভাবিক গলায় বলল, আপনি হঠাৎ কী মনে করে এলেন চাচি?

সুফিয়া বেগম থতমত খাওয়া গলায় বললেন, হঠাৎ মানে? আমি আসতে পারি না?

না মানে এমনিতে তো বছরে দুয়েকবারের বেশি কখনো আসেন না। এবার যে মাসখানেকের মধ্যেই এলেন! বিশেষ কোনো কারণ আছে? মানে আমার বিয়ে সংক্রান্ত আলোচনা ছাড়া?

সুফিয়া বেগম সাথে সাথেই জবাব দিলেন না। পানের বাটা থেকে পান বের করে খুব যত্ন করে একটা পান বানালেন। তারপর মুখে পুড়ে দিয়ে বললেন, এই আমেরিকান পাত্রের বিষয়েই তোর মাকে ফোনে দিয়েছিলাম। কিন্তু ফোন ধরার পর থেকেই শুধু কাঁদছিল। জিজ্ঞেস করলাম, বলে না। শেষে অনেকক্ষণ পর বলল, অয়নের না-কি খারাপ অসুখ হয়েছে!

শুনে সালমা বেগমের উপর কিছুটা বিরক্ত হলো অনু। সে চায় না অয়নের এই ব্যাপারটা আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী জানুক। এমনিতেই অয়ন অনেকটা আঁচ করে ফেলেছে। তার ওপর এখন যদি আশেপাশের সব মানুষও জেনে ফেলে, তখন অয়নের কাছ থেকে

এটিকে আর লুকিয়ে রাখা যাবে না। আজই বিষয়টা সালমা বেগমকে স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে। এমনকি সুফিয়া বেগমকেও যেন তিনি অয়নের প্রকৃত অবস্থা আর না বলেন।

অনু বলল, তার মানে আপনি অয়নকে দেখতে এসেছেন?

হ্যাঁ।

তো খারাপ অসুখ হওয়া কোনো রোগীকে দেখতে এসে সেই বাসায় এই সব কথা বলা কি মানায় চাচি?

তুই এভাবে কথা বলছিস কেন? আমি তো অয়নকে দেখে আসলাম। সে কী সুন্দর ঘুমাচ্ছে। গায়ে জ্বরটরও কিছু নেই। আর তোর মাকে এত জিজ্ঞেস করলাম, সেও কিছু বলল না।

সারাদিন অফিস করে এসেছি, এখন এইসব কথা বলার সময় না চাচি।

তোর তো কখনোই এইসব নিয়ে কথা বলার সময় না। গায়ের চামড়া ভাঁজ পড়ে গেলে তোর সময় হবে।

অনু আর কথা বাড়ালো না। সে তার ঘরে গিয়ে অয়নকে ডাকলো। অয়নের গা হালকা গরম। সে গভীর ঘুম থেকে জেগে ওঠা চোখে তাকালো, ওহ্! আমি এখানেই ঘুমিয়ে গেছিলাম?

হ্যাঁ, এখন ওঠ। কিছু খেয়ে নে।

ঘুম এখনো কাটে নাই আপু। এখন আর খাবো না। তুই আমার বিছানাটা একটু করে দিবি? আমি জাস্ট গিয়েই ঘুমিয়ে পড়বে।

যেতে হবে না। তুই এখানেই ঘুমা।

অয়ন আর কথা বলল না। সে মুহূর্তেই আবার গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। সেই সারাটা রাত অনুর এক ফোঁটা ঘুম হলো না। সে সারা রাত অয়নের পাশে জেগে রইল। জেগে থাকতে থাকতে অনুর কত কী যে মনে হলো! একবার মনে হলো, অয়নের বিষয়টা সত্যি নয়। এটা একটা দুঃস্বপ্ন। দুঃস্বপ্নটা দুম করে ভেঙে যাবে। সে ঘুম ভেঙে উঠে দেখবে তার সারা শরীর ঘামে ভিজে জবজব করছে। গলা শুকিয়ে গেছে, বুক ধরফর করছে। সে তখন টেবিল থেকে জগ নিয়ে ঢকঢক করে এক জগ পানি খেয়ে ফেলবে। আর তারপর তার কিছুটা শান্তি লাগবে। অনু হঠাৎ অদ্ভুত একটা কাজ করলো। সে তার চুলের ক্লিপ খুলে হাতের তালুতে আঁচড় কাটতে লাগল। কেটে দেখলো সে ব্যথা পাচ্ছে কি-না। বিষয়টা সে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বইতে পড়েছে। সিনেমায় দেখেছে, মানুষ নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখে সে বাস্তবে আছে, না স্বপ্নে! অনুর কাছে বিষয়টা খুবই হাস্যকর মনে হয়। তার

বিশ্বাস হয় না যে, সত্যি সত্যি মানুষের জীবনে কখনো এমন মুহূর্ত আসে যে তাকে নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখতে হয় সে স্বপ্নে আছে, না বাস্তবে! আজ এই নিঘুম রাতের নিঃশব্দ অন্ধকারে অনু নিজেই সেই হাস্যকর কাজটি করলো এবং বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, অনুর হঠাৎ মনে হলো। ক্লিপের এই তীক্ষ্ণ আঁচড়েও সে কোনো ব্যথা পাচ্ছে না। অনু বার কয়েক চেষ্টা করলো। কিন্তু ফলাফল একই। তার শরীর কেমন বোধহীন, অসাড়। অনু। ক্লিপের আরো ধারালো অংশ দিয়ে আরো তীব্র আঁচড় বসালো। তার হাত কেটে দরদর করে তাজা রক্ত বের হলো। কিন্তু অনুর তখনো মনে হচ্ছিল কোনো শারীরিক ব্যথা সে টের পাচ্ছে না। কী অদ্ভুত! তার বুকের ভেতরটা কেবল হুহু করে বয়ে যাওয়া শীতল বাতাসের হাহাকারের মতো কেমন এক তীব্র মাতমে তাকে নিঃস্ব করে ফেলতে লাগল। সেই মাতমে আলো ও অন্ধকার, বাস্তব ও বিভ্রম কোনো কিছুকেই যেন সে আর আলাদা করতে পারছে না।

২

বুড়ো আঙুলের উঠে যাওয়া নখটা খুব ভোগালো নুহাকে। দিন কয়েক বাইরে বের হওয়াও বন্ধ হয়ে গেল। এই সময়ে তাকে একদিন চমকে দিলো অয়ন। গভীর রাতে ফোন করে বলল, আপনার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলতে চাই।

অয়নের ফোন নেই নুহা জানে। প্রয়োজনে মাঝে মধ্যে এর ওর নম্বর থেকে ফোন করে সে। কিন্তু এত রাতে কখনো অয়নের সাথে তার ফোনে কথা হয়নি। তাছাড়া খানিকটা তন্দ্রাচ্ছন্ন নুহা অয়নের ঠান্ডায় বসে যাওয়া গলাও হঠাৎ চিনতে পারল না। বিরক্তি মেশানো গলায় বলল, কে?

অয়ন বলল, আমি।

আমি কে?

অয়ন।

অয়ন! কী রে? এতরাতে?

এমনি। ঘুম আসছিল না।

কেন? ঘুম আসছিল না কেন?

জানি না কেন।

মন খারাপ?

অয়ন উত্তরটা দিতে কিছুক্ষণ সময় নিলো। তারপর বলল, উঁহু।

মন খারাপ কেন বল?

মন খারাপ বলিনি তো!

তোকে আমি চিনি না ভাবছিস?

চিনিস?

হ্যাঁ, চিনি।

কতটুক চিনিস?

পুরোপুরির চেয়ে একটু কম।

একটু কম কেন?

সবকিছুতেই একটু কম থাকা ভালো, তাহলে আগ্রহটা থাকে। পুরোপুরি চিনে ফেললে সমস্যা, তখন আগ্রহটা শেষ হয়ে যায়!

তুই কি জানিস, তুই বড়দের মতো করে কথা বলিস?

আমি তো বড়ই!

তুই বড়? আমার চেয়ে চার মাস নয় দিনের ছোট তুই।

তারপরও আমি তোর চেয়ে বড়।

কীভাবে?

মেয়েরা সবসময় ছেলেদের চেয়ে বড় হয়।

সবসময়?

হুঁ, সবসময়। দেখিস না, ছেলেদের বিয়ে হয় তাদের চেয়ে বয়সে অনেক অনেক ছোট মেয়েদের সাথে। আর মেয়েদের দেখ? এই এটুক ছোট ছোট মেয়েদেরও কত বড় বড় লোকের সাথে বিয়ে হয়। ধর, তুই যাকে বিয়ে করবি, দেখা গেল সেই মেয়ে এখন ক্লাস টু-থ্রিতে পড়ছে। এমনও হতে পরে সে এখন তার মায়ের কোলে বসে ফিডার খাচ্ছে। হা হা হা!

নুহা জলের কলরোলের মতো হাসছে। কিন্তু অয়নের কেন জানি আরো মন খারাপ হয়ে গেল। সে বলল, আর তুই যাকে বিয়ে করবি সে এখন কি করছে?

সে এখন কী করছে, তা জানি না। তবে আমার জন্য গত দু'বছরে যে পরিমাণ বিয়ের প্রস্তাব এসেছে, শুনলে তুই ভিরমি খেয়ে যাবি। কই তোর জন্য একটাও বিয়ের প্রোপোজাল এসেছে? তুই না আমার চেয়ে চার মাসের বড়? শোন আমার জন্য যে বিয়ের প্রস্তাবগুলো আসছে তার মধ্যে চল্লিশ বছরের এক আংকেলও আছেন! এখন বোঝ, আমি তোর চেয়ে কত বড়?

নুহা আবারো হা হা হা করে হেসে উঠল। এই হাসি আগের হাসির চেয়েও তীব্র। কিন্তু অয়নের কেন যেন কোনো আনন্দ হচ্ছে না। সে এখানে এমন শরীর কাঁপানো হাসির কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না। বরং তার বুকের ভেতর কোথায় যেন চিনচিন করে একটা সূক্ষ্ম ব্যথা হচ্ছে। সেই ব্যথায় তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

অয়ন বলল, রাখি আমি?

কেন, রাখবি কেন? তোর মন খারাপ কেন সেটাই তো এখনো বললি না।

আমি আসলে জানি না আমার কেন মন খারাপ!

বাসায় কিছু হয়েছে?

উঁহু।

তাহলে?

অয়ন অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। কদিন থেকেই তার ভেতরে ভেতরে একটা সুপ্ত কিন্তু তীব্র ইচ্ছা ক্রমশই জেগে উঠছে। তার খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, নুহা যদি তার অসুখের বিষয়টা জানে, তাহলে কী করবে সে? কিন্তু অয়ন এখনই নুহাকে জানাতে চায় না। সে আরো নিশ্চিত হয়ে নিতে চায়। যদিও অনু বা সালমা বেগম কেউই এখনো তাকে কিছুই বলেনি। আদৌ বলবে কি-না তাও অয়ন জানে না।

তবে গতকাল সুফিয়া বেগম কিছু কথা বলেছেন অয়নকে। ভোরবেলা অনু অফিসে চলে যেতেই সুফিয়া বেগম অয়নকে বললেন, শুনলাম তোর না-কি অসুখ। কিন্তু আসার পর তো দেখছি শুধু নাক ডেকে ঘুমাচ্ছিস?

অয়ন কথা বলল না। মৃদু হাসলো। সে এই মানুষটাকে পারতপক্ষে ঘাটায় না। বরং খানিকটা ভয়ই পায়। সুফিয়া বেগম আবার বললেন, কী হয়েছে। তোর?

কিছু হয়নি তো!

সর্দি, কাশি? না ডায়রিয়া? এগুলো এখন সবার হচ্ছে।

উঁহু।

মাথা ব্যথা?

নাহ।

চোখে কম দেখিস? এই বয়সে কিছু ছেলে মেয়ে মাথাব্যথা আর চোখে কম দেখার ভান ধরে। আসলে তো কিছু না। সবই চশমা নেয়ার ধান্ধা।

অয়ন চুপ করে মৃদু হাসলো।

শরীরে কোনো সমস্যা? ব্যথা আছে কোথাও?

না।

সুফিয়া বেগম অয়নের কপালে হাত দিয়ে বললেন, কই জ্বরও তো নাই? তো শরীরে ব্যথা নাই, জ্বরজারি নাই, পাতলা পায়খানা নাই। দিব্যি সুস্থ একটা ছেলে। তা তোর মা গতকাল ফোন দিয়ে অমন হাউমাউ করে কাঁদলো কেন?

মা আপনাকে ফোন দিয়ে হাউমাউ করে কেঁদেছে?

হ্যাঁ কেঁদেছে। তার ছেলের না-কি কি বড় অসুখ হয়েছে, কেঁদে-কেটে অস্থির। এত জিজ্ঞেস করলাম কী হয়েছে, তা বলল না। আসলে হয়েছে কী, তিন মেয়ের পর শেষ বয়সে এসে একটামাত্র ছেলে তো, সর্দি লাগলেও মনে হয় কি-না কি হয়েছে! কথায় আছে না, এক মায়ের এক পুত, মইরা গেলে টুককুরুত। তোর মায়ের হয়েছে সেই অবস্থা বুঝলি? তুই কিন্তু আবার চিন্তা করিস না। সব ঠিক আছে। এই বয়সে আবার ছেলে মানুষের অসুখ বিসুখ কি!

সুফিয়া বেগমের এইটুকু কথায়ই অয়ন অনেক কিছু বুঝে ফেলল। একদিন নানান কিছু দেখেশুনে সে বুঝতে পারছিল, কিছু একটা হয়েছে তার। কিন্তু এখন সে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে গেল যে তার খারাপ কোনো অসুখই হয়েছে। তবে অয়ন জানে না, তার সেই খারাপ অসুখটি কি? কিংবা সেটি আসলে কতটুকু খারাপ? তার ধারণা, ভালো চিকিৎসা করালেই সে সুস্থ হয়ে উঠবে। কিন্তু সেই ভালো চিকিৎসার খরচটা আসলে কত? নিশ্চয়ই সেটি অনেক টাকার ব্যাপার। এখন এই টাকাটা জোগাড় করাটাই আসল সমস্যা। এই নিয়েই হয়তো সালমা বেগম আর অনু সারাক্ষণ ভয়ানক দুশ্চিন্তায় থাকেন।

দুশ্চিন্তায় থাকার অবশ্য যথেষ্ট কারণও রয়েছে। যে বাড়িতে চাল, ডাল, তেল, নুনের দাম কেজিতে দুয়েক টাকা বেড়ে গেলেই দুশ্চিন্তায় সবার মাথা খারাপ হয়ে যায়, সে বাড়িতে কারো চিকিৎসার জন্য যদি হঠাৎ লাখ লাখ টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তখন পরিস্থিতিটা কী হবে, তা সহজেই অনুমেয়। অনু আর সালমা বেগমের এমন উৎকণ্ঠিত, বিচলিত অবস্থাটা তাই অয়ন বুঝতে পারছে। কিন্তু অয়নের ধারণা টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তার চিকিৎসাও হয়ে যাবে। এই নিয়ে এত দুশ্চিন্তার কিছু নেই।

অয়ন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নুহাকে বলল, আচ্ছা নুহা, আমার যদি কখনো বড় কোনো অসুখ হয়, বা ধর বড় কোনো বিপদ হলো, তোর কী তখন আমার জন্য খারাপ লাগবে?

এটা কী ধরনের কথা হলো অয়ন?

কেন, এমন হতে পারে না?

পারবে না কেন? সেটা তো যে কারো হতে পারে। আমারও হতে পারে। শোন অয়ন, সেদিন সন্ধ্যায় তোকে অনেক অন্যরকম লাগছিল। কিন্তু আজ কেমন বাচ্চাদের মতো কথা বলছিস তুই।

আমি মনে হয় বাচ্চাই নুহা। সবাই তাই বলে।

কী হয়েছে তোর বল তো?

কিছু হয়নি। হঠাৎ মনে হলো, আমার যদি কখনো বড় কোনো কিছু হয়ে যায় তখন আমার কাছের মানুষেরা কেমন করবে?

সবাইকেই এভাবে জিজ্ঞেস করছিস?

নাহ্। তোকেই প্রথম।

কেন? আমিই কি তোর সবচেয়ে বেশি কাছের মানুষ?

নুহার এই প্রশ্নে অয়ন থমকে গেল। আসলেই তো। সে নুহাকেই কেন সবার আগে এই কথাটি জিজ্ঞেস করলো? সে তো আরো অনেককেই জিজ্ঞেস করতে পারতো! মা, অনু, তনু, বেনু, আরো কত কেউ আছে। কিন্তু সে সবার আগে নুহাকেই কেন কথাটা বলল? না-কি মা, অনু, তনু, বেনুর ব্যাপারে সে নিশ্চিত। সে জানে তার কিছু হয়ে গেলে তারা কেমন ব্যাকুল হয়ে যাবে। কিন্তু নুহার ব্যাপারে সে নিশ্চিত নয়। সে জানে না, তার কিছু হলে নুহার কেমন লাগবে। আর এই জন্যই সে জানতে চাইছে, নিশ্চিত হতে চাইছে। কিন্তু নুহার ব্যাপারে এই নিশ্চিত হওয়াটা তার কাছে এত জরুরি কেন?

অয়ন বলল, নাহ্, হয়তো কাছের মানুষদের মধ্যে তুই দূরের বলেই তোকে আগে জিজ্ঞেস করা।

আমি দূরের মানুষ?

আমার তো খুব বেশি কাছের মানুষ নেই রে। ওই মা আর আপুরা, তার বাইরে তুই।

অয়ন?

হু।

তোর কী হয়েছে আমাকে একটু সত্যি করে বলবি?

হ্যাঁ বলব। তবে এখন না। কয়েকটা দিন যাক। আর তোকে তো বলতেই হবে। সামনে তো অনেক কাজ।

কিসের কাজ?

যখন বলব, তখনই জানতে পারবি।

তুই এমন কেন অয়ন?

অয়ন জবাব দিলো না। ঠিক এই মুহূর্তে অয়নের মাথায় অদ্ভুত এক চিন্তা কাজ করছে। তার সত্যি সত্যি মনে হচ্ছে, তার যদি বড় কোনো অসুখ হয়ে থাকে, তবে তা খুব একটা

খারাপ হবে না। বরং তখন সে জানতে পারবে, কে তাকে কতটা ভালোবাসে, কার কাছে তার গুরুত্ব কতটা!

তার বন্ধুরা তখন কে কী করবে তার জন্য? শিক্ষকরা কী করবে? নুহা কী করবে? আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে যাবে শুনে! তাকে কী সবাই দেখতে আসবে? কান্নাকাটি করবে কেউ কেউ? তার চিকিৎসার জন্য নানান ক্যাম্পেইনিং হবে? সকলের চোখের আড়ালে, মনোযোগের বাইরে থাকা অয়ন কী হুট করেই সকলের চোখের সামনে চলে আসবে? সবার ভাবনা, আলোচনা, মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে?

কী আশ্চর্য, বিষয়গুলো ভেবে অয়নের ভেতরে ভেতরে কেমন একটা উত্তেজনাও কাজ করছে! মানব মন আসলেই বিচিত্র, রহস্যময়ও বটে।

নুহা বলল, তুই ঘুমাবি না অয়ন?

হ্যাঁ ঘুমাবো।

শোন, এখন শুয়ে পড়। কাল আমরা কথা বলব। আমি কাল থেকে আবার বের হতে পারব।

আচ্ছা।

নুহা ফোন রাখতে গিয়ে হঠাৎ বলল, আচ্ছা, এত রাতে এটা কার ফোন থেকে ফোন দিলি তুই?

আমার ফোন।

তোর ফোন! তুই ফোন কিনেছিস? কে কিনে দিয়েছে?

কে আবার? বড়'পু।

কি ফোনরে?

অয়ন ফোনের মডেল বলল। শুনে ভারি অবাক হলো নুহা। অয়নদের অবস্থা সে জানে। এত দাম দিয়ে অয়নকে হঠাৎ ফোন কিনে দিলো কেন অনু আপু?

আচ্ছা। ফোনটা ভালো, কিন্তু হঠাৎ এত টাকা দিয়ে তোকে ফোন কিনে দিলো কেন আপু?

জানি না তো!

সত্যি জানিস না? না-কি লুকাচ্ছিস?

আরে ধ্যাৎ, লুকাবো কেন?

তাহলে বলছিস না কেন? অনু আপু তোকে এত দাম দিয়ে ফোন কিনে দিলো। তাও আবার তোর পরীক্ষার আগে আগে। ব্যাপার কী বল তো? এই এত এত দিনে, কত কত অনুরোধ। কিন্তু কখনোই একটা সস্তা, কম দামি ফোনও দেননি। আর ঠিক পরীক্ষার আগে আগেই এত দামি একটা ফোন কিনে দিলেন কেন আপু? ঘটনা কি? না-কি মিথ্যে বলছিস? অন্য কোনো ঘটনা নেই তো?

নুহার কথার উত্তরে কিছু একটা বলতে গিয়েও অয়ন বলার মতো কিছুই খুঁজে পেল না। তার আচমকা মনে হলো, আসলেই তো! এই বিষয়টি তো সে ভাবেনি। ফোনটা পেয়ে এত আনন্দিত হয়ে গিয়েছিল সে যে এত কিছু ভাবেইনি। কিন্তু নুহা তো ঠিকই বলেছে। তার পরীক্ষার আগে তো পৃথিবী উল্টে গেলেও অনু তাকে ফোন কিনে দিবে না। তার উপর এত দামি ফোন? তনুর বাচ্চা হতে গিয়েই কত কত টাকা চলে গেল অনুর। ধারও করতে হলো বিস্তর। দুই মাসের বাসা ভাড়া অব্দি বাকি পড়ে গেল। তার ওপর অসুস্থ হয়ে পড়লো অয়ন, সেখানেও খরচ। সামনে অয়নের পরীক্ষা, সেখানে খরচ। এরমধ্যে এতগুলো টাকা খরচ করে তাকে ফোন কিনে দেয়ার ঘটনা এখন রীতিমতো অবিশ্বাস্য লাগতে লাগল অয়নের কাছে। তার হঠাৎ মনে হলো, এই ফোনের সাথে বড় ধরনের কোনো একটা ঘটনা আছে। ঘটনাটা সে ধরতে পারছে না। তার অসুস্থতা নিয়ে, চিকিৎসার টাকা জোগাড় নিয়েও যেখানে সবাই সারাক্ষণ দুশ্চিন্তায় থাকে, সেখানে, সেই পরিস্থিতিতেই তাকে এমন একটা ফোন কিনে দেওয়ার ঘটনা স্বাভাবিক নয়। একদমই স্বাভাবিক নয়। বরং অস্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু সেই অস্বাভাবিক ঘটনাটি আসলে কী!

*

অফিসে অনুর সমস্যার একটা সমাধান বের করে ফেললেন আলতাফ হোসেন। কিন্তু সমাধানটা শুনে অনু কেন যেন আনন্দিত হতে পারল না। বরং তার মনে হলো, আলতাফ হোসেন যেমন সমাধান বের করে ফেলেছেন, তেমনি সমস্যাটাও আসলে তিনিই তৈরি করেছেন।

আলতাফ হোসেন তাকে রুমে ডেকে বললেন, অনু, আপাতত একটা সমাধান বের করা গেছে।

অনু আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইলো, কী সমাধান ভাইয়া?

আমরা পাঁচ দিনের জন্য একটা সার্ভে টিম নিয়ে আবার ফিল্ডে যাব। যতটা সম্ভব ফিল্ড থেকেই ক্রস চেকের রিপোর্ট আর আমাদের আগের রিপোর্টের সাথে চেক করে একটা রিপোর্ট করে ফেলব। আসলে গ্যাপটা কেন হয়েছিল, কোথায় হয়েছিল, সেটা দেখাবো।

কিন্তু ম্যানেজমেন্ট কি এতে রাজি হবে ভাইয়া?

সেটা আমার দায়িত্ব। আপনি টেনশন করবেন না। তবে একটা সমস্যা আছে।

কী সমস্যা ভাইয়া?

আমাদের খরচ কমাতে হবে। ট্রান্সপোর্ট, অ্যাকোমডেশন, ফুড এইসব ক্ষেত্রে কস্ট রিডাকশন করতে হবে। আসলে যত কম খরচে সম্ভব কাজটা প্রোপারলি শেষ করতে হবে। কারণ অফিস এই খরচটাই করতে চাইছিল না। অনেক ঝামেলা করে অফিসকে রাজি করানো গেছে। অফিস এমনকি ট্রান্সপোর্টের জন্য আলাদা কোনো গাড়িও দিবে না। বাসে যেতে হবে। তবে আমি আমার গাড়িটা নিয়ে যাব। ধরুন আপনি আর আমি আমার গাড়িতে চলে গেলাম দু'দিন আগে। বাকি টিম দুই দিন পরে বাসে চলে এলো।

আমরা দুজন আলাদা যাব কেন ভাইয়া? সবাই একসাথে গেলেই ভালো হতো না?

পুরো টিম পৌঁছানোর আগেই আগেভাগে গিয়ে কিছু বিষয় রেডি করে ফেলতে হবে আমাদের। ওগুলো আপনি আর আমি ছাড়া তো অন্য কেউ পারবে না অনু।

আলতাফ হোসেনের কথাবার্তা খুবই স্বাভাবিক। পরিস্থিতি বিবেচনায় বরং তার প্রতি অনুর কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত। অনুর চাকরিটিই হয়তো বাঁচিয়ে দিলেন তিনি। এই মুহূর্তে চাকরি চলে গেলে অনুকে আক্ষরিক অর্থেই অথৈ সমুদ্রে পড়তে হতো। কিন্তু অনু কেন যেন আলতাফ হোসেনের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারছিল না। বরং তার ভেতর ভেতর অন্য একটা ভাবনা জেগে উঠে তাকে সতর্ক করে দিচ্ছিলো।

অনু বলল, ভাইয়া, আমাদের সাথে যেহেতু গাড়ি আছে, আমরা তো টিম থেকে আরো দুয়েকজন নিয়ে যেতে পারি। ওখানে ওরা আমাদের কাজেও হেল্প করতে পারবে আবার দুজনের বাসের টিকেটের খরচও বেঁচে যাবে।

হুম। কিন্তু আরেকটা সমস্যা আছে অনু। প্রথমত অ্যাকোমডেশন। এটাতেই সবচেয়ে বেশি খরচ যায় আমাদের। আমরা এবার চাইলেই আগের মতো পুরো টিম নিয়ে কোনো রেস্ট হাউজ বা হোটেলে উঠতে পারব না। তাদের জন্য হয়তো লোকালি কোথাও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। আর আপনি আর আমি হয়তো আমাদের জন্য আলাদা কোনো ব্যবস্থা করে নেবো।

আলাদা ব্যবস্থা?

আপনি চিন্তিত হবেন না। আমার উপর ছেড়ে দিন। আশা করছি, ভালো কোনো ব্যবস্থাই হবে। আর আমরা যেহেতু আগেভাগে যাচ্ছি, সো দেখেশুনে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ তো থাকছেই।

জি ভাইয়া।

আলতাফ হোসেনের কথা সত্য। তবে পরিস্থিতি আন্দাজ করে অনু খানিক দমে গেল। অন্য সময় হলে হয়তো তার মনে কোনো সংশয় থাকত না। কিন্তু এবার থাকছে। সে

আসলে সেদিন রাতের আলতাফ হোসেনকে মাথা থেকে তাড়াতে পারছে না। অধিকন্তু বিষয়টা তার মনের ভেতরে কেমন কাঁটা হয়ে বিধে খচখচ করছে।

দিনের বাকিটা সময় অনু আর তার কাজে মন বসাতে পারল না। দুপুরে লাঞ্চের সময় আলতাফ হোসেন বললেন, ধরে নিন আপনি আর আমি শুক্রবারেই রওয়ানা করে যাচ্ছি। আর বাদ বাকি সবাই না হয় রবিবারে পৌঁছে যাবে। আপনাকে আজকেই একটা অ্যাপ্রোক্সিমেট বাজেট রেডি করে ফেলতে হবে। আমি ডিটেলস প্ল্যান পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অনু মৃদু স্বরে বলল, আচ্ছা।

কিন্তু ডেস্কে ফিরে অনুর স্বস্তি হচ্ছিল না। বাজেট করতে গিয়েও কাজে পুরোপুরি মনোযোগ দিতে পারছিল না সে। অনুর ডেস্কের ঠিক উল্টো দিকেই বসে হাসান। হাসান কাজ করে আলাদা প্রজেক্টে। কিছুটা চুপচাপ মৃদুভাষী ধরনের মানুষ সে। বয়সে অনুর সমবয়সি বছরখানেকের ছোট হলেও অফিসে হাসানের পদ অনুর চেয়ে বড়। হাসান হঠাৎ অনুকে বলল, আপনি কি কোনো কারণে আপসেট?

অনু চমকে যাওয়া গলায় বলল, না তো। কেন বলুন তো?

আপনি ডাইনিংয়ে ফোন রেখে এসেছিলেন। আমি নিয়ে এসে আপনার পাশে রেখে দিলাম। আপনি খেয়ালই করলেন না। আর এখন অনেকক্ষণ থেকে ফোনটা বাজছে।

অনু বিব্রত ভঙ্গিতে ফোনটা দেখলো। অয়ন ফোন করেছে, অনু কিছুটা অবাক হয়েই ফোনটা ধরলো। অয়ন বলল, আপু শামীম ভাই তনু আপুকে অনেক মেরেছে।

অনু ফোনের ভলিয়ুম কমাতে কমাতে বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো। মুখের কাছে হাত নিয়ে অনুচ্চ গলায় বলল, কী হয়েছে?

শামীম ভাই তনু আপুকে আজ খুব মেরেছে।

কেন?

তনু আপু কাউকে কিছু বলেনি। কিন্তু মাথা ফেটে রক্ত বের হচ্ছে।

শামীম কই?

শামীম ভাই বের হয়ে গেছে।

আর তনু?

মা তনু আপুকে নিয়ে হাসপাতালে যাবে। কিন্তু...

আচ্ছা। তুই এক কাজ কর, আমার রুমের আলমারির উপরে একটা ছোট লাল পার্সের মতো ব্যাগ রাখা আছে। ওটার ভেতর কিছু টাকা থাকার কথা। একটু দেখতো।

তুই আসতে পারবি না?

দেখছি।

অনু ফোন রেখে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইল। তার মাথার বা দিকটায় চিনচিন করে তীক্ষ্ণ ব্যথা হচ্ছে। গরমও লাগছে ভীষণ। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য মনে হলো, মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যাবে সে। কিন্তু পড়লো না। কোনো মতে সামলে নিলো। তারপর ওয়াশরুমে গিয়ে দীর্ঘসময় নিয়ে চোখে মুখে পানির ঝাঁপটা দিলো সে। তারপর আয়নার দিকে তাকিয়ে রইল নিস্পলক। এলোমেলো চুল, কালি পড়ে যাওয়া চোখের কোল, প্রসাধনীবিহীন মুখ। কিন্তু তারপরও আয়নার ওই মেয়েটার জন্য খুব মায়া হতে লাগল অনুর।

অনু অবশ্য তখনই বের হতে পারল না। বের হতে হতে তার সন্ধ্যা হয়ে এলো। এর মধ্যে অয়ন বার কয়েক ফোন করেছে। কিন্তু অনু ধরার মতো অবস্থায়ই ছিল না। তাকে তিন তিনবার বাজেট করে আলতাফ হোসেনকে দেখাতে হলো। প্রথম দুবারে প্রচুর কাটছাট, যোগ-বিয়োগের পর তৃতীয়বারের বাজেট জমা নিলেন আলতাফ হোসেন। তারপর পাঠিয়ে দিলেন ফাইনাল অ্যাপ্রুভালের জন্য। হাসপাতালে পৌঁছাতে পৌঁছাতে আটটা বেজে গেল অনুর। তনুর মাথার আঘাত তেমন গুরুতর না হলেও খাটের কোণায় লেগে অনেকখানি কেটে গিয়েছে। রক্তও গিয়েছে প্রচুর। তনুকে মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা দেখে অনুর অবশ্য তেমন খারাপ লাগল না। তার মনে হলো মাথায় সাদা ধবধবে ব্যান্ডেজ বাধা তনুকে দেখতে সুন্দর লাগছে। তার এই সুন্দর লাগার কারণ ব্যান্ডেজ। সিনেমার নায়িকাদের মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা থাকলে তাদের এমন সুন্দর দেখায়!

ডাক্তার চেয়েছিলেন তনুকে অন্তত একটা রাত হাসপাতালে রেখে দিতে। কিন্তু তনু থাকতে চাইল না। অনেক বুঝিয়েও রাখা গেল না তাকে। আসলে ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড অপরাধবোধে ভুগছে সে। তার কারণে আবার কতগুলো। টাকা খরচ হয়ে গেল অনুর। তার ওপর এখন একটা রাত হাসপাতালে থাকলে খরচ আরো বেড়ে যাবে। অনুও অবশ্য খুব একটা জোরাজুরি করল না।

বাসায় ফিরে গভীর রাতে তনুর ঘরে গেল অনু। তনু তখন হাফসাকে ঘুম। পাড়িয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিল। ঘরে ঢুকেই আলো জ্বালালো অনু। তনু সাথে সাথেই আর্তনাদের মতো করে বলল, লাইটটা জ্বালাস না আপু। প্লিজ।

অনু বাতি নিভিয়ে দিয়ে তনুর পাশে গিয়ে বসলো। তনু অপরাধীর মতো গলায় বলল, আমি খুব সরি আপু।

সরি কেন?

আবার এতগুলো টাকা নষ্ট করলাম তোর।

অনু অন্ধকারে বিছানা হাতড়ে একটা বালিশ খুঁজে নিয়ে নিজের পিঠের নিচে দিলো। তারপর বলল, কী হয়েছিল?

সকাল থেকেই শরীরটা খারাপ লাগছিল। বিছানা থেকে নামতে গিয়ে মাথাটা হঠাৎ কেমন করে উঠল। মনে হলো চারপাশে সবকিছু বনবন করে ঘুরছে। সামলাতে পারলাম না, মাথা ঘুরিয়ে পড়ে গেলাম একদম খাটের কোণায়। কিন্তু এইটুকুতে এতখানি কেটে যাবে...।

শামীম কী আজকাল প্রায়ই তোর গায়ে হাত তোলে?

তনু অবাক হবার ভঙ্গিতে বলল, শামীম আমার গায়ে হাত তুলবে কেন আপু?

পুরুষ মানুষের গায়ে হাত তোলার কারণ তো ওই একটাই, তারা পুরুষ মানুষ। আর সব কারণগুলো তো শুধুমাত্র অজুহাত।

না আপু, শামীম কিছু করেনি। তুই তো জানিসই ও কেমন মানুষ?

আমি জানি বলেই বলছি। তুই এতদিন লুকিয়ে রেখেছিস দেখে আমি ইচ্ছে করেই কিছু জানতে চাইনি। তোকে বিব্রত করতে ইচ্ছে হয়নি।

তনু চুপ করে রইল। অনুও। দুজনের মাঝের অন্ধকারটা যেন ক্রমশই গাঢ় হচ্ছিল। অনেকক্ষণ পর তনু খুব মৃদু গলায় বলল, আমার ওপর তোর অনেক রাগ না আপু?

রাগ? কেন?

ওভাবে কারো কথা না ভেবে শামীমকে বিয়ে করে ফেললাম!

এই এত বছর আগের কথা আজ কেন?

আমার আজকাল খুব মরে যেতে ইচ্ছে করে আপু। মনে হয় সুইসাইড টুইসাইড করে ফেলি। শুধু হাফসার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু করতে পারি না।

মরে যেতে ইচ্ছে করে কেন?

খুব, খুব অপরাধী লাগে নিজেকে। তোর জীবনটা আমি নষ্ট করে দিলাম। সাথে আমার জীবনটাও।

আমার জীবন নষ্ট হয়েছে কে বলল? আর তুই কিভাবে আমার জীবন নষ্ট করবি?

করেছি। আমি জানি তুই কখনোই আমাকে কিছু বলবি না। কোনোদিনই না। আসলে কাউকেই বলবি না।

তনু দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, তুই যখন নিজের কথা বাদ দিয়ে আমাদের সবার কথা ভাবছিলি, আমি তখন সবার কথা বাদ দিয়ে শুধু নিজের কথা ভাবলাম। কী অকৃতজ্ঞ আমি! সেই ওইটুকু বয়সেই যদি ওভাবে শামীমের সাথে সম্পর্কটায় না জড়াতাম, কারো কথা না শুনে, না ভেবে ওভাবে পালিয়ে বিয়ে করে না ফেলতাম, যদি তোর সাথে আমিও একটু একটু করে সংসারের হাল ধরার চেষ্টা করতাম, তাহলে সবকিছু অনেক অন্যরকম হতে পারতো।

অনু এই প্রসঙ্গে কিছু বলল না। সে বলল, শামীম কি টাকা-পয়সা কিছু চাইছে?

না আপু। টাকা চাইবে কেন?

টাকা মানুষ যে-কোনো কারণে চাইতে পারে, কারণ না থাকলেও।

না আপু, ও কিছু চায়নি।

মিথ্যে বলছিস কেন? মা সব শুনেছে বাইরে থেকে।

তনু জানে, এই কথা সে লুকিয়ে রাখতে পারবে না। তারপরও অনুর কথার কোনো জবাব দিল না সে। চুপ করে রইল। অনু বলল, কত টাকা চাইছে?

বাদ দে না প্লিজ। আমার আর ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে, আমি হচ্ছি সেই মানুষ যে কারো দিকে চোখ তুলে তাকানোর অধিকার রাখি না। কারো সাথে আদর, আবদার, ভালোবাসার কথা বলার অধিকার রাখি না। আহ্লাদ করার অধিকার রাখি না। আমি সবার কাছে সব অধিকার নিজেই হারিয়েছে। আমার প্রতিটা মুহূর্ত কাটে ভয়ে। মনে হয়, আমি যে এই কথাটা তাকে বলব, এটা বলার কোনো মুখ কি আমার আছে? নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ মনে হয় আমার। আমি সবসময় সবাইকে ভয় পাই। এই বুঝি কেউ আমার কথায়, আচরণে কষ্ট পেল। অয়নের কথা আমি ভাবতে পারি না-রে আপু। আমার চিন্তা-ভাবনা সব ফাঁকা হয়ে যায়। বুকের ভেতরটা ভেঙে-চুরে যায়। কিন্তু আমি কাঁদতে পারি না, আমি অয়নের কাছে গিয়ে বসতে পারি না। আমার সাহস হয় না। মনে হয় সেই অধিকারটাও আমার নেই। মনে হয় কেউ যদি বলে, এখন কাঁদছিস কেন? তখন তো কারো কথা ভাবিসনি! কেউ যদি বলে...। আপুরে! এই যে তিন সাড়ে তিন মাসের হাফসা, ওকেও আমি ভয় পাই জানিস? আমার ভেতরের অপরাধবোধ আর অক্ষমতা আমাকে শেষ করে দিচ্ছে আপু। আমি আর পারছি না।

অনু চুপ করে বসে রইল, তনুর কথার কোনো জবাব দিল না। তারপর অন্ধকারেই তনুর হাত খুঁজে নিয়ে হাতটা তার হাতের মুঠোয় চেপে ধরলো। তনু কিছুক্ষণ তার হাতটা

নির্জীব ফেলে রাখলো অনুর হাতে। তারপর ধীরে অনুর হাতটা শক্ত করে চেপে ধরলো। তারপর বসে রইল নিথর, নিজীব। যেন আবছা অন্ধকার ক্যানভাসে খানিক গাঢ় কালো কালিতে আঁকা একজোড়া বিমূর্ত স্থির ছায়ামূর্তি। সেই স্থির ছায়ামূর্তি দুজনের যে প্রাণ আছে তা কেবল প্রাণ দিয়েই অনুভব করা সম্ভব। চোখ দিয়ে নয়। পাঁচ বছর বয়সের ব্যবধানের দুজন নারী, দুটি বোন এই আবছা অন্ধকারে কোনো কথা না বলেও, কোনো শব্দ না করেও যেন অবিরাম বলে যেত লাগল বুকের ভেতর জমিয়ে রাখা শত সহস্র অব্যক্ত কথা। সেই কথায় দুঃখ আছে, অভিমান আছে, অভিযোগ আছে, স্মৃতি-বিস্মৃতি আছে। কেবল আনন্দ নেই, আশা নেই, আলো নেই।

*

আলতাফ হোসেন অনুকে ফোন দিলেন রাত দু'টায়। পরপর তিনবার। ধরবে না ধরবে না করেও জরুরি কিছু ভেবে অনু তৃতীয়বারে ফোন ধরলো। আলতাফ হোসেন বললেন, ঘুমিয়ে পড়েছিলেন? এতরাতে ফোন দিয়েছি বলে কিছু মনে করেননি তো?

অনু ঘুমায়নি তখনো। অয়নের পাশে বসে ছিল এতক্ষণ। অয়নের শরীরটা একটু খারাপ করেছে। জ্বরটা এসেছে আবার। অনু অয়নের পাশ থেকে উঠতে উঠতে বলল, না না, বলুন ভাইয়া।

আসলে কাজের কথা বলার জন্যই ফোন করেছি।

জি ভাইয়া।

আমরা ফ্রাইডেতে কখন রওয়ানা করব বলুন তো? আসলে সন্ধ্যার আগে আগে পৌঁছে যেতে পারলে ভালো। গাইবান্ধা শহর থেকে সামান্য দূরে, এই ধরুন পাঁচ ছয় কিলোমিটার। আমার বন্ধুর বিশাল বড় দোতলা বাড়ি। আমরা ওখানেই থাকব। থাকা খাওয়ার ফার্স্টক্লাস ব্যবস্থা। আর আমাদের তো সাথে গাড়ি আছেই।

আলতাফ হোসেনের কথা শুনে অনু আরো দমে গেল। সে বলল, আগের বার আমরা পুরো টিমটা যেখানে ছিলাম, ওখানে থাকা যাবে না, ভাইয়া? ওখানকার সবাই তো আমাদের খুব পরিচিত।

ওটা আসলে অনেক আগে থেকে বুকিং দিয়ে রাখতে হয়। আচ্ছা, বাই এনি চান্স, আপনি কী আমার বন্ধুর ওখানে থাকতে ভয় পাচ্ছেন না-কি? হা হা হা। ভয় পাবেন না, আমার বন্ধু ওখানে একা থাকে না, সে তার ফ্যামিলি নিয়েই থাকে। হা হা হা।

অনু মিন মিন করে বলল, না ভাইয়া, ভয় পাবো কেন!

সত্যি কথা হচ্ছে অনু ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু এই ভয় দূর করার কোনো উপায়। সে খুঁজে পাচ্ছিল না। পেল না নির্দিষ্ট দিনে গাইবান্ধা যাওয়ার আগ অব্দিও।

.

তারা গাইবান্ধা শহরে পৌঁছালো শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটায়। ছোট্ট শহর ছেড়ে সরু রাস্তা ধরে আলতাফ হোসেনের বন্ধুর বাসা অব্দি যেতে আরো মিনিট কুড়ি পথ। চারপাশে গাছপালা ছাওয়া দোতলা বাড়িটা মূল রাস্তা থেকে সামান্য ভেতরে। সামনে শ্যাওলা পড়া বিশাল উঠোন। অনু হাঁটতে গিয়ে পিছলে পড়ে যাচ্ছিল। আলতাফ হোসেন শেষ মুহূর্তে খপ করে তার হাত ধরে ফেললেন। কিন্তু এই স্যাঁতসেঁতে উঠোন আর নির্জন বাড়ি অনুর মাথায় কুটকুট করে কামড়ে চলা এতদিনকার ঘুণপোকাটাকে আরো তীক্ষ্ণ করে তুলল। বাড়ির ভেতরটা যেন আরো শুনসান। কোথাও কেউ নেই। একজন মাঝবয়সি কাজের মহিলা এসে দরজা খুলে তাদের বসতে দিলো। আলতাফ হোসেনের বন্ধু বা বন্ধুর স্ত্রীকে কোথাও দেখা গেল না। অনু সাধ্যমতো চেষ্টা করছে তার অস্বস্তি লুকাতে। কিন্তু পারছে না। আলতাফ হোসেনের বন্ধু সোহরাব এলো মিনিট কুড়ি পর। তিনি এসেই বারবার দুঃখ প্রকাশ করলেন। অনু এতক্ষণে বুঝে গিয়েছে, এ বাড়িতে আর কেউ থাকে না। সোহরাব থাকলেও তা নিয়মিত নয়। মাঝেমধ্যে হয়তো আসেন। তবে তা নির্দিষ্ট কোনো কাজে বা বেড়াতে। বিষয়টি ভেবে অনুর মেরুদণ্ড বেয়ে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল। নিজের অজান্তেই সে তার হাতব্যাগটা শক্ত করে চেপে ধরলো।

সোহরাব বললেন, আমার শ্বশুর আজ দুপুরেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমার স্ত্রী-বাচ্চাদের নিয়ে গেছেন সেখানে। এই জন্যই বাড়িটা এত ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। তবে সকাল নাগাদ ওরা চলে আসবে। আর সে নেই বলে ভাববেন না যে আপনাদের থাকা বা খাওয়ায় কোনো অসুবিধা হবে! যেই ঝি টাকে দেখলেন, সেই ছোটবেলা থেকে সে এ বাড়িতে। একবার রান্না খেলে এ জীবনে আর ভুলতে পারবেন না।

অনু সামান্য হাসলো কেবল, কিছু বলল না। তাকে দোতলায় একটা ঘর দেয়া হয়েছে। ঘরে পরিপাটি করে গোছানো বিছানা। পায়ের কাছে পাতলা কাঁথা ভাঁজ করে রাখা। ঘরের সাথেই বাথরুম, দখিন দিকে বড় জানালা। জানালাগুলো বন্ধ। অনু একটা জানালা খুললো। রাত কত হয়েছে কে জানে! তবে বাইরে বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ। সেই মাঠে যেন কোনো এক অপার্থিব সময়ের আলো। অনু মাথা তুলে তাকালো। মাথার উপরে নাম না জানা গাছের পাতার ফাঁকে ঝকঝকে মেঘমুক্ত আকাশ। আকাশে বিশাল চাঁদ। অনুর মুহূর্তের জন্য মনে হচ্ছিল, দুঃখ, দুশ্চিন্তাবিহীন কোনো এক অপার আনন্দময় পৃথিবীতে সে বেড়াতে এসেছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই দখিনা এলোমেলো উন্মাতাল হাওয়ার সাথে নানান দুশ্চিন্তা উড়ে এসে তাকে জাপটে ধরলো। যেন মনে করিয়ে দিলো, সে এক অজানা অচেনা জায়গায়, এক অস্বস্তিকর অনিশ্চিত সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সে জানে না, এই রাতে তার ভাগ্যে কী রয়েছে। আবার এই রাত এড়ানোর কোনো উপায়ও তার জানা নেই।

অনু সময় নিয়ে গোসল সারলো। তারপর খেতে গেল। খাবার টেবিলে খুব একটা কথা বলল না সে। আলতাফ হোসেন বললেন, দেখেছেন আকাশে কী একটা চাঁদ উঠেছে?

সোহরাব বললেন, দক্ষিণ দিকে নদী আছে। এখন তো নদীর পানিও ভরভরন্ত। চাইলে রাতে নৌবিহারও করা যায়।

আলতাফ হোসেন অনুর দিকে তাকিয়ে বললেন, কি অনু? যাবেন না-কি?

অনু বলল, না ভাইয়া। আজ থাক। কাল না হয় সবাই আসলে তখন। হবে।

আলতাফ হোসেন বললেন, শোনেননি, আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে রাখতে নেই?

অনু বলল, খুব টায়ার্ড লাগছে ভাইয়া, মাথাটাও ব্যথা করছে।

আলতাফ হোসেন বললেন, এই বয়সে এত অল্পতেই টায়ার্ড হলে হবে অনু? এখন তো এনার্জির সময়। হা হা হা। যেন খুব মজার কোনো কথা বলেছেন, এমন ভঙ্গিতে তিনি হাসলেন। সেই হাসিতে আলাদা কিছু ছিল কি-না অনু জানে না, তবে তার সারা শরীরজুড়ে কেমন অস্বস্তিকর এক অনুভূতি বয়ে গেল। অনু যতটা সম্ভব তড়িঘড়ি করে উঠে বেসিনে হাত ধুতে যেতেই আলতাফ হোসেন বললেন, এভাবে খাওয়া শেষ না করেই উঠে যাচ্ছেন কেন?

অনু বলল, মাথাটা খুব ধরেছে ভাইয়া। কাল কথা হবে।

সোহরাব বললেন, চা টা খেয়ে যান, মাথা ধরা কমবে।

অনু জোর করে মুখে সামান্য হাসির ভাব ফুটিয়ে বলল, আমার এমনিতেই চায়ের খুব একটা অভ্যাস নেই।

অনু হাত ধোয়া শেষ করে তোয়ালে হাত মুছছিল। এই সময়ে আলতাফ হোসেন অনুকে ডাকলেন। তার গলাটা কেমন অচেনা লাগল অনুর কাছে। অনু ফিরে তাকাতেই বললেন, চায়ের অভ্যাস নেই, এটার অভ্যাস আছে?

আলতাফ হোসেনের সামনে একটা কাঁচের বোতল। অনু কখনো মদ খায়নি। কিন্তু টেবিলের ওপরের ওই জিনিসটা চিনতে তার অসুবিধা হলো না। সে ভেতরে ভেতরে বড়োসড়ো একটা ধাক্কা খেলো। তবে বাইরে সেটি বুঝতে দিলো না। যেন চোখে কিছু পড়েছে, এমন ভঙ্গিতে অনু আবারো বেসিনের দিকে ঝুঁকে চোখে মুখে পানি ছেটালো। তারপর বলল, সবকিছুতে কি সবার অভ্যাস হয় আলতাফ ভাই?

আলতাফ হোসেন বললেন, আজকের রাত থেকেই না হয় অভ্যাসটা শুরুর হয়ে যাক, অনু। এমন সুযোগ হেলায় হারাবেন কেন?

অনু কিছুক্ষণ চুপ করে আলতাফ হোসেনের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মৃদু হেসে বলল, যেদিন অভ্যাস হবে, সেদিন আপনাকে জানাবো ভাইয়া।

আলতাফ হোসেন বললেন, অত অপেক্ষা করার কী দরকার? আজই না হয় তোক। সবকিছুই তো প্রথমবারের মতো একদিন শুরু করতে হয়। দেখেছেন, কী সুন্দর জোছনা, নদী থেকে উড়ে আসা এমন বিশুদ্ধ দখিনা হাওয়া, আর এই নির্জন রাত। শুরু করার জন্য এর চেয়ে ভালো সময় আর কই পাবেন অনু?

অনু বলল, কে জানে, হয়তো এর চেয়েও ভালো কোনো সময় আসবে, আশা করতে দোষ কী?

আলতাফ হোসেনকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই অনু দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নিজের ঘরে চলে এলো। ঘরের দরজা যে খুব একটা মজবুত এমন নয়, তবে উপরে এবং মাঝামাঝি দুটো সিটকিনি লাগানোর ব্যবস্থা আছে। অনু। দুটোই লাগালো। তারপর বাতি বন্ধ করে চুপচাপ বিছানায় বসে রইল। আলতাফ হোসেন কোনো একটা নির্দিষ্ট মানসিক অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন সেটি নিশ্চিত। কিন্তু এই পুরো পরিস্থিতি ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি করার মতো মানুষ আলতাফ হোসেন, এটি ভাবতে অনুর কষ্ট হচ্ছে। যদিও সে জানে, কষ্ট হলেও এই পরিস্থিতি এখন বাস্তব এবং এখন এটিকে সে কীভাবে মোকাবিলা করবে, তা ঠিক করতে হবে তাকেই।

অনুর একবার মনে হলো, এখানে এভাবে চলে আসাটা তার ঠিক হয়নি। কিন্তু সাথে সাথেই আবার মনে হলো, না এসেই বা কী করার ছিল তার? সে তো আসার আগে আর কম ভাবেনি! হাজারটা বিকল্প ভেবেছে, কিন্তু উপায় ছিল না।

ঠিক এই মুহূর্তে দরজায় নক হলো। পরপর দুইবার। অনু প্রথমে সাড়া দিলো না, চুপচাপ বসেই রইল। আলতাফ হোসেন আবারো নক করলেন।

তারপর বললেন, অনু, ঘুমিয়ে পড়লেন না-কি?

অনু ইচ্ছে করেই ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বলল, শুয়ে পড়েছি ভাইয়া। মাথাটা খুব ব্যথা করছে।

আলতাফ হোসেন বললেন, ভেতরে নিশ্চয়ই গরম পড়ছে বেশ। বাইরে আসুন। চলুন ছাদে গিয়ে কিছুক্ষণ বসবেন। খোলা হাওয়ায় মাথা ধরা সেরে যাবে।

অনু বলল, এখন আর বের হবো না ভাইয়া। আপনারা যান। আমি একটু ঘুমাই। তাছাড়া কাল অনেক কাজও আছে। খুব ভোরে উঠতে হবে।

ভোরে উঠতে হবে না অনু। চাইলে আপনি কাল কাজে নাও যেতে পারেন, আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।

অনু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ভাইয়া, প্লিজ, এখন আর না। একটু ঘুমাই।

আলতাফ হোসেন এবার যেন কিছুটা জোরই করলেন। বললেন, আরে আসুন না। আসুন, আসুন। আমি বলছি আসুন, ছাদে কিছুক্ষণ বসে থাকব। আর, দু'ঢোক খেলে দেখবেন মাথা ব্যথা কই পালাবে! আসুন, আসুন।

অনু এবার আর জবাব দিলো না। আলতাফ হোসেন আরো বার দুয়েক দরজায় নক করলেন। দাঁড়িয়েও রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর যেন কিছুটা রেগে গিয়েই উঁচু গলায় বললেন, সবকিছুতেই আপনার বাহানা অনু, এত বাহানা কেন আপনার? জীবনে এত বাহানা থাকলে চলে না, উন্নতিও হয় না। আমিই তো আপনাকে ডাকছি, অন্য কেউ তো না। এইটুকু সেন্স আপনার থাকা উচিত। কৃতজ্ঞতাবোধ বলেও একটা ব্যাপার আছে!

অনু কী করবে বুঝতে পারছে না। তার মন আর কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। কোনো ভরসাও পাচ্ছে না সে এখন। আলতাফ হোসেন চলে গেলে অনু শুয়ে পড়লো। একটু যেন ঘুম ঘুমও এলো তার চোখে। তবে সেই ঘুম ভাবটা খুব বেশিক্ষণ রইল না। তিনি আবার আসলেন ঘণ্টাখানেক পর। এবার দরজার কড়া নাড়লেন আরো জোরে। অনু অবশ্য চুপ করেই রইল। ভেতর থেকে কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে আলতাফ হোসেন উঁচু গলায়ই অনুকে ডাকলেন। তারপর বললেন, আরে আপনাকে ছাদে যেতে হবে না, দরজাটা খুলুন। আপনার ঘরেই না হয় কিছুক্ষণ বসে গল্পগুজব করে যাই। আর মদ না খান, চা তো এটলিস্ট খেতে পারেন! আমি ঢাকা থেকে কফিও নিয়ে এসেছি। দুই চুমুক খেয়ে দেখেন, মাথাব্যথা দৌড়ে পালাবে।

অনু আলতাফ হোসেনের কথার কোনো জবাব দিলো না। গুটিশুটি মেরে অন্ধকারে চুপচাপ শুয়ে রইল। আলতাফ হোসেন অবশ্য খুব বেশি যন্ত্রণা করলেন না। তিনি সামান্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গেলেন।

আলতাফ হোসেন তৃতীয়বার আসলেন রাত একটার দিকে। এবার আর দরজায় ভদ্রতাসূচক মৃদু নক করলেন না, সশব্দে থাবা বসালেন। তারপর কেমন অদ্ভুত গলায় বললেন, আপনি ঘুমান নাই আমি জানি। জেগে জেগে ঘুমানোর ভান, হ্যাঁ?

অনুর কেবল চোখের পাতা লেগে এসেছিল। সে আতঙ্কগ্রস্তের মতো উঠে বসল। আলতাফ হোসেন বললেন, সব বুঝেই তো আসছেন। না বুঝে তো। আসার কথা না। এখন এত ঢং করছেন কেন?

অনু বালিশের তলা হাতড়ে তার হ্যান্ডব্যাগটা শক্ত করে চেপে ধরলো। আলতাফ হোসেন বললেন, এইসব নখড়া আমি বুঝি বুঝলেন? রাজি না হলে তো আসতেন না। এখন এত রংঢং করার সময় আমার নাই। দরজা খোলেন। রাতের বেশি আর বাকি নাই।

আলতাফ হোসেন আরো জোরে শব্দ করলেন দরজায়। সেই শব্দে পুরো বাড়িটিই যেন কেঁপে উঠল। সামান্য দম নিয়ে তিনি বললেন, টাকা কত লাগবে বলেন? টাকা-পয়সা নিয়ে চিন্তা করছেন? এটা কোনো ব্যাপার না। কত লাগবে খালি বলেন?

আলতাফ হোসেনের কথা বলার ভঙ্গিটাই কেমন অচেনা লাগছিল অনুর। এতক্ষণে কারণটা ধরতে পারল সে। সম্ভবত মদ খেয়ে কিছুটা মাতাল হয়েছেন। তিনি। আলতাফ হোসেন বললেন, পার নাইট রেট কত আপনার? কত করে। খাটেন? বলেন আমাকে। তার চেয়ে বেশিই দিবো। জোর করে কিছু করতে ভালো লাগে না আমার। আপসে না হলে মজা কী বলেন?

দরজায় দ্রিম দ্রিম থাবা পড়ছে, অনুর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। এতদিন ধরে অফিসে অমন সুন্দর সুন্দর কথা বলা সেই মানুষটাই অচেনা অজানা এক নির্জন বাড়িতে একটি মেয়েকে একা পেয়ে এমন ভয়ংকর হয়ে যেতে পারেন! দিনের ঝলমলে আলোয় থাকা সেই মানুষটা এই রাতের অন্ধকারে এমন করে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারেন, অনুর এখনো তা বিশ্বাস হচ্ছে না। তার মনে হলো, ঝলমলে আলোয় নয়, বরং ঘুটঘুঁটে অন্ধকারেই কেবল মানুষের। সত্যিকারের চেহারাটা চেনা যায়।

আলতাফ হোসেন বললেন, আপনি কি আমাকে দিয়ে জোর করাতে চাইছেন? আপনার কি ধারণা এই দরজা আমি খুলতে পারব না?

অনু বিছানা থেকে নামলো। তারপর ধীর পায়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। অন্ধকারেই চোখ বন্ধ করে বার কয়েক নিঃশ্বাস নিলো। তারপর ঠান্ডা, স্পষ্ট গলায় ডাকলো, আলতাফ ভাই।

আলতাফ হোসেন দরজায় আরেক দফা আঘাত করতে গিয়েও আচমকা থেমে গেলেন। যেন কান পেতে শোনার চেষ্টা করছেন, অনু কী বলে। তারপর রুদ্ধশ্বাস গলায় বললেন, বলুন অনু, বলুন?

অনু নির্লিপ্ত গলায় বলল, আপনি বলবেন, তাই হবে আলতাফ ভাই।

আলতাফ হোসেন যেন নিজের কানজোড়াকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। তিনি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর জড়ানো, উচ্ছ্বসিত গলায় বললেন, আমি জানতাম অনু, আমি জানতাম। আপনাকে দেখেই আমি বুঝেছিলাম, এই বয়সেও বিয়ে শাদি হয়নি...। তাছাড়া এতগুলো মানুষের সংসার চালান। ওই ক'টা বেতনের টাকায় কী হয়?

আলতাফ হোসেন মুহূর্তকাল থেমে কেমন গা ঘিনঘিনে ভঙ্গিতে বললেন, আমার আপনারও তো একটা শখ আহ্লাদ আছে, আপনিও তো একটা মানুষ। তাছাড়া, এইসব তো আর অদরকারি জিনিস না, শরীরের চাহিদা তো কম বেশি সবারই থাকে। তাই না? আপনার বয়সও তো কম হয় নাই। কী বলেন, হ্যাঁ? হা হা হা।

অনুর মাথা ঝিমঝিম করছে, গা গোলাচ্ছে। মনে হচ্ছে যে-কোনো সময় সে বমি করে দিবে। আলতাফ হোসেন তুমিতে নেমে এলেন। বললেন, দরজাটা খোলো অনু। রাতের আর বেশি বাকি নেই। এই সুন্দর রাতটা এভাবে যাবে বলো?

অনু কথা বলল না। চুপচাপ অন্ধকারে দাঁড়িয়েই রইল। যেন শক্তি সঞ্চয় করছে। নিজেকে সঁপে দেয়ার কিংবা বাঁচাবার। আলতাফ হোসেন অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। তিনি আলতো করে দরজায় শব্দ করে বললেন, কী হলো অনু? তুমি কোনো চিন্তা করো না। তোমার সব দায়িত্ব আমার। চাকরি নিয়েও চিন্তা করো না। পরের প্রজেক্টেও তোমার চাকরি কনফার্ম। আর টাকা-পয়সা নিয়ে ভেবো না। প্রয়োজনে তোমাকে আমি আমার আরেকটা স্ত্রীর মতো করে রাখবো। কোনো চিন্তা করো না। এখন থেকে তোমার সব চিন্তা আমার। দরজাটা খোলো, খোলো অনু। খোলো।

অনু আচমকা শীতল গলায় বলল, আপনি সারাহ নামের কাউকে চেনেন আলতাফ ভাই?

আলতাফ হোসেন প্রথমে যেন অনুর কথাটা বুঝতে পারলেন না। তিনি বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন, কোন সারাহ?

আপনার বড় মেয়ে আলতাফ ভাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে?

আলতাফ হোসেন মুহূর্তেই থমকে গেলেন। তারপর বিচলিত গলায় বললেন, এখানে সারাহ আসলো কোত্থেকে? ওহ, তুমি সারাহর কথা ভেবে ভয় পাচ্ছ? ও তো মাঝে মধ্যে অফিসে আসে, কিছু জেনে টেনে ফেলবে?

না আলতাফ ভাই। তাহলে?

বিকেলে গাড়িতে সারাহ আপনাকে বারবার ফোন দিচ্ছিলো। আপনাদের বাবা-মেয়ের কী সুন্দর একটা ছবি সেট করা কলারে! আপনাদের কথা শুনে বুঝলাম, মেয়েকে অসম্ভব ভালোবাসেন আপনি, তাই না?

আলতাফ হোসেন অনুর কথা কিছুই বুঝতে পারছেন না। তিনি অস্থির গলায় বললেন, হ্যাঁ বাসি। কিন্তু এখানে তুমি সারাহকে নিয়ে আসছ কেন অনু?

কারণ সারাহর ফোন নম্বরটা আমার কাছে আছে আলতাফ ভাই। তখন গাড়ি থেকেই নিয়েছিলাম। আপনি কি চান, সারাহ জানুক, তার বাবা আসবে সেই আপনি না, যাকে সে চেনে। তার বাবা আসলে এই আপনি, যাকে সে চেনে না। কিন্তু আজ চিনবে!

আলতাফ হোসেন প্রথম বিষয়টা বুঝতে পারলেন না। তারপর হড়বড় করে বললেন, তুমি এসব কী বলছ, অনু?

আমি বলছি, আমার মোবাইল ফোনে এই মুহূর্তে সারাহর নামটা ডায়াল লিস্টে আছে। আমি তাকে শোনাতে চাই তার বাবার কণ্ঠ, তার বাবার কথা। তার বাবা কী সুন্দর সুন্দর কথা বলতে জানে! আমি তাকে দেখাতে চাই, তার বাবার আসল চেহারাটা আসলে কী? আমি মরে গেলেও সেটা তাকে জানিয়ে যেতে চাই। কিন্তু আপনি কী চান, সে তা জানুক?

আলতাফ হোসেনের কয়েক মুহূর্ত লাগল বিষয়টা বুঝতে। ঝট করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। যেন নেশাগ্রস্ত মাতাল কোনো মানুষের মুখে প্রবল ঠান্ডা জলের ঝাঁপটা দেয়া হয়েছে। তিনি কেমন দিশেহারা গলায় বললেন, অনু!

অনু বলল, আলতাফ ভাই, আপনাকে এতটা জঘন্য মানুষ ভাবতে আমার কষ্ট হয়। আমি বিশ্বাস করি, আপনি এতটা খারাপ মানুষও না। আপনার কোনো একটা সমস্যা যাচ্ছে। সেই সমস্যাটা আগে আপনার বুঝতে পারা উচিত।

আলতাফ হোসেন কোনো জবাব দিলেন না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন দরজার ওপাশে। অনু বললেন, আমি জানি না, আপনি কী সিদ্ধান্ত নিলেন। আপনার মেয়ে আপনার এই চেহারাটা জেনে ফেলবে, এটি আপনার কাছে তেমন লজ্জাজনক বা গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনে নাও হতে পারে। আপনি তারপরও আমার উপর জোর করতে পারেন। এই বাড়িতে দুটো পুরুষ মানুষ, তারা চাইলে আমি দরজা আটকে নিরাপদ থাকতে পারব না। তবে আলতাফ ভাই, আমি আরো একটা উপায় ভেবে রেখেছি। আমার হাতে একটা চাকুও আছে, এটা সবসময়ই থাকে আমার ব্যাগে। আমি একা মেয়ে মানুষ, বাবা নেই, স্বামী নেই, বড় ভাই নেই, টাকা-পয়সা নেই, এই বয়সেও বিয়ে শাদি হয়নি। সবাইই আমাকে আপনার মতোই সহজলভ্য ভাবে। ভাবে, চাইলেই হয়তো সুযোগ নেয়া যাবে। তাই সাথে সাথে রাখি। কিন্তু অন্যকে আঘাত করার সাহস আমার নাই, ভাই। তবে নিজেকে তো অন্তত করতে পারব!

অনু থামলো। তার বুক হাপড়ের মতো কাঁপছে। শরীর বেয়ে ঘাম নামছে। দরজার ওপাশে আলতাফ হোসেন চুপ। এপাশে অনুও। এপাশে অন্ধকার, ওপাশে আলো। এপাশে শিকার, ওপাশে শিকারি। মাঝখানে পলকা এক দরজা। সেই দরজার এপার-ওপার, আলো অন্ধকার, জিগীষা ও জিঘাংষা এক অদ্ভুত হিসেবের, সমীকরণের, অনুভূতির তীব্র বাঅয় অথচ গভীর নৈঃশব্দ্যে ডুবে রইল।

*

নুহার সাথে বেনুর দেখা হয়ে গেল বাসে। বেনু বহুদিন পরে ঢাকায় এসেছে। মাদারীপুর থেকে ঢাকা যে খুব দূরের পথ তা নয়। কিন্তু আসার পথে পদ্মা পার হয়ে আসতে হয়। ঝামেলাটা এখানেই, ফেরিতে বাস ট্রাকের অপেক্ষমান লম্বা সারি থাকে। সেই সারি পেরিয়ে ফেরিতে উঠতে উঠতে ঘণ্টা দুয়েক লেগে যায়। ভাগ্য খারাপ হলে আরো বেশি।

তারপর ফেরিতে নদী পার হতেও দীর্ঘসময়। বেনু এসেছে মাওয়া ঘাট হয়ে। গুলিস্তান নেমে মোহাম্মদপুরের বাস। বাসেই নুহার সাথে দেখা। তাদের সিট পড়েছে পাশাপাশি।

নুহা বলল, আপু, আপনাকে কতদিন পর দেখলাম!

বেনু অবশ্য নুহার কথার জবাব দিলো না। কেবল ঠোঁট ফাঁক করে সামান্য হাসির ভাব করলো সে। নুহা একটু অবাকই হলো। বেনুর সাথে তার খুব যে দেখা সাক্ষাৎ বা কথাবার্তা হয়েছে এমন নয়। অয়নের বোন বলেই এমন হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ায় সে খানিকটা আলাদা করেই আগ্রহ দেখিয়েছিল। কিন্তু বেনুর এমন নির্লিপ্ত আচরণে বেশ দমে গেল নুহা। বেনু কী কোনো কারণে তাকে চিনতে পারেনি? চিনতে না পারলেও তো মানুষ অন্তত কথাবার্তা বলে, চেনার চেষ্টা করে। নুহা চুপচাপ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। তবে এই ফাঁকে আড়চোখে সে বেশ কয়েকবার বেনুকে খেয়ালও করেছে। বেনুর পাশে যাত্রীদের যাতায়াতের পথে বিশাল একটা ব্যাগ রাখা। দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীরা এই ব্যাগ নিয়ে ভারি বিরক্ত। বেনু বারবার ব্যাগটাকে টেনে আরো কিছুটা তার দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। নুহার হঠাৎ কী মনে হলো, সে খানিকটা ঘুরে বেনুকে বলল, আমাকে চিনতে পারেননি আপু? আমি নুহা। অয়নের সাথে পড়ি।

বেনুর যেন সময় লাগল নুহার কথা বুঝতে। সে কিছুক্ষণ নুহার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর নুহার হাতটা হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, অয়নের সাথে তোমার দেখা হয়?

নুহা অবাক গলায় বলল, হ্যাঁ, হয়।

শেষ কবে দেখা হয়েছে?

এই তো গতকালই।

অয়ন কেমন আছে?

হ্যাঁ, ভালোই তো!

ভালো?

হ্যাঁ।

নুহার কাছে বেনুকে কেমন অস্বাভাবিক লাগতে লাগল। সে বলল, কেন আপু? কোনো সমস্যা?

না, না। কী সমস্যা হবে?

সেটাই তো। ওর সাথে তো আমার রোজই কোচিংয়ে দেখা হয়।

ও রোজ কোচিংয়ে আসে?

হ্যাঁ, রোজই তো আসে।

বেনু কথা বলল না। নুহাই আবার বলল, আপু?

হুঁ।

কিছু একটা হয়েছে, আমাকে বলবেন প্লিজ?

নাহ্। কিছু হয়নি।

নুহা প্রসঙ্গ পাল্টালো, আপনি এই এত বড় ব্যাগ নিয়ে একা একা ওই অতদূর থেকে চলে এসেছেন আপু?

বেনু একবার নুহার দিকে তাকালো। আরেকবার ব্যাগটার দিকে। তারপর ব্যাগটা টেনে আরো কিছুটা নিজের দিকে আনার চেষ্টা করলো। কিন্তু নুহার কথার জবাব দিলো না। নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল সামনে। নুহাও আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না। রাস্তায় প্রচণ্ড জ্যাম। বাকিটা সময় চেনা দুজন মানুষ অচেনার মতো পাশাপশি বসে রইল।

বাস থেকে নেমে রিকশা নিলো বেনু। নুহাও রিকশা খুঁজছে। কিন্তু পাচ্ছে না। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। চলে যাবার ঠিক আগ মুহূর্তে হঠাৎ নুহাকে ডাকলো বেনু। তারপর নুহার কাঁধে হাত রেখে বলল, আমার আচরণে তুমি মন খারাপ করো না। পরে কোনো একদিন তোমার সাথে অনেক কথা হবে। আজ একটু শরীরটা ভালো নেই আমার।

নুহা বলল, মন খারাপ করিনি আপু।

বেনু বলল, অবশ্যই করেছ। তোমার জায়গায় থাকলে আমিও করতাম।

নুহা কথা বলল না। বেনু বলল, যাই নুহা?

নুহা ঘাড় কাত করে সায় দিলো। কিন্তু বাকিটা সময় বেনুকে মাথা থেকে তাড়াতে পারল না সে। সন্ধ্যাবেলা অয়ন কোচিংয়ে এলো না। নুহা ভারি অবাক হলো। সে ভেবেছিল, কোচিং শেষে অয়নকে আজকের ঘটনাটা বলবে। রাতে অয়নকে ফোন করলো নুহা। কিন্তু অয়ন ফোন ধরলো না। কেমন একটা অস্বস্তি নিয়েই ঘুমাতে গেল সে। অয়ন ফোন করলো পরদিন ভোরে। তার গলা ভারি। থেমে থেমে কাশছেও।

অয়ন বলল, হঠাৎই পাগলের মতো জ্বর, একশ চার উঠে গেল।

তা আমাকে জানাবি না?

তোকে জানালে কী হতো?

এটা কী ধরনের কথা অয়ন?

অয়ন চুপ করে রইল। নুহা বলল, গতকাল বেনু আপার সাথে দেখা হয়েছিল।

কোথায়?

বাসে। আচ্ছা, বেনু আপার কি কিছু হয়েছে? কেমন যেন অন্যরকম লাগছিল। কোনো সমস্যা?

কই? না তো!

নাহ্, মানে আমার কেন যেন মনে হলো। তোর কথা খুব জিজ্ঞেস করছিল। আর অতবড় একটা ব্যাগ নিয়ে অতদূর থেকে একা চলে এসেছেন। কেমন লাগল আমার। দেখে মনে হলো, কান্নাকাটিও করেছেন!

আরে ধুর। ও তো অমনই, পাগল।

তুই আজকাল আমার কাছে কিছু লুকাচ্ছিস, তাই না অয়ন?

তোর কাছে? আমি? ধুর! তোর কাছে আমি কেন কিছু লুকাবো?

লুকাচ্ছিস।

শোন, মানুষ বন্ধুর কাছে কিছু লুকায় না, লুকায় প্রেমিকার কাছে। বন্ধুর কাছে লুকানোর মতো কিছু থাকে না। তুই তো আমার বন্ধুই, প্রেমিকা তো না।

অয়ন হাসলো, কিন্তু নুহা হাসলো না। সে ফোন কানে চেপে ধরে বসে রইল। অয়ন বলল, আজও কোচিংয়ে যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না রে! ভালো ঠেকলে কাল হয়তো দেখা হবে।

নুহা বলল, আচ্ছা।

.

অনু যাওয়ার আজ চতুর্থ দিন। সে আসতে আরো দু'দিন বাকি। বেনু এসেছে গতকাল। তাকে এখুনি কিছু জানাতে নিষেধ করেছিল অনু। অফিসের ট্যুর থেকে ফিরে নিজেই বেনুকে ফোন করবে ভেবেছিল সে। কিন্তু সালমা বেগম অতটা অপেক্ষা করতে পারছিলেন না। খবর পাওয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঢাকার বাস ধরেছে বেনু। বেনুর হাজবেন্ড আরিফুল থাকে গ্রিসে। ঢাকার ছোট ব্যবসায় লাভ তেমন হচ্ছিল না বলে মনের মধ্যে সবসময়ই একটা অশান্তি ছিল তার। এমনিতেও আরিফুল উচ্চাভিলাষী ছেলে। বেশি উপার্জনের আশায় নানান বিকল্প খুঁজতো। কিন্তু তাতে লাভ বিশেষ হয়নি।

আরিফুলের কয়েকজন বন্ধু থাকে গ্রিসে। তাদের আয়-উপার্জনও মোটামুটি ভালো। এদিকে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আরিফুলের ব্যবসায়ও তখন বেশ মন্দা।

সবকিছু মিলিয়ে আরিফুল হঠাৎ গ্রিসে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। মাদারীপুরের বাড়িতে তার বাবা-মা, ভাই-বোনের বিশাল পরিবার। যাওয়ার আগে বেনুকে সে রেখে গেল সেখানে। কিন্তু গ্রিস গিয়ে আরিফুল পড়েছে ভয়াবহ বিপদে। তাকে যে ভিসা দেয়া হয়েছে, তাতে ওয়ার্ক পারমিট নেই। ফলে সেখানে কোনো কাজ করতে পারল না সে। গ্রিসের অর্থনৈতিক অবস্থাও তখন খুব একটা ভালো না। এই অবস্থায় ওই বিদেশ বিভূঁইয়ে উপার্জনহীন একজন মানুষকে বন্ধুবান্ধবও বেশিদিন ঘাড়ে তুলে রাখতে চায় না। কিন্তু আরিফুলের উপায় নেই। সে এখন দাঁতে দাঁত চেপে, বন্ধু বান্ধবের অবহেলা-উপেক্ষা সহ্য করে হলেও টিকে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছে, যদি কোনো উপায়ে একটা কাজের ব্যবস্থা করা যায়। কিংবা ওয়ার্ক পারমিট বের করা যায়।

বেনু ঘরে ঢুকেই সোজা সালমা বেগমের ঘরে চলে এলো। সালমা বেগম তখন জোহরের নামাজ পড়ছিলেন। বেনু তার হাতের ভারি ব্যাগটা রেখে সালমা বেগমের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। সালমা বেগম নামাজের সালাম ফেরাতেই বেনু জলের মতো লুটিয়ে পড়লো তার কোলে। সালমা বেগম দু'হাতে মেয়েকে বুকের সাথে চেপে ধরে চুপচাপ বসে রইলেন।

বেনু ফিসফিস করে ডাকলো, মা।

সালমা বেগম জবাব দিলেন না। যেন প্রাচীন কোনো পাথরের ক্ষতবিক্ষত মূর্তির মতো তিনি স্তব্ধ, শীতল, স্থির। বেনু আবার ডাকলো, মা, ও মা?

সালমা বেগম কেবল আরো খানিকটা শক্ত করে বেনুকে বুকের সাথে চেপে ধরলেন। কথা বললেন না। তবে তার চোখের কোল গড়িয়ে কী আশ্চর্য এক শান্ত, গভীর অথচ উষ্ণ জলের ধারা নেমে এলো!

বেনু চাপা গলায় বলল, আমার বিশ্বাস হয় না মা।

সালমা বেগম নির্বাক বসেই রইলেন। বেনু বলল, আমি আল্লাহর কাছে ভিক্ষা চাইব মা। আমি পাঁচ খতম কোরআন মানত করব। আরিফুল বিদেশ যাওয়ার আগে আমাকে কিছু টাকা দিয়ে গেছিল, আমি সেই টাকা এতদিনেও খরচ করি নাই, যদি বড় কোনো বিপদ আপদে পড়ি! সেই টাকা আমি নিয়ে আসছি মা। একটা গরু কিনবো, আল্লাহর নামে অয়নের জানের বদলে জানের ছদকা দিবো মা। আল্লাহ চাইলে সব সম্ভব, সব। কিচ্ছু হবে না মা। তুমি দেইখো, কিচ্ছু হবে না। আল্লাহর কাছে দিনরাত ভিক্ষা চাইব মা।

অয়নের সাথে বেনুর দেখা হলো সন্ধ্যাবেলা। অয়নের আজকাল খুব ঘুম হচ্ছে। বিছানায় শুলেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। সে ঘুম ভেঙে দেখলো বেনু তার পাশে বসে আছে। চোখ মেলে তাকিয়ে আবছা অন্ধকারে বেনুকে চিনতে তার একটু সময় লাগল। সে মৃদু হাসলো। তারপর বলল, কখন এলি?

সেই কখন! তোর ঘুম তো আর ভাঙে না।

হ্যাঁ। আজকাল কী যে হয়েছে, খালি ঘুম পায়। পরীক্ষা সামনে, আর দেখ জ্বর-ঠান্ডা লেগেই আছে। একটুও পড়তে পারি না জানিস?

আগে জ্বর ভালো হোক। শরীর ভালো হলে অনেক পড়তে পারবি।

কিন্তু তখন তো আর সময় থাকবে না।

সময় থাকবে না কেন?

পরীক্ষা চলে আসবে যে!

চলে আসলে আসুক। এত ভাবতে হবে না। পরীক্ষা আসবে, যাবে, আবার আসবে। এতে এত টেনশনের কিছু নাই।

সেই রাতে অয়নের আবার জ্বর এলো। বমিও হলো বার কয়েক। এই ঘটনায় সবচেয়ে বেশি অস্থির হয়ে গেল বেনু। অয়নকে নিয়ে কী করবে ভেবে। পেল না সে। মাথায় পানি দিলো। সারা শরীর মুছিয়ে দিলো। রাত জেগে নামাজ পড়লো। নামাজ শেষে সারারাত জায়নামাজে করুণ সুরে কোরআন পাঠ করলো সে। সালমা বেগম দিশেহারা অবস্থায় ফোন করলেন অনুকে। অনু বলল ভোরে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে। ডাক্তার অবশ্য জ্বর দেখে বিশেষ কিছু বললেন না। সাধারণ প্যারাসিটামলই খেতে দিলেন। অয়নের জ্বর নেমে গেল পরদিন রাতেই।

সেই রাতে বহুদিন বাদে আবার শামীম এলো। শামীমের একহাতে বাজারভর্তি ব্যাগ, আরেক হাতে খাসির আস্ত মাথা। তনুর কপাল ফাটিয়ে দিয়ে সেই যে লাপাত্তা হয়ে গিয়েছিল শামীম, তারপর আর এ বাড়িতে আসেনি। অবাক ব্যাপার হচ্ছে, আজ এতদিন পর বাড়িতে ঢুকে তার ভাবখানা এমন যে এ বাড়িতে কখনো কিছু হয়নি। এমনকি তনুর সেই ঘটনার কথাও যেন সে জানে না। স্বভাবসুলভ বিগলিত ভঙ্গিতে সাথে আনা খাসির মাথা আর মুগডাল নিয়ে রান্না ঘরে ঢুকে গেল সে। শামীমের রান্নার হাত ভালো। অত রাতে সে। নিজ হাতে মুগডাল দিয়ে খাসির মাথা রান্না করলো। তারপর অয়নকে ঘুম থেকে। ডেকে উঠিয়ে খেতে বসালো। অয়ন খেলোও। বহুকাল পর যেন তৃপ্তি করে খেলো সে। খাবার টেবিলে তনু, বেনু আর মায়ের সাথে নানান গল্পও হলো। তার পরের দিনটাও ভালো কাটলো অয়নের। কিন্তু তাকে ঘর থেকে বের হতে দিলো না বেনু।

অনু এলো সন্ধ্যার পরপর। তার চোখে মুখে স্পষ্ট ক্লান্তি। লম্বা গোসল সেরে সামান্য কিছু খেলো সে। টানা কয়েকদিন গ্রামের মাঠে-ঘাটে ছোটাছুটি আর জল কাদায় পায়ের কেডসের মতো জুতোজুড়া নোংরা হয়ে আছে। অনেক করে ধোয়ার পরও বিশ্রি গন্ধটা যেন যাচ্ছিলই না। একটু খোলা হাওয়া মেলে দিলে সকাল নাগাদ হয়তো শুকিয়ে ফুরফুরে হয়ে যাবে। জুতোজোড়া এনে বারান্দার রেলিংয়ের সাথে ঝুলিয়ে রাখলো অনু। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বহুদিন পর আবার সেই গা ঘিনঘিনে আতঙ্কটা ফিরে এলো তার।

অবচেতনেই যেন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো অনু। পাশের বাসার দোতলার জানালাটা হাট করে খোলা। ফিনফিনে পাতলা পর্দা মৃদু হাওয়ায় দুলছে। ভেতরে সম্ভবত একটা টেবিল ল্যাম্পের আলো জ্বলছে। সেই আলোয় পর্দার গায়ে একটা দীর্ঘ ছায়ামূর্তি স্পষ্ট। ছায়ামূর্তিটা দেখতে যে কী ভীষণ ভয়ংকর! অনুর বুকটা মুহূর্তেই যেন ধক করে কেঁপে উঠল। সে তড়িঘড়ি ছুটে এসে অয়নের পাশে বসলো। বার দুই জোরে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো। অয়ন বলল, তুই এত তাড়াতাড়ি চলে এলি?

অনু নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে?

আমার তো মনে হলো এই গতকালই গেলি।

ভালো সময় তাড়াতাড়ি যায়।

ভালো সময় কেন?

আমি না থাকলে তোর সময় ভালো যায়। এইজন্য মনে হচ্ছে গতকাল মাত্র গেলাম।

অয়ন হাসলো, তোর মতো করে তো কেউ বকাঝকা করে না। অবশ্য বেনুটা এসেই ঝামেলাটা পাকালো।

কী ঝামেলা?

সারাক্ষণ পাশে এসে বসে থাকে। আর এটা সেটা বলে।

আর জ্বর?

জ্বর কী?

জ্বর এসে কোনো ঝামেলা পাকায়নি?

তা একটু পাকিয়েছে। কিন্তু যতটা না জ্বর ছিল তার চেয়ে বেশি মা আর বেনুটা ঝামেলা করলো।

কী ঝামেলা?

এই যে বাইরে বের হতে দেয় না। সারাক্ষণ ঘরের ভেতর আটকে রাখে। আগে জ্বর হলেও আমি কলেজে যেতাম। কত জ্বর লুকিয়ে খেলতে গেছি। বাইরে না বের হতে পারলে ভাল্লাগে বল?

বাইরে এত কী?

বাইরে এত কী জানি না। কিন্তু ঘরে আমার ভাল্লাগে না। সারাক্ষণ কেমন। একটা দমবন্ধ লাগে।

ঘরে দমবন্ধ লাগে?

হ্যাঁ লাগে। এই যে ঘরে আমি সারাক্ষণ ড্রইংরুমে থাকি। ধর শুয়ে আছি, এই সময়ে কেউ এলো, কলিংবেলের শব্দ শুনে সাথে সাথেই উঠে আমাকে বিছানা গুছিয়ে ভেতরের কারো ঘরে চলে যেতে হবে। তারপর ধর বাড়িওয়ালা আসলো। তার সাথে বাড়িভাড়া, এই বিল, সেই বিল, এই সমস্যা, সেই সমস্যা নিয়ে আমাকেই কথা বলতে হবে। কত মিথ্যা কথাও যে বলতে হয়! আরো কত লোক যে আসে! তারপর বিছানা এলোমেলো করে রাখা যাবে না, টেবিল এলোমেলো রাখা যাবে না। কেউ এসে দেখলে কী বলবে, এমন করে থাকা যায় বল? নিজের একার একটা ঘর হলে না হয় ঘরে থাকতে ভালো লাগে। ড্রইংরুমে থাকতে কার ভাল্লাগবে? এই জন্যই আমার ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে না, বাইরেই ভালো।

অয়নের কথা শুনে অনু কেন যেন কিছু বলতে পারল না। তার হঠাৎ মনে হলো, নিজের একটা ঘরের স্বপ্ন বোধহয় পৃথিবীর সব মানুষেরই থাকে। মানুষ চেতনে অবচেতনে সেই স্বপ্ন বুকের মধ্যে আলগোছে পুষে বেড়ায়। জীবন জুড়েই যে অজস্র স্বপ্ন সে দেখে, যে অসংখ্য স্বপ্নের পেছনে সে ক্লান্তিহীন ছুটে বেড়ায়, সেই সকল স্বপ্নের গভীরেও সবচেয়ে তীব্রভাবে যে স্বপ্নটি রয়ে যায়, সেই স্বপ্নটি হচ্ছে নিজের একটি ঘরের স্বপ্ন।

অনুরও কী নিজের একার একটা ঘরের স্বপ্ন নেই? একদম নিজের একটা ঘর। অনু দীর্ঘশ্বাস ফেলতে গিয়েও সামলে নিলো। এই স্বপ্নটা নিয়ে সে ভাবতে চায় না। হয়তো জগতের সকল মেয়েরই এই স্বপ্নটা থাকে, কিংবা সকল মানুষেরই। তবে সেই স্বপ্নে ওই নিজের ঘরের ভেতর নিজের একটা মানুষের স্বপ্নও থাকে। ঘরটার মতো সেই মানুষটাও হবে কেবল তার একার, নিজের। অনুর ঠোঁটে কেমন অদ্ভুত মৃদু এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল, মানুষ কী অদ্ভুত প্রাণী! সে তার নিজেকে একা কখনো পরিপূর্ণ ভাবতে পারে না। তার পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে গেলে লাগে আরো একজন মানুষ। একজন নিজের মানুষ।

অনু থম মেরে বসে রইল। কতকাল এসব নিয়ে ভাবে না সে। আজ অয়নের ওই নিজের একটা ঘরের কথা শুনে তার ভাবনাগুলো মুহূর্তেই কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। অয়নের এই বয়সটা বুকের ভেতর অজস্র স্বপ্ন পুষে রাখার বয়স। এই বয়সের স্বপ্নগুলো হয় ঝলমলে আলোর মতো উজ্জ্বল, বাধাহীন, রঙিন। হয়তো এমন অজস্র স্বপ্ন অনুর নিজেরও ছিল। কিংবা কে জানে, হয়তো ছিলই না কখনো!

অনু বলল, কাল বাইরে যাস।

তুই বলছিস?

অনু মৃদু হাসলো, হ্যাঁ।

অয়ন আচমকা বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপু?

অনু জিজ্ঞাসু চোখে ঘাড় কাত করে সায় দিলো। অয়ন বলল, আমাকে হঠাৎ এত দামি একটা ফোন কেন কিনে দিলি?

অনু মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে বলল, একটা দৃশ্য দেখার জন্য।

অয়ন অবাক গলায় বলল, কী দৃশ্য?

যেই মুহূর্তে তুই ফোনটা পেলি, ওই মুহূর্তে ফোনটা হাতে পেয়ে তোর কী রিঅ্যাকশন হয়, সেই দৃশ্য।

ধ্যাৎ! এটা কিছু হলো? সত্যি করে বল।

সত্যি করেই বললাম।

অনু আলতো হাতে অয়নের মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। অয়ন সামান্য মাথা উঁচু করে অনুর দিকে তাকালো। অনু অস্ফুট স্বরে বলল, কাল না সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরবি? এখন তাহলে কিছু একটা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়।

অয়ন কিছু বলল না। অনুর দিকে তাকিয়ে রইল কেবল। অনুর ওই প্রায় নির্বিকার চোখ, মুখ, ঠোঁটের ভেতর সে যেন হঠাৎ দেখতে পেল অসংখ্য অচেনা অজানা অগোছালো অক্ষর। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সেই অক্ষরগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপূর্ণ কোনো গল্প বানাতে পারল না অয়ন।

*

নুহার সাথে অয়নের দেখা হলো চারদিন পর। অয়নের অবশ্য মনে হচ্ছে, চারদিন নয়, তাদের দেখা হয়েছে কম করে হলেও চার মাস পর। কোচিং শেষে রাস্তা লাগোয়া ফুচকার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল তারা। অয়ন বলল, তোকে কেমন অন্যরকম লাগছে নুহা।

নুহা হাসলো। তার এই হাসিটা শিউলি ফুলের মতো। মুহূর্তেই যেন চারপাশে ঝলমলে এক শুভ্রতা ছড়িয়ে দেয়। সে বলল, অন্যরকম কেমন?

তা তো জানি না।

না জানলে বুঝলি কি করে যে অন্যরকম?

অনেক কিছু না জেনেও বোঝা যায়, যায় না?

হুম যায়।

কী কী যায়?

এই যে তুই অসুস্থ, সেটা না জানলেও তোকে দেখলেই বোঝা যায়।

যায়?

হুম, যায়। কী হাল হয়েছে শরীরের দেখেছিস?

অয়ন হাসলো, জবাব দিলো না। নুহা বলল, তুই এবার ভালো একটা ডাক্তার দেখা অয়ন।

ডাক্তার দেখিয়ে কী হবে?

কী হবে মানে? অ্যাটলিস্ট তোর এই যখন তখন জ্বরটা কেন হচ্ছে তা তো বুঝতে পারবি! তুই জানিস, মামা বলে, সব বাজে রোগের বেসিক সিম্পটম হচ্ছে ঘন ঘন জ্বর।

তোর কি মনে হয়, আমার বাজে কিছু হয়েছে?

নুহা হাতের খাতা দিয়ে অয়নের মাথায় আলতো মারলো। তারপর বলল, তুই দিন দিন খুব স্যাডিস্ট হয়ে যাচ্ছিস।

অয়ন কিছু বলতে যাচ্ছিল, এই মুহূর্তে তার পাশে একটা বাইক এসে থামলো। বাইকের পেছনে শামীম বসা। অয়ন বলল, আপনি এখানে ভাইয়া?

শামীম মৃদু হেসে বাইক থেকে নামলো। অয়ন বলল, ফুচকা খাবেন?

শামীম মুহূর্তের জন্য নুহার দিকে তাকালো। তারপর এমনভাবে চোখ। ফিরিয়ে নিলো, যেন এই সময়ে এখানে আসা তার ঠিক হয়নি। সে বিব্রত

ভঙ্গিতে বলল, না না। তোমরা খাও।

অয়ন বলল, কোথাও যাচ্ছিলেন?

শামীম বলল, হুম, তোমাকে দেখে থামলাম।

কোনো দরকার ভাইয়া?

না না, তেমন কিছু না। তোমরা আগে খাওয়া শেষ করো। আমি দাঁড়াই।

অয়ন কিছু বুঝলো না। সে নুহার দিকে তাকালো। নুহার চোখে মুখে স্পষ্ট অস্বস্তি। শামীম বলল, তোমার কোচিং তো শেষ, না?

অয়ন আর কিছু খেলো না। সে হাত ধুতে ধুতে বলল, হ্যাঁ।

এখন তো আর কোনো কাজ নেই?

না।

তাহলে আমার সাথে একটু যেতে পারবে?

কোথায়?

এই তো, কাছেই। বেশিক্ষণ না, এই ধরো ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চলে আসতে পারবে।

অয়ন নুহার দিকে তাকাতেই নুহা মাথা নেড়ে সায় দিলো। অয়নের অবশ্য একটুও যেতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু না গিয়েও উপায় নেই। সে নুহাকে একটা রিকশা ঠিক করে দিয়ে শামীমের সাথে গেল।

শামীম বলল, চেষ্টা তো কম করলাম না। কিন্তু চাকরি-বাকরির তো কিছু হলো না অয়ন। এখন এভাবে আর কতদিন বসে থাকব বলো? তাই বন্ধু বান্ধবরা কয়েকজন মিলে ঠিক করেছি একটা বিজনেস শুরু করব।

অয়ন বলল, কিসের বিজনেস ভাইয়া?

এই ধরো বইয়ের।

বইয়ের? অয়ন খুব অবাক হলো।

হু, ধরো কোনো স্কুল বা কলেজের পাশে বইয়ের দোকান দিলাম। সাথে খাতা, কলম, ফটোকপি এইসবও থাকল।

কিন্তু স্কুল-কলেজের পাশে তো এমনিতেই অনেক বইয়ের দোকান থাকে ভাইয়া! তাছাড়া এইসব জায়গায় দোকান ভাড়া পাওয়াও তো খুব কঠিন। আর। টাকাও লাগে অনেক।

এটাই সমস্যা অয়ন। আমার ক্যাশ ক্যাপিটাল নাই। ক্যাশ ক্যাপিটাল থাকলে ব্যবসা কোনো ব্যাপারই না। আমাদের ব্যবসার আইডিয়াটা কিন্তু খারাপ না। বরং বেশ ভালো আইডিয়া। এই ধরো ক্লাসের বই যেমন থাকবে, সাথে গল্প উপন্যাসের বইও থাকবে। বাচ্চাদের কার্টুন, কমিকসের বই থাকবে। তারপর ধরো বাচ্চাকাচ্চাদের স্কুলে নিতে মায়েরা আসে। তাদের জন্য রান্নার বই থাকবে। রূপচর্চার বই থাকবে। মহিলাদের ম্যাগাজিন থাকবে।

কিন্তু ভাইয়া, অনেক টাকার ব্যাপার তো! আপনিই তো বললেন, আপনার কাছে টাকা নেই?

সেইজন্যই তো বন্ধু-বান্ধব মিলে দিচ্ছি। ধরো আত্মীয়-স্বজন কেউ হেল্প করতে পারলে ভালো হতো। আমার এক বন্ধুর শ্বশুর তাকে দুই লাখ টাকা দিচ্ছে। সে সেই টাকা এই

ব্যবসায় লাগাবে। কিন্তু আমার তো সেই কপালও নেই। আমার আছে শ্রম আর সময়। আমি সেটাই দিবো, অন্যরা পয়সা।

শামীম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আবার বলল, অবশ্য এই ব্যবসার একটা সুবিধাও আছে। বই বাকিতে এনেও ব্যবসা করা যায়। বিক্রি হলে টাকা দিবো, বিক্রি না হলে বই ফেরত। এমন সুবিধা আর কোনো ব্যবসাতে নেই, বুঝলে?

অয়ন মাথা নাড়লো।

.

অয়ন বাসায় ফিরল রাত নটায়। শামীম তাকে এক কার্টুন মোটা মোটা বই ধরিয়ে দিয়েছে। সেই বই দোতলায় ওঠাতে তার নাভিশ্বাস অবস্থা। অনু ছুটে এসে অয়নকে ধরলো। তারপর বলল, এগুলো কী অয়ন?

শামীম ভাইয়ের বই।

শামীমের বই? অনু ভারি অবাক হলো, শামীমের বই মানে? শামীম কই?

ভাইয়া আজ আসবে না, তার বন্ধুর বাসায় থাকবে। তারা বন্ধুরা মিলে না কি বইয়ের বিজনেস করবে।

অনু সরু চোখে অয়নের দিকে তাকালো। অয়ন ঘটনা খুলে বলল। কিন্তু অনু তাতে আশ্বস্ত হতে পারল না। সে তনুর ঘরে গেল। তনু তখন হাফসাকে খাওয়াচ্ছিল। অনু বলল, শামীম তোকে কিছু বলেছে?

কোন বিষয়ে?

বিজনেসের বিষয়ে?

টাকা চাইছিল। তুই তো জানিসই আপু। তোর কাছ থেকে টাকা নিয়ে দিতে বলছিল

হুম। কিন্তু সে না-কি অয়নকে বলেছে যে সে বইয়ের বিজনেস করবে? অয়নকে দিয়ে এক কার্টুন বইও আনিয়েছে আজ।

তনু আধশোয়া হয়ে হাফসাকে খাওয়াচ্ছিল। অনুর কথা শুনে সে উঠে। বসলো। কি বলছিস আপু? বইয়ের বিজনেস? পাগল নাকি?

সেটাই তো! এই সময়ে কেউ বইয়ের বিজনেস করে? মানুষ বই পড়ে আজকাল?

আমি জানি না আপু। ও তো আমাকে কখনোই কিছু বলে না।

অনু আর কথা বাড়ালো না। সে ঘরে ফিরে চুপচাপ বসে রইল। তার কেন যেন মনে হচ্ছে আরো বড়সড় কোনো একটা ঝামেলা হতে যাচ্ছে। কিন্তু সেই ঝামেলাটা কী তা সে ধরতে পারছে না।

.

রাতে কখন ঘুমিয়ে গেল অয়ন নিজেই টের পেল না। তার ঘুম ভাঙলো ভোরে। সালমা বেগম বসেছিলেন অয়নের বিছানার পাশে। অয়ন মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসলো, তুমি এখানে কী করো?

কিছু না।

তাহলে এত সকালে এখানে বসে আছ যে!

এমনি, তুই ঘুমের মধ্যে কী সব বলছিলি।

কী বলছিলাম?

সব বোঝা যায় না, কিছু কিছু বোঝা যায়। পরীক্ষা নিয়ে কী সব বলছিলি, নুহার কথা বলছিলি।

অয়ন ভারি লজ্জা পেল, ঘুমের মধ্যে নুহার কথা কী বলছিল কে জানে! সে উঠতে উঠতে বলল, আমার ফোনটা একটু চার্জে দিয়ে দাও না। রাতে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সালমা বেগম ফোন চার্জ দিয়ে দিলেন। অয়ন বাথরুম থেকে এসে ফোন খুলতেই দেখে নুহার মেসেজ, তুই ফিরেছিস?

মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে দুই শব্দের ছোট্ট একটা মেসেজ। কিন্তু অয়নের কেন যেন মনে হলো সকালটা হঠাৎ সুন্দর হয়ে গেছে। সে ইচ্ছে করেই এক শব্দের মেসেজ পাঠালো, হু।

অয়ন ভেবেছিল নুহা ফোন করবে। কিন্তু নুহা আর ফোন করলো না। দুপুর অব্দি অপেক্ষা করে শেষে অয়নই ফোন দিলো। নুহা ফোন ধরেই বলল, মা'র সাথে নানু বাড়ি যাচ্ছি, তোকে পরে ফোন দিচ্ছি।

অয়ন কী ভাবলো, আর কী হলো! অয়ন যতটা নুহাকে নিয়ে ভেবেছিল, নুহা তার কিছুই ভাবেনি। সে ব্যস্ত ছিল তার নানু বাড়ি যাওয়া নিয়ে। অয়নের মনটা আবার থম মেরে রইল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। নুহা ফোন করলো রাতে। অয়ন তখন চুপচাপ বসেছিল বিছানায়। তার পাশে মা আর অনু। অয়নের খুব ইচ্ছে করছিল ফোনটা ধরতে। কিন্তু অনুর সামনে নুহার সাথে কথা বলার বিপদ সে জানে। মা আর অনু কী কী সব কথা বলল সেসব অয়নের কানেই ঢুকলো না। সে অপেক্ষা করছিল তাদের

চলে যাওয়ার। তারা গেল অনেক রাতে। তবে অয়ন জানে, তাকে না জানিয়ে চুপিচুপি রাতে আবার মা এসে তার পাশে বসে থাকবে। সে মাঝেমধ্যে টের পায়। কিন্তু ধরা দেয় না। আজও মা আসবে কি-না কে জানে! যদি আসে, তাহলে অত রাতে কারো সাথে ফোনে কথা বলতে দেখলে নির্ঘাত বকবে!

অয়ন তখনই ফোন দিলো। নুহা বলল, তুই কাল কখন ফিরলি রে? খুব টেনশন হচ্ছিল।

এইটুকু কথা, অথচ অয়নের আবারো কী যে ভালো লাগল! সে বলল, টেনশনের কী আছে!

ওভাবে গেলি, তারপর থেকে ফোন বন্ধ। তাছাড়া লোকটাকে আমার ভালো লাগেনি।

ও তো শামীম ভাই। তনু আপুর হাজবেন্ড।

ও, আচ্ছা। কিন্তু কেমন করে যেন তাকালো!

ধুর বোকা।

বোকাই ভালো। শোন নানু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লো। আমার ফিরতে কিছু দেরি হবে। তারপর বড় খাঁলারা সবাই এসেছেন আমেরিকা থেকে। কটা দিন থাকতেই হবে।

অয়নের মন আরো খারাপ হয়ে গেল। সে বলল, ক'দিন লাগবে?

এই ধর সপ্তাহখানেক?

পরীক্ষা সামনে রেখে এতদিন?

কী করব বল? নানু বেঁচে থাকতে সবার এমন গেট টুগেদার আর কবে হবে কে জানে! তুই কিন্তু কোচিং থেকে নোটসগুলো নিয়ে রাখিস।

আমি তো যেতে পারি না রোজ। মা, অনু আপু যেতে দেয় না। এখন আবার বেনু এসে জুটেছে।

তাও ঠিক, শরীরের দিকে একটু খেয়াল রাখিস, একদম কেমন হয়ে যাচ্ছে।

অয়ন কথা বলল না। চুপ করে রইল। নুহা বলল, অনেক রাত হয়ে গেছে, এখন ঘুমিয়ে পড়।

অয়নের ফোন রাখতে ইচ্ছে করছিল না। আবার কিছু বলতেও ইচ্ছে হচ্ছিল না। তার মনে হচ্ছিল নুহা আরো কিছুক্ষণ তার সাথে থাকুক। ফোনের ওপাশে কেবল ফোন কানে চেপে ধরে বসে থাকুক, এর বেশি কিছু নয়। কোনো কথা নয়, শব্দ নয় কেবল ওই থাকাটুকুই।

এই থাকাটুকুই কেমন একটা অদ্ভুত ওম ছড়ায় বুকের ভেতর। সে মৃদু গলায় বলল, তুই ঘুমিয়ে পড়বি এখন?

না না, ঘুমাবো কেন? বাসাভর্তি লোকজন। বললাম না, সব কাজিনরা এসেছে। আমার বড় খাঁলার ছেলে, আদিল ভাইয়া, হি ইজ জাস্ট আ জিনিয়াস। আর এত হাসাতে পারে, এত এত। তোর পেটে খিল ধরে যাবে। আমরা এখন বড় খাঁলা আর মামার সাথে বাজিতে লুডু খেলবো। আদিল ভাইয়া আর আমি এক দলে। আমার অবশ্য হারলেও ভয় নেই, আদিল ভাইয়া তো আছেই।

নুহা হাসছে। অয়নের মনে হচ্ছে কোথায় যেন ভাঙা তীক্ষ্ণ কাঁচের মতো বিধে যাচ্ছে একটা সূক্ষ্ম যন্ত্রণা। সে বলল, রাখি তাহলে?

নুহা যেন রাখার অপেক্ষায়ই ছিল। সে সাথে সাথেই বলল, আচ্ছা, রাখছি তাহলে অয়ন।

সেই সারাটা রাত অয়নের আর ঘুম হলো না। একটা বিশ্রি অস্থিরতা ভেসে বেড়ালো শরীর জুড়ে। এই প্রথম অয়ন পুরোপুরি নিশ্চিত হলো, নুহাকে সে ভালোবাসে। খুব কাছের বন্ধু হিসেবে না, অন্য কোনোভাবে ভালোবাসে সে। কিন্তু এইভাবে ভালোবাসতে সে চায়নি।

৩

অনুর অফিস ঠিকঠাক। গাইবান্ধা ট্যুরের সেই রাতের ঘটনা নিয়ে অনু বা আলতাফ হোসেন কেউ আর কোনো কথা বলেনি। পরদিন ভোরেই জরুরি কাজের কথা বলে গাইবান্ধা থেকে ঢাকা ফিরে আসেন আলতাফ হোসেন। ট্যুরের বাকি দিনগুলো পুরো টিমের দেখভালের দায়িত্ব পড়ে অনুর কাঁধেই। ঢাকায় ফিরে আবার অফিস করা নিয়ে ভীষণ দুশ্চিন্তায় ভুগছিল অনু। সে জানে, কেউই হেরে যেতে পছন্দ করে না। যে মানুষ জয়ী হবার যোগ্য নয়, সেও পরাজয় মেনে নিতে পারে না। আর পরিস্থিতি তাকে পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য করলেও, সে সারাজীবন বুকের ভেতর লালন করতে থাকে তীব্র প্রতিশোধ স্পৃহা। চেতনে-অবচেতনে অপেক্ষায় থাকে সুযোগের।

এই কথা জানে বলেই অনুর দুশ্চিন্তা হচ্ছিল খুব। যদিও অনুর মনের আরেকটি অংশ তাকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করছিল যে, আলতাফ হোসেন প্রকৃতপক্ষে এমন মানুষ নন। দু'দুটো বছর একসাথে কত কাজ করেছে তারা, ঢাকার বাইরে দীর্ঘ সময়ের জন্য কত ফিল্ডওয়ার্কে গিয়েছে। কিন্তু কই, আগে কখনোই তো এমন কিছু করেননি আলতাফ হোসেন! তাহলে হঠাৎ করে এমন কী হয়েছে তার? সম্ভবত এ কারণেই এমন ভয়ানক ঘটনার পরও আলতাফ হোসেন সম্পর্কে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্তেই আসতে পারছিল না অনু। এটি তার নিজের চিন্তার কোনো দুর্বলতা কি-না কে জানে!

আলতাফ হোসেনও অবশ্য অনুকে আর ঘাটালেন না। বরং যতটা সম্ভব এড়িয়েই চলেন। খুব প্রয়োজন না হলে তাদের মধ্যে কথাবার্তাও তেমন হয় না। তবে বিষয়টি যে অফিসের অনেকের নজর এড়ায়নি, অনু তা বুঝতে পারছিল। সেদিন ডাটা এনালাইসিস স্পেশালিস্ট শাহানা আপা অনুকে ডেকে বললেন, ঘটনা কী বলেন তো অনু?

অনু অবাক গলায় বলল, কী ঘটনা আপা?

না মানে আলতাফ সাহেব হঠাৎ অফিসে কেমন চুপচাপ হয়ে গেছেন, খেয়াল করেছেন?

অনু খানিকটা তটস্থ গলায় বলল, কই, না তো আপা?

আপনার বস, আর আপনি খেয়াল না করলে হবে? এটা কোনো কথা হলো অনু? জিজ্ঞেস করেন, জিজ্ঞেস করেন। বসের ভালো-মন্দের খেয়াল রাখাও কিন্তু এক ধরনের অফিসিয়াল রেসপন্সিবিলিটিই অনু।

উনার ব্যক্তিগত কোনো বিষয়ও তো হতে পারে আপা। ব্যক্তিগত বিষয় জিজ্ঞেস করা কী ঠিক হবে?

শাহানা আপা হাসতে হাসতে বললেন, ব্যক্তিগত বিষয় তো ব্যক্তিরাই জানবে। জিজ্ঞেস করবে, তাই না? আপনার কি মনে হয় আপনি ব্যক্তি না?

অনু কোনো জবাব দেয়নি আর। তবে বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রেই দৃষ্টিকটুও হয়ে যাচ্ছে। এই যেমন সেদিন অনুকে একটা ইনফরমেশন দেয়ার জন্য আলতাফ হোসেন ফোন করলেন অনুর মুখোমুখি ডেস্কে বসা হাসানের ইন্টারকমে। হাসান ফোন রেখে বলল, আলতাফ ভাইয়ের সাথে আপনার কোনো ঝামেলা হয়নি তো?

অনু কী একটা জরুরি কাজ করছিল। ঝট করে মুখ তুলে বলল, কেন?

না মানে আমাকে ফোন দিয়ে বললেন আমি যেন আপনাকে জানিয়ে দেই যে কালকের মিটিংটা দুপুর তিনটার বদলে সকাল সাড়ে নটায় এগিয়ে আনা হয়েছে।

অনু আবার কাজে ডুবে যেতে যেতে নির্বিকার গলায় বলল, ওহ্! আমার ইন্টারকমটা ঝামেলা করছে, এই জন্য সম্ভবত আপনাকে ফোন দিয়েছিলেন।

অনু যা-ই বলুক, বিষয়টা অফিসে সবার নজরে পড়ছে। এই নিয়ে আড়ালে আবডালে ফিসফিসানিও শুরু হয়েছে। আজ অফিস শেষে অনু যখন ব্যাগ গোছাচ্ছিল, তখন হাসান এসে দাঁড়ালো অনুর পাশে। তারপর বলল, বাসায় যাবেন তো?

অনু বলল, হু।

আপনার বাসা তো মোহাম্মদপুরের দিকটাতে?

জি।

আমার ছোটখালার বাসা মোহাম্মদপুরের তাজমহল রোডে। খালা অনেকদিন থেকেই অসুস্থ। যাব যাব করেও যাওয়া হচ্ছিল না বহুদিন। আজ। ভাবছি যাব। চলুন একসাথে যাওয়া যাক।

অনু ব্যাগটা কাঁধে ঝোলাতে ঝোলাতে মৃদু হেসে বলল, আমি তো হাসান ভাই এখন সরাসরি ওদিকে যাব না। একটা কাজ আছে বসুন্ধরা সিটিতে। ওখান থেকে কাজটা সেরে বাসায় যাব।

সমস্যা নেই, আমার সাথে বাইক আছে, চলুন বসুন্ধরা হয়েই যাই। আপনার কাজ শেষ হলে বাসায় পৌঁছে দিলাম।

অনু চাইছিল না হাসানের সাথে যেতে। এমনিতেই অফিসে নানান ফিসফাস। এর মধ্যে হাসানের সাথে বাইকে যাওয়া নিয়ে আবার কি হয় কে জানে! তাছাড়া বিষয়টি আলতাফ হোসেনেরও চোখ এড়ানোর কথা নয়। কিন্তু এখন কী করবে সে? হাসান বলল, অফিস ছুটির এই সময়ে রাস্তায় যা জ্যাম। আবার বাস পেতেও রীতিমত যুদ্ধ করতে হয়। তাছাড়া আপনি যতক্ষণে বাস পেয়ে জ্যাম ঠেলে বসুন্ধরা যাবেন, ততক্ষণে বসুন্ধরা বন্ধই হয়ে যাবে।

অনুর যে বসুন্ধরায় কোনো কাজ নেই, তা নয়। তবে সেটি আজ না করলেও চলতো। হাসানকে এড়ানোর জন্যই সে হুট করে বলে ফেলেছে। যদিও অনেক দিন থেকেই সে যাবে ভাবছিল। কিন্তু নানা কারণেই যাওয়া হচ্ছিল না। বসুন্ধরা সিটির পাশেই তোহা ইকরামের অফিস। অনুর কলেজ জীবনের বান্ধবী অদিতির হাজবেন্ড তোহা। বছর সাতেক আগে চাকরি ছেড়ে আইটি বিজনেস শুরু করেছিল সে। সেই বিজনেস এখন মোটামুটি বড় হয়েছে। তোহা আর অদিতির সাথে ভালো একটা যোগাযোগই ছিল অনুর। কিন্তু নানান ব্যস্ততায় সেই যোগাযোগ অনেকটাই ফিকে হয়ে এসেছে। সপ্তাহ কয়েক আগে হঠাৎ দুজনের সাথে দেখা অনুর। কথায় কথায় তোহা বলছিল, নতুন একটি বিজনেস ভেঞ্চার শুরু করছে সে। এই নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। অফিস গোছানোও প্রায় শেষ। এখন লোক নিয়োগ চলছে।

কথাটা খট করে কানে আটকে গিয়েছিল অনুর। অনু আসলে বুঝতে পারছিল, যত দ্রুত সম্ভব, নতুন একটা চাকরির ব্যবস্থা করা খুব জরুরি তার। এই অফিসে এভাবে আর বেশিদিন টিকতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। তোহাকে তাই দিন কয়েক আগে নিজ থেকেই ফোন করেছিল অনু। যদিও নিজের চাকরির কথা বলেনি সে। বলেছিল, তার এক বন্ধুর কথা। তোহা হা-না কিছু বলেনি। বলেছিল একদিন অফিসে গিয়ে সরাসরি কথা বলতে।

তো আজ যাই, কাল যাই করেও আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি অনুর। কোথায় যেন একটা বাধো বাধো ঠেকছিল তার। একে তো বান্ধবীর হাজবেন্ড, তার ওপর সে তো আসলে নিজের চাকরির কথাই বলবে। এই দুই মিলিয়ে অনু সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। কিন্তু দিন দিন অফিসের যা অবস্থা, তাতে মনে হয়

এই সংকোচ আর বেশিদিন ধরে রাখতে পারবে সে। হাসান আবারো তাড়া দিলো অনুকে, কোনো সমস্যা?

অনু খানিকটা থতমত খাওয়া গলায় বলল, না, কোনো সমস্যা না।

হাসান বলল, চলুন তাহলে।

অনু কী করবে বুঝতে পারছিল না। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে শেষে বলল, একটু ফোন করে দেখি, যার সাথে দেখা করব, উনি আছেন কি-না?

অনু পরপর দু'বার ফোন করলো। কিন্তু ও পাশ থেকে ফোন রিসিভ হলো না। হাসান জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। অনু বলল, আজ মনে হয় আর ওদিকে যাওয়া হবে না। উনি ফোন ধরছেন না।

এমনও তো হতে পারে যে আমরা যেতে যেতে উনি ফোন করলেন?

অনু একবার সে কথাও ভাবলো। কিন্তু তারপর আবার মত বদলালো। বলল, নাহ্, আজ থাক। এমন জরুরি কিছু নয়। অন্য কোনোদিনও যাওয়া যাবে।

চলুন তাহলে। আর কোনো কাজ তো নেই, না-কি?

অনু মাথা নাড়লো। হাসানের সাথে বাইকে উঠতে অনুর একটুও ইচ্ছে করছিল না। আজকাল তার আর পুরুষ মানুষ সহ্য হয় না। তা সে যে-ই হোক না কেন। অনু তার নিজের একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে অবাক হচ্ছে, সুস্থ স্বাভাবিক একজন তরুণী মেয়ে হিসেবে একজন পুরুষের প্রতি যে সহজাত আকর্ষণ বা শরীরী স্পর্শের আকাঙ্ক্ষা থাকার কথা, তা তার নেই। বরং পুরুষের আশেপাশে গেলেই সবসময় একটা তীব্র আতঙ্ক আর গা ঘিনঘিনে অনুভূতি হয় তার। অনু জানে না এটি তার জন্য খারাপ না ভালো। কিন্তু ব্যাপারটি লক্ষ করে সে কিছুটা অবাকই হলো। তার সবসময়ই কেন যেন মনে হয়, পুরুষ মানুষ মানেই তার জীবনে আরো কিছু ঝামেলা, আরো কিছু দুঃসহ অভিজ্ঞতা, ভয়াল স্মৃতি। এই অভিজ্ঞতা সে আর বাড়াতে চায় না। তার ইচ্ছে করছে হাসানের মুখের উপর বলে দিতে যে সে হাসানের সাথে যাবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে এটি মোটেই ঠিক হবে না। অনু উঠল। তবে মাঝখানে যথেষ্ট জায়গা ফাঁকা রেখেই বসলো সে। হাসান বাইক স্টার্ট দিয়েই বলল, আপনার বসতে কী কোনো অসুবিধা হচ্ছে?

অনু সামান্য শক্ত গলায় বলল, নাহ্, ঠিক আছি। আপনি যান, সাবধানে চালাবেন।

ঢাকা শহরে বাইকে চড়ার অভিজ্ঞতা খুব একটা নেই অনুর। অফিস শেষ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাসের ভিড়, হৈ চৈ আর ঘামে ভেজা মানুষের গায়ের গন্ধে নাক মুখ চেপে বাড়ি ফেরাই তার অভ্যাস। কিন্তু আজ বাইকটা যেন একটানে ফুড়ত করেই তাদের নিয়ে এলো বিজয় সরণিতে। খোলা হাওয়ায় কী যে ভালো লাগছিল অনুর! বিজয় সরণির সিগন্যাল পেরিয়ে তারা সোজা ঢুকে গেল ক্রিসেন্ট লেকের পাশের সুন্দর, চওড়া রাস্তাটাতে। কিন্তু রাস্তার মুখেই অঘটনটা ঘটলো। রাস্তায় পড়ে থাকা কিছুতে বাইকের সামনের চাকাটা ফুটো হয়ে হাওয়া বেরিয়ে যাওয়ায় থপথপ শব্দ হতে লাগল চাকায়। হাসান তারপরও যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল চালিয়ে নিতে। কিন্তু শেষ অব্দি নিয়ন্ত্রণ রাখাই কঠিন হয়ে গেল। ফলে থামতেই হলো তাকে। সে করুণ মুখ করে তাকালো অনুর দিকে। অনুর ভেতরে ভেতরে কেন যেন একটা অশনি ডাকছিল। হাসানকে অবশ্য তা বুঝতে দিলো না অনু। সে বলল, এখন কী হবে?

হাসান হাসলো, কী আর হবে? এটা তো কাঁধে করে আমাদের দু'জনকে অনেকদূর নিয়ে এলো, এবার আমাদের পালা। চলুন, দু'জন মিলে ওকে কাঁধে তুলে নেই।

অনু জবাব দিলো না। ক্রিসেন্ট লেকের এই জায়গাটা ফাঁকা, অন্ধকার। তবে কাছাকাছি লোকজন না থাকলেও খানিক দূরেই লোকজন আর আলো দেখা যাচ্ছে।

হাসান বলল, আপনার উপকার করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তো বিপদেই ফেলে দিলাম দেখছি। এই রাস্তায় না চলে বাস, না রিকশা। একমাত্র সিএনজিই যা পাওয়া যেতে পারে। তবে খালি সিএনজি পাওয়ার সম্ভাবনা এখন নেই বললেই চলে।

অনু বলল, কিন্তু এটা কীভাবে নিবেন? তাছাড়া এটা সারাতেও তো হবে!

হুম। সেটাই ভাবছি। কিছুটা যেতে পারলে একটা উপায় হতো। কাছেই মোহাম্মদপুরের বিহারি ক্যাম্প, ওখানেই সারানোর ব্যবস্থা আছে।

সে তো পায়ে হাঁটা অনেকটা পথ!

আর তো উপায় দেখছি না!

অনু আর কথা বাড়ালো না। হাসান বাইক ঠেলে নিয়ে হাঁটা শুরু করলো। পাশে অনুও। খানিকটা পথ দুজনই চুপচাপ হাঁটলো। তারপর হাসান হঠাৎ বলল, একটা কথা বলি?

অনু কিছু ভাবছিল। আচমকা হাসানের প্রশ্ন শুনে বুঝতে খানিক সময় লাগল তার। সে মুখ ঘুরিয়ে হাসানের দিকে তাকিয়ে বলল, জি, বলুন?

আপনার কী কখনো মনে হয় না যে আপনি আপনার নিজের জীবনটা যাপন করছেন না?

তাহলে কার জীবন যাপন করছি?

অন্য কারো, যাকে আপনি চেনেন না।

যাকে চিনি না, তার জীবন কি করে যাপন করব?

এমন হয়, আমরা অনেকেই করি। ধরুন, আমি। আমার কাউকে কিছু একটা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, বা কিছু একটা করতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু নানা কারণেই সেটা আমি বলতে পারছি না বা করতে পারছি না। এই না পারাটা কিন্তু আমি না, অন্য কেউ। এখন এই দশার ভেতর দিয়ে যদি আমাকে দিনের পর দিন যেতে হয়, তাহলে একটা সময় গিয়ে আমি কিন্তু আর আমি থাকব না, আমি হয়ে যাব অন্য কেউ।

অন্য কেউ হবেন কেন? আপনি যদি কিছু বলতে না পারেন, বা করতে পারেন, মানে যা আপনি চান, তাহলে সেই না পারাটাই তো আপনি।

উঁহু। আমি বোধহয় আপনাকে বোঝাতে পারছি না। ধরুন, আমি অন্যদের বলতে পারছি, বা একইরকম অন্য কাজটি করতে পারছি। কিন্তু পার্টিকুলার কারো ক্ষেত্রে বা কোনো একটি কাজের ক্ষেত্রে এসে আমি আটকে যাচ্ছি। তখন আমি আমার মতো না, অন্য একটা মানুষের মতো বিহেভ করছি। আমি তখনকার কথা বলছি...।

তখন আপনাকে বুঝতে হবে, ওই পার্টিকুলার মানুষ বা কাজের ক্ষেত্রে আপনার কোনো দুর্বলতা আছে।

আমার কি তখন সেই দুর্বলতাটা কাটিয়ে উঠে তাকে আমার কথাটা বলা উচিত?

অনুর হঠাৎ মনে হলো, হাসান কি তাকে ইঙ্গিতে বিশেষ কিছু বলতে চাইছে? সে কি আকারে ইঙ্গিতে তার কাছে বিশেষ কোনো কথা বলার অনুমতি চাইছে? অনু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, এটা সম্পূর্ণই আপনার ব্যাপার। অনেক সময় হয়তো দুর্বলতাটা থাকাই উচিত। সেই কাজটি না করা বা কথাটি না বলাই ভালো।

মানে অন্য মানুষ হয়ে বাঁচাটা?

হয়তো।

হাসান কিছুক্ষণ কোনো কথা বলল না। তারপর আবার বলল, আপনি হয়তো ভেবেছেন, আমি আপনাকে কোনো বিশেষ কথা বলতে চাই। হয়তো এক্ষেত্রে আমার কোনো দুর্বলতা আছে। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। আমি আপনাকে আমার জন্য কোনো বিশেষ কথা বলতে চাইনি। আমি আপনার জন্যই আপনাকে একটা বিশেষ কথা বলতে চেয়েছি।

হাসানের কথা শুনে অনু সামান্য দমে গেল। সে মনে মনে যা ভাবছিল, হাসান তা ঠিক ঠিক ধরে ফেলল। বিষয়টা তার জন্য খানিক বিব্রতকর। হাসানই বলল, এই যে ধরুন, আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাইলাম। কিন্তু আপনার সাথে সাথে মনে হলো আমি হয়তো আপনাকে প্রেমের অফার করব, বা এই ধরনের কিছুই বলব, তাই তো?

অনু এবারো জবাব দিলো না। হাসান আবার বলল, এই যে সবসময় আপনার মাথায় ঘুরছে যে, যে-কোনো পুরুষই হয় আপনাকে প্রেমের অফার দেবে, না হয় এই ধরনের আপত্তিকর কিছু একটা বলবে। এটা কেন মনে হয় আপনার? না-কি সব মেয়েরই এমন মনে হয়? সব মেয়েই কী ভাবে যে তার আশেপাশের সব পুরুষই সবসময় কেবল সুযোগ খোঁজে? প্রেম বা অন্যকিছুর?

হাসান একটু থেমে আবার বলল, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাইছি? অন্যভাবে নেবেন না, হতে পারে খুব অনিন্দ্য রূপবতী, বা অতি উচ্চ মোগ্যতাসম্পন্ন কোনো মেয়ের ক্ষেত্রে এটা হয়তো স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু সব মেয়ের ক্ষেত্রে তো এমনটা হবার কথা নয়। সব মেয়ের ক্ষেত্রেই তো পুরুষের এমনটা করার কথা নয়! আর আপনার ক্ষেত্রে তো আরো কম হবার কথা।

অনু আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আপনার কথার একটা অংশ ঠিক হাসান ভাই, আরেকটা অংশ ঠিক নয়। যেই অংশটা ঠিক, সেটি হচ্ছে, হ্যাঁ, আমার এমন মনে হয় যে যে-কোনো পুরুষই যখন আমার সম্পর্কে জানে, শোনে, তখন তার একটাই উদ্দেশ্য থাকে। আর সেই উদ্দেশ্যটি আমি বুঝি। বুঝি মানে, এটা কেবল আমার অনুমান নয়।

এটা আমার অভিজ্ঞতা থেকে বোঝ। আর দ্বিতীয় যেটি আপনি বললেন, সেটি ভুল। খুব রূপবতী বা অতি উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো মেয়েকে অ্যাপ্রোচ করার আগে সেই পুরুষ মানুষটাকে আরো অনেক কিছু নিয়ে ভাবতে হয়। তার নিজের যোগ্যতা, তার এস্টাবলিশমেন্ট, তার এমন আর কী কী রয়েছে যা দেখিয়ে সে মেয়েটার সামনে সমান সমান দাঁড়াতে পারবে? এই সব কিছু নিয়ে তাকে ভাবতে হয়। তাছাড়া সে জানে যে মেয়েটা মোটেই সহজলভ্য নয়।

তার মানে, আপনার ধারণা আপনি সহজলভ্য বলেই এমন মনে হয়। আপনার?

অনুর চোয়াল যেন একটু শক্ত হলো। সে বলল, আমি মোটেও সহজলভ্য নই হাসান ভাই। এমনকি আমি আমাকে কোনোভাবেই সহজলভ্য ভাবিও না। সমস্যা হচ্ছে, আমার ভাবায় আসলে কিছু যায় আসে না। কারণ আমি যে। সমাজে বাস করি, সেই সমাজের ভাবনায়, সেই সমাজের পুরুষের ধারণায় আমি সহজলভ্য। আমার যে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা, তা পুরুষকে এটা ভাবতে উৎসাহিত করে যে সে চাইলেই আমাকে পেতে পারে। খারাপভাবে বললে, আমাকে ব্যবহার করতে পারে। আমি জানি, আমি এমন কোনো রূপবতী বা যোগ্যতাসম্পন্ন মেয়ে নই যে, জগতের সকল পুরুষ এসে আমার চারপাশে মৌমাছির মতো গুনগুন করতে থাকবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, আমার চারপাশটা অনেকটা তেমনই। আমার চারপাশে সবসময়ই অসংখ্য পুরুষ এসে গুনগুন না হলেও ভনভন করতে থাকে, এর কারণ কী জানেন?

কী?

এর কারণ আমি একা, অরক্ষিত। এই সমাজের এবং পুরুষের ধারণা, একটি মেয়েকে জন্মের পর অবশ্যই তার বাবার পরিচয়ে বা আশ্রয়ে তাকে থাকতে হবে। বড় হতে হবে, কেবল তাহলেই সে নিরাপদ। আর বাবা যদি নাও থাকেন, তার মাথার উপর বড় একটি ভাই হলেও থাকতে হবে। অর্থাৎ একজন পুরুষের আইডেন্টিটিতে তাকে থাকতে হবে। যে তাকে রক্ষা করবে, ছায়া দেবে। তারপর আসবে স্বামী, বিয়ের পর থেকে বাদবাকি জীবন তাকে স্বামীর পরিচয় নিয়ে থাকতে হবে। স্বামীর মৃত্যুর পর আবার সন্তানের পরিচয়। এবং মনে রাখতে হবে, সেই সন্তান মেয়ে হলে কিন্তু চলবে না। হতে হবে ছেলে সন্তান। অর্থাৎ সবক্ষেত্রে নারীর একজন পুরুষের আইডেন্টিটি লাগবে, রক্ষাকর্তা লাগবে, তার নিজের নিরাপত্তার জন্য।

অনু সামান্য থামলো। ব্যাগটা বাঁ কাঁধ থেকে ডান কাঁধে নিতে নিতে সে আবার বলল, এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তার নিরাপত্তা কেন দরকার? বা একটা মেয়ে অনিরাপদ কেন হবে? মজার ব্যাপার হচ্ছে, যে পুরুষকে নারীর রক্ষাকর্তা হিসেবে দরকার হয়, আবার সেই পুরুষের কারণেই কিন্তু সে অনিরাপদ। আমরা এনজিওর ভাষায় যাকে বলি ভালনারেবল, বিপদাপন্ন। কারণ পুরুষ তাকে ধান, চাল, আটা, গম, গয়না কিংবা আর সকল ভোগ্যপণ্যের মতোই মনে করে। এমনকি তাদের কাছে নারী হতে পারে মাঠের ফসলের

মতোও। ধরুন, পাশাপাশি অনেকগুলো ফসলের মাঠ। প্রতিটি ফসলের মাঠেই দারুণ ফসল ফলেছে। সেই মাঠগুলোর চারপাশে সুন্দর করে বেড়া দেয়া, সেই মাঠগুলোর প্রত্যেকটিরই একজন করে সবল রক্ষাকর্তা রয়েছেন। আর তার ঠিক পাশেই আরো একটি ফসলের মাঠ। কিন্তু সেই মাঠটি সম্পূর্ণ অরক্ষিত, এর কোনো বেড়া নেই, কোনো রক্ষাকর্তাও নেই। এমনকি এই মাঠের ফসল আর সকল মাঠগুলোর মতো অমন হৃষ্টপুষ্ট বা আকর্ষণীয়ও নয়, বরং কিছুটা অপরিপুষ্টই। কিন্তু তারপরও দেখবেন সকলের দৃষ্টি এই মাঠটির দিকেই। তা সে গরু, ছাগল, মহিষ বলেন, আর চোর বা মানুষই বলেন। সকলেই চাইবে মুফতে যদি কিছু নিয়ে নেয়া যায়। বিষয়টা এমন নয় যে তারা বাকি মাঠগুলোর ফসল চায় না। সেগুলো বরং আরো বেশিই চায়, কিন্তু সাহস হয় না। কারণ, সেগুলো যে সহজলভ্য নয়। সেখানে যে রক্ষাকর্তা আছে। সমস্যা হচ্ছে আমার কোনো পুরুষ রক্ষাকর্তা বা আইডেন্টিটি নেই। না বাবা, ভাই, না স্বামী। ফলে আমি অনেকটা পরিচয়হীন, অরক্ষিত। আর যেহেতু আমি মেয়ে, সেহেতু তাদের কাছে আমি অবশ্যই ভোগ্যপণ্য। এখন যে ভোগ্যপণ্যের রক্ষাকর্তা নেই, তা সে যতই সস্তা হোক, কমদামি, কম উপাদেয় হোক, অন্যরা তো তা এটো করতে চাইবেই, চাইবে না?

অনু দীর্ঘশ্বাস ফেলতে গিয়েও আটকালো। বলল, এইজন্যই আমার চারপাশটা এমন। যখনই কেউ জানে এই বয়সেও আমার বিয়ে হয়নি, অথচ আমার ছোট দু'বোনের বিয়ে হয়ে গেছে, বাচ্চাও আছে একজনের, আমার বাবা নেই, ঠিক তখনই তাদের আমাকে সহজলভ্য মনে হয়। মনে হয়, আমাকে চাইলেই পাওয়া যাবে। বা আমি আমার নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি। আরো কত কী যে তারা ভাবে। একজন পুরুষ মানুষ হিসেবে আপনার তো এসব অজানা থাকার কথা নয়!

হাসান সাথে সাথেই জবাব দিলো না। অনেকটা পথ হাঁটলো চুপচাপ। তারপর বলল, আপনার ধারণা আপনার চারপাশের সব পুরুষই কোনো না। কোনোভাবে আপনার প্রতি এই একই ধারণা পোষণ করেন?

হয়তো না, তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বহুদিন এর ভিন্ন কাউকে আমি পাইনি।

আপনার কি মনে হয় না যে আপনার ভাবনাও এক্ষেত্রে কিছুটা দায়ী। আপনি কাউকেই বিশ্বাস করতে পারেন না। আমি তখন যেটা বলছিলাম, একই ঘটনা ঘটতে ঘটতে, সবাইকেই আপনি এখন ওই একইভাবে ভাবা শুরু করে দেন। সেটা একদম প্রথম থেকেই। আপনি ধরেই নেন যে পুরুষ মানুষ মানেই এমন। কিংবা যে কারো যে-কোনো আচরণেরই একটা ফিক্সড ইন্টারপ্রেটেশন আপনি দাঁড় করিয়ে ফেলেন?

কী জানি! এগুলো নিয়ে আজকাল আর আমার ভাবতে ভালো লাগে না। হাসান ভাই।

আপনার কেন মনে হয়, কেউই আপনাকে সত্যিকারের ভালোবাসে না? কেন সবাই আপনাকে অন্যরকমভাবে পেতে চায়? সুযোগ নিতে চায়? এটা কি ঠিক বলুন?

অনু হাসলো, আজ থাক হাসান ভাই। এসব নিয়ে কথা বলতে ভালো। লাগছে না।

হাসান তারপরও বলল, কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে আপনার এই তিক্ত সব অভিজ্ঞতার কারণে একদম ফিক্সড যে ভাবনাটা আপনার মাথায় গেঁথে গেছে, সেই ভাবনাটাই আপনার সত্যিকারের অনেক বন্ধু বা শুভাকাঙ্ক্ষীকেই তাদের প্রাপ্য সুযোগ বা জায়গাটা আপনাকে দিতে দেয়নি! অনেকটা ঠগ বাছতে গা উজার হয়ে যাওয়ার মতোই তারাও আর সকল লম্পট, সুযোগ সন্ধানী পুরুষের সাথেই ভেসে গেছে?

কথাটা অনু বিশ্বাস করে না। তার কাছে পুরুষ মানুষ মানেই এক গা। ঘিনঘিনে আতঙ্কের নাম। হ্যাঁ হতে পারে, এই এত এত সব পুরুষের মাঝেও কোনো একজন হয়তো সত্যি সত্যিই তাকে ভালোবেসেছিল। কেউ কেউ হয়তো সত্যি সত্যিই তার বন্ধু হতেই চেয়েছিল। কিন্তু অনু তা বুঝবে কী করে! যেখানেই সে বিশ্বাস করেছে, সেখানেই সুযোগ পেতেই ফস্ করে ফণা তুলেছে বিষাক্ত সাপ। হাসানের কথার আর কোনো জবাব দিলো না অনু। দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে এসে তারা বিহারি ক্যাম্পে বাইক সারালো। শেষমেশ বাসায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে সেই দেরিই হলো অনুর। গেটের সামনে অনুকে নামিয়ে দিয়ে চলে যেতে গিয়েও হাসান হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। তারপর বলল, একটা কথা বলি?

অনু জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকালো। হাসান মৃদু হাসলো। তারপর বলল, আপনার ধারণা ঠিক ছিল, আমি আসলে আপনাকে বিশেষ কিছুই বলতে চেয়েছিলাম। আর তা আমার জন্যই।

অনু এবারও কথা বলল না। তার কেবল মনে হচ্ছে দোতলার জানালাটার ফাঁক দিয়ে সেই ভয়ংকর মানুষটা শিকারি চিতার মতো ওঁত পেতে আছে। যে কোনো মুহূর্তে তীক্ষ্ণ নখর বাগিয়ে সে অনুর ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। অনু অনেক চেষ্টা করেও হাসানের কথায় মনোযোগ দিতে পারছে না। তার ভয় হচ্ছে, ভীষণ। ভয়। হাসান আবারো বলল, আমি আপনাকে আমায় বিশ্বাস করতে বলছি না। কিন্তু আপনি কি আমার প্রতি আপনার অবিশ্বাসটা একটু কমাতে পারবেন?

অনু বিড়বিড় করে বলল, আজ যাই হাসান ভাই, এই নিয়ে আরেকদিন কথা বলি?

হাসানকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই অনু ত্রস্ত পায়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। হাসান আহত এবং অবাক দৃষ্টি মেলে অনুর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

*

পরপর বেশ কয়েকদিন আর বাসা থেকে বের হলো না অয়ন। বাইরে যাওয়ার। সেই আগ্রহটাও যেন হঠাৎ কোথায় উবে গেল। নুহা ছাড়া তার কাছের বন্ধু বলতে রনি আর মাসুদ। ওরা একবার এসেও ছিল। কিন্তু অয়ন আর বের হয়নি। নুহাকে নিয়ে সারাক্ষণ মাথার ভেতর যে একটা স্পষ্ট অস্থিরতা, সেই অস্থিরতাটা কাটাতে চাইছিল অয়ন।

সেদিনের পর নুহার সাথে আর কথা হয়নি তার। নুহা অবশ্য ফোনও দেয়নি। বার কয়েক ফোন দিতে ইচ্ছে হয়েছিল অয়নের। কিন্তু নিজেকে বহু কষ্টে সামলেছে সে। আজ দুপুরটা যেন একটু কেমন। সকাল থেকেই আকাশজুড়ে মেঘ, বৃষ্টিটা নামলো দুপুরে, সাথে একটা ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। অয়নের ঘুম পেয়ে গেল। ঘুম থেকে উঠে দেখে নুহার ফোন। অয়ন অবশ্য তাড়াহুড়া করলো না। হাত-মুখ ধুয়ে সামান্য কিছু খেলো। তারপর। নুহাকে ফোন দিলো। নুহার গলায় কেমন বিষাদ, তোর কোনো খবর নেই কেন অয়ন?

অয়ন হাসলো, কে বলল খবর নেই?

এই যে, এতদিন হয়ে গেল একটা ফোন অব্দি দিলি না?

তুই ব্যস্ত থাকবি ভেবে দেইনি।

ব্যস্ত থাকব বলে ফোন দিবি না? এটা কেমন কথা?

আচ্ছা, তুই কেমন আছিস?

এমনিতে ভালো, যদিও পড়াশোনার বারটা বাজিয়ে এই অসময়ে এলাম। তারপরও এভাবে সবাইকে তো আর কখনো একসাথে পেতাম না। সব খালা, মামা, কাজিনরা এসেছে। এত মজা অনেকদিন হয়নি।

তাহলে তো বেশ আছিস।

জানি না অয়ন, সব ঠিকই আছে। কিন্তু তারপরও আমার কিছু ভালো লাগছে না।

কেন?

কী জানি কেন?

অয়ন চুপ করে রইল, নুহাও। তারপর নুহা যেন সসংকোচে বলল, তোকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে অয়ন।

অয়নের বুকের ভেতর আচমকা জল ছলকে উঠল, তাই?

হুম। তোর সাথে আমার কিছু কথা আছে অয়ন।

কী কথা?

গোপন কিছু কথা।

বল?

এভাবে ফোনে না, আগে আসি, তারপর বলব। কত কথা যে জমেছে!

অয়ন অনেক চেষ্টা করছে নিজেকে সামলে রাখতে। কিন্তু কতটুকু পারছে নিশ্চিত নয়। সে বলল, কবে ফিরবি?

কালই তো ফেরার কথা। কিন্তু কাল হয়তো হবে না।

আচ্ছা।

তুই ভালো আছিস? আর সব ভালো?

হ্যাঁ, ভালো।

কোচিংয়ে যাচ্ছিস?

উঁহু।

শরীর খারাপ করছে আবার?

নাহ্, শরীর ঠিক আছে।

মন খারাপ?

অয়ন কতকিছু বলবে ভেবেও শেষে বলল, নাহ্।

অয়ন?

বল।

আমার না সবকিছু ছেড়ে-ছুঁড়ে দূরে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করছে।

এমন সবারই করে।

তোরও?

খুব।

কোথায় যেতে ইচ্ছে করে?

তা তো জানি না, তবে দূরে কোথাও, অচেনা কোথাও।

তখন কাউকে সাথে নিতে ইচ্ছে করে না? মনে হয় না, ওই মানুষটা যদি তখন পাশে থাকত?

অয়নের খুব মন চাইছিল বলতে। কিন্তু সে বলল। তবে নুহার জন্য বুকের ভেতরটা আবার কেমন করতে লাগল। উত্তরে হিম হাওয়ার মতো একটা বুক হুহু করা শূন্যতা। নুহা কী

বলবে তাকে? এভাবে এত স্পষ্ট করে আগে কখনো নুহা তাকে কিছু বলেনি। আচ্ছা, নুহা যদি তাকে তেমন কিছুই বলে, সে কী করবে তখন? অয়ন জানে, এই সময়টা ভীষণ ভুলের সময়। এই যে যখন তখন মন কেমন করে ওঠে, বুকের ভেতর কী জানি কী থম মেরে থাকে, গলার কাছে দলা পাকিয়ে ওঠে কষ্ট, এই সময়টা ভীষণ খারাপ। তার এখন কত কত বিপদ! কী না কী অসুখ হয়েছে, ঘরভর্তি নানান অশান্তি, সামনে আরো কত ঝড় ঝঞ্ঝা অপেক্ষা করছে, কে জানে? এই সময়টা এইসব অনুভূতি, কষ্ট, কান্নাকে প্রশ্রয় দেয়ার সময় নয়। তাকে বড় হতে হবে, অনেক বড়। কত কত দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু এতকিছু ভেবেও অয়ন মুহূর্তের জন্যও নিজেকে স্থির করতে পারল না। এ ক'দিনের প্রাণান্ত চেষ্টায় নিজেক যতটুকু স্থির করতে পেরেছিল অয়ন, আজ এই মুহূর্তটুকু কী অবলীলায়ই না তাকে তার চেয়ে শতগুণ এলোমেলো করে দিলো। চোখের মতো শান্ত নদী যেমন হঠাৎ ঝড়ে উন্মাতাল হয়ে ওঠে, ঠিক তেমন।

অয়ন বলল, হুম, করে।

কাকে? আমায় বলবি?

বলব।

বল?

এখন না। যেদিন দেখা হবে, তুই যেদিন বলবি, সেদিন।

নুহা হাসলো, আমি বললে তারপর বলবি, তাই না?

অয়নও হাসলো, তুই তাড়াতাড়ি চলে আয় নুহা।

কেন? আমায় মিস করিস?

নাহ্, আমি আমাকেই মিস করি।

কী কথা! নিজেকে কি কেউ মিস করে?

হ্যাঁ করে।

কীভাবে?

যখন কোনো কারণে নিজেকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হয় সে অন্য কারো কাছে রয়ে গেছে।

তুই নিজেকে খুঁজে পাচ্ছিস না?

অয়ন কথা বলল না। নুহাই আবার বলল, দেখিস, আবার পুরোপুরি নিখোঁজ হয়ে যাস না, একবার হারিয়ে গেলে খুঁজে পাওয়া কিন্তু খুব কঠিন।

এইজন্যই হারিয়ে যেতে দিতে নেই, সেদিন একটা কবিতার লাইন পড়লাম, কোথায় যাবে, তোমার মানুষ রেখে? মানুষ কেন হারিয়ে গেলে শেষে, মানুষ পাওয়া শেখে?

বাহ্, সুন্দর তো!

অয়ন হাসলো, হ্যাঁ সুন্দর। হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা নিজের মানুষটাকে চিনতে পারি না।

নুহার কী যেন হলো, সে ভীষণ আনমনা হয়ে গেল। তারপর বলল, আজ রাখি অয়ন। এসেই দেখা হচ্ছে।

.

শুক্রবার অনুর অফিস নেই। আকাশ কিছুটা মেঘলা। সে মেঘলা দুপুরে অয়নকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছে বোটানিক্যাল গার্ডেনে। ঢুকতেই হাতের ডান দিকে স্বচ্ছ জলের লেক। ফুরফুরে হাওয়া বইছে, সেই হাওয়ায় লেকের জলে মৃদু অথচ শরীর ঝলমল করা ঢেউ। অয়ন মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জলের উপর ঝুলে থাকা গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের দিকে, এই ফুলের নাম কী আপু?

হিজল।

হিজল?

হু, হিজল। সুন্দর না নামটা?

হ্যাঁ, সুন্দর। কিন্তু...।

কিন্তু কী?

খেয়াল করেছিস, নামের মধ্যেও জল আছে? হিজল।

অনু কিছুক্ষণ চুপ করে হিজল ফুলের গাছের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, জলের কাছে থাকে বলেই হয়তো এই নাম।

অয়ন হাসলো, ফুলটা কিন্তু সুন্দর, তাই না আপু?

হ্যাঁ, আমার সবচেয়ে প্রিয় ফুল।

এই ফুল তোর প্রিয় কেন আপু? এই ফুল তো সচরাচর দেখাও যায় না। তাছাড়া সবার তো অন্য সব ফুল প্রিয় হয়। গোলাপ, রজনীগন্ধা এইসব।

তা তো জানি না, তোর কী ফুল প্রিয়?

অয়ন খানিক্ষণ ভাবলো। তারপর বলল, এটা তো কখনো ভাবিনি আপু?

তার মানে তোর কোনো প্রিয় ফুল নেই?

আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু আলাদা করে কখনো তো ভাবিনি।

এই বিষয়টি অনুর মনে গেঁথে রইল। এমনকি হয় না যে-কোনো কোনো মানুষ আমাদের খুব প্রিয়। খুব আলগোছে, অগোচরে সে আমাদের বুকের ভেতর গেঁথে রয়। কিন্তু আমরা কখনোই তাকে টের পাই না। বুঝতে পারি না। হয় এমন? তার নিজেরও কী এমন কেউ রয়েছে?

অনুর আগে মাঝেমধ্যে মাহফুজের কথা মনে পড়ত। কিন্তু আজকাল বহুদিন আর মনে পড়ে না। না-কি পড়ে, কিন্তু সে টের পায় না বা ইচ্ছে করেই পেতে চায় না? মাহফুজের সাথে তার কলেজে পরিচয়। অয়নের মতোই অনুর সামনেও তখন এইচএসসি পরীক্ষা। মাহফুজ তার বান্ধবী লতার ভাই। সে। তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। প্রায়ই কলেজ শেষে লতাকে নিতে আসতো সে। দেখতে তেমন সুদর্শন না হলেও কী সুন্দর করে যে হাসতো মাহফুজ! কথায় কথায় বাচ্চাদের মতো হেসে গড়িয়ে পড়ত। সেই মাহফুজের সাথে নিজের অজান্তেই একটা সম্পর্ক হয়ে গেল অনুর। কী নাম সেই সম্পর্কের? ভালোবাসা? প্রেম? বন্ধুত্ব? না-কি অন্য কিছু?

মাহফুজের সাথে অনুর সম্পর্কটা আসলেই অদ্ভুত! অনু সেই তখন থেকেই জানতো, তার জীবনটা আর আট দশটা সাধারণ মেয়ের মতো নয়। তার মাথার ওপর পাহাড় সমান বোঝা। তাকে কোনো ভুল করলে চলবে না। ওই বয়সের যে তরল আবেগ, তাতে ভেসে গেলে চলবে না। সে তাই নিজের পায়ের তলায় যেন একখানা ভারি পাথর রেখে তাতে শক্ত করে নিজেকে বেঁধে রেখেছিল। যেন সে ভুল করেও কখনো উড়ে যেতে গেলে, বা ভেসে যেতে গেলে ওই পাথরে টান লেগে আবার ফিরে আসতে পারে।

মাহফুজ একদিন অনুকে বলল, লতার সাথে তোমার পার্থক্য কী জানো?

অনু বলেছিল, হুম, জানি।

মাহফুজ কিছুটা অবাক হয়ে বলেছিল, কী?

লতা চুল খুলে রাখে আর আমি বেঁধে।

মাহফুজ হেসে ফেলল, এটা কিছু হলো?

কেন হবে না? আপনিই তো পার্থক্যের কথা বললেন। এটা কি পার্থক্য নয়?

নিশ্চয়ই পার্থক্য। কিন্তু আমি এই পার্থক্যের কথা বলিনি। আরো গুরুতর কোনো পার্থক্যের কথা বলছিলাম।

আপনার ধারণা, এটা কোনো গুরুতর পার্থক্য নয়?

এটা গুরুতর পার্থক্য হলো কী করে?

অনু হাসলো, জবাব দিলো না। মাহফুজ বলল, বলবে না?

আজ না, অন্য কোনো দিন।

আচ্ছা, তাহলে আমি কী পার্থক্যের কথা বলেছি, সেটা শুনবে?

কী?

লতা আমার বোন, তুমি নও।

সে তো আরো কত মেয়েই আপনার বোন নয়।

কিন্তু সেই সব মেয়েদের বোন ভাবতে তো আমার কষ্ট হয় না।

আমাকে বোন ভাবতে কষ্ট হয়?

হুম, হয়।

তাহলে আর কি, খালাটালা কিছু একটা ভেবে ফেলেন।

অনু হাসলো। মাহফুজ চুপ করে রইল। অনু বলল, ভেতরে ভেতরে আমি মা-খালা টাইপই বুঝছেন? আমার কথা শুনে মনে হয় না, এই বয়সের কোনো মেয়ে এমন বড়দের মতো আঁতেল আঁতেল কথা বলে?

আমার তাতে সমস্যা নেই।

অনুর সাথে সেদিন আর কথা এগোয়নি মাহফুজের। তবে তাদের প্রায় রোজই দেখা হতো কলেজ শেষে। মাঝেমধ্যে লতা না আসলেও মাহফুজ ঠিক আসতো। সেদিন মাহফুজের সাথে খানিক হাঁটতে, রাস্তার পাশে বসে গল্প করতে অনুর বেশ লাগত!

অনুর সাহসও যেন একটু একটু বাড়ছিল। হয়তো ওই বয়সটাই এমন। সকল কিছু জেনে বুঝেও কী এক অমোঘ মোহে ভুল করাতেই আনন্দ! প্রবল ভয়, সংশয়, দ্বিধার মধ্যেও কোথায় যেন একটা চাপা আনন্দ, উত্তেজনা। অনেকটা নেশার মতো। এই নেশা কাটানোর কোনো উপায় ওই বয়সটার জানা নেই। এক মন কেমন করা বিকেলে টিউশন থেকে বের হয়ে অনু দেখলো মাহফুজ দাঁড়িয়ে আছে সামনে। তার হাতে হিজল ফুলের

মালা। অনুর সেদিন কী যে লজ্জা লাগছিল! মাহফুজ জোর করেই তাকে রিকশায় তুললো। তারপর বলল, ফুলটা খোঁপায় বাঁধবে?

অনু বলল, না।

কেন?

আমার এসব ভালো লাগে না।

ভালো লাগে না কেন? তোমার মাথাভর্তি চুল। কত বড় একটা খোঁপা, এমন কারো আছে?

নেই?

না, নেই।

আছে, কিন্তু আপনি দেখতে পান না।

দেখতে চাইও না। আচ্ছা, তুমি কিন্তু আমাকে এখনো বলেনি।

কী?

ওই যে সেই চুল বেঁধে রাখা আর ভোলা রাখার পার্থক্যটা?

অনু জবাব দেয়নি। মাহফুজ হঠাৎ হাত বাড়িয়ে অনুর খোঁপা খুলে দিলো। তারা তখন মিরপুর বেড়িবাঁধের ওপর হুডতোলা রিকশায়। থইথই জলের বুকের ভেতর থেকে ভেসে আসা হুহু করা হাওয়ায় অনুর চুল উড়ছিল। মাহফুজ সেই চুলের ভেতর নাক ডুবিয়ে যেন শুষে নিতে থাকল জনম জনমের সুবাস। অনুর নিজেকে মনে হচ্ছিল পলকা তুলোর মতো, শুভ্র মেঘের মতো, যেন সেও ভেসে যাচ্ছে ঠিকানাবিহীন। এই ভেসে যাওয়া রোধ করার সাধ্য তার নেই। এ এক অপ্রতিরোধ্য, অবশ্যম্ভাবী যাত্রা। মাহফুজ একহাতে তাকে আগলে রাখল। অনুর মনে হচ্ছিল এই মুহূর্তটুকু কখনোই শেষ না হোক। এ এক অন্তহীন অনুভূতি হয়ে বেঁচে থাক।

সেই রাতটা খুব অস্থিরতায় কাটলো অনুর। তার পরের কয়েকটা দিনও। বুকের ভেতর এক বেপরোয়া পাখির অবিরাম ডানা ঝাঁপটানোর শব্দ। সেই শব্দ দ্বিধার, সংকোচের, অনিশ্চয়তার, ভয়ের আবার একই সাথে তীব্র ভালো লাগারও। কী করবে সে?

অনু নিজের সাথে বোঝাঁপড়ার জন্য সময় নিলো। মাহফুজের সাথে যোগাযোগটাও কমিয়ে দিলো অনেকটা। অবশ্য সামনে এইচএসসি পরীক্ষার অজুহাতটা তার যুক্তিসঙ্গতই ছিল! ফলে দীর্ঘ যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা। পরীক্ষাও শেষ হয়ে গেল। মাহফুজের ততদিনে চাতকপ্রায় অহর্নিশি অবস্থা। সেই সময়টাতে কী মাহফুজের জন্য অনুর কষ্ট

হয়নি? একটুও না? অনু জানতো, সে তার ওই সময়কার অনুভূতির কথা কাউকে বলতে পারবে না, বোঝাতে পারবে না। মাহফুজকে তো নয়ই। মাহফুজের ধারণা, কষ্টটা কেবল তার একার হয়েছে। যেহেতু দূরত্বের সীমানাটা বেঁধে দিয়েছিল অনুই। কিন্তু সে কী কখনোই জানতো যে, রোজ রাতে একা একা কাঁদত অনু! কতবার যে সবকিছু ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে মাহফুজের বুকের ভেতর গিয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়তে ইচ্ছে হয়েছে তার! কিন্তু অনু কী তা পারে? পারে না। তার চারপাশ জুড়ে অজস্র অদৃশ্য শৃঙ্খল। সে চাইলেই সেসব শৃঙ্খল রেখে পালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু জগতে সকলেই যদি পালাতে চায়, তবে রুখে দাঁড়াবে কে?

মাহফুজের মায়ের আচমকা ক্যান্সার ধরা পড়লো। ততদিনে মাস্টার্স শেষ হয়ে গেল মাহফুজের। ভালো চাকরিও পেয়ে গেল সে। এই সময়ে শুরু হলো তার বিয়ের জন্য তোড়জোড়। মেয়ে দেখা শুরু হয়ে গেল। অনুর তখন প্রবল জীবন যুদ্ধের সময়। স্কুলপড়ুয়া ছোট কিশোরী দুই বোন, ছোট ভাই, মা। তার ওপর নিজের পড়াশোনা। এ যেন এক হালহীন, পালহীন ডিঙ্গি নৌকায় অসীম, অথৈ সমুদ্রে অনিশ্চিত যাত্রা। মাহফুজ বিয়ের কথা বলতেই অনু দিশেহারা বোধ করতে লাগল। সে জানে তার কাছে কোনো উত্তরই নেই। না কিংবা হা, কোনোটাই না। কিন্তু একটা উত্তর তো তাকে দিতেই হবে! অনু অবশ্য ততদিনে বুঝে গিয়েছিল, খুব স্বাভাবিক একটা বিয়ে তার জন্য কঠিন। এর আগেও যে তার জন্য বিয়ের সম্বন্ধ আসেনি তা নয়। কিন্তু শেষ অব্দি কেউই আর শ্বশুরবাড়ির বোঝা বয়ে বেড়ানোর দায়িত্ব নিতে চায় না। শ্বশুরবাড়ি থেকে যৌতুক, আর্থিক সুবিধা, ঘর গোছানোর বায়না, বউয়ের গয়না কিংবা নিদেনপক্ষে উপহারস্বরূপ বড় কিছুর চাহিদা না হয় মহত্ত্ব বা উদারতা দেখিয়ে ছেড়ে দেয়া যায়। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির দায় বয়ে নেয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এটি যেমন সম্মানজনক কিছু নয়, তেমনি লাভজনক কিছুও না।

মাহফুজ সব শুনে বলেছিল, আমি মা-বাবাকে রাজি করাবো।

অনু জানতো, তাকে মেনে নেয়া হয়তো সম্ভব। কিন্তু তার পরিবার, এতগুলো ভাই-বোনের দায়-দায়িত্ব কেউ মেনে নেবে না। সে ম্লান হেসে বলেছিল, শুধু শুধু চাপ নিও না।

তুমি দেখো, আমি রাজি করিয়েই ফেলব। মাহফুজ একগুঁয়ের মতো বলল।

অনু শান্ত গলায় বলল, তুমি না হয় রাজি করাবে। কিন্তু তোমাকে কে রাজি করাবে?

অনুর কথায় মাহফুজ থমকে যাওয়া গলায় বলল, মানে?

মানে আজ এই মুহূর্তে তোমার মনে হচ্ছে, তুমি আমার জন্য সবকিছু করতে পারো। কিন্তু এই মনে হওয়াটা তোমার বেশিদিন থাকবে না।

তুমি জানো না অনু, থাকবে। অবশ্যই থাকবে।

অনু আগের চেয়েও শান্ত গলায়, ঠোঁটে মৃদু হাসি ঝুলিয়ে রেখে বলল, থাকবে না। আমি জানি।

মাহফুজ অনুকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলো। কাঁদলোও হাউমাউ করে। কিন্তু অনুকে টলানো গেল না। সন্ধ্যার ম্লান হয়ে আসা আলোয় অনু আলতো করে হাত রাখলো মাহফুজের গালে। তারপর বলল, এই যে আমার জন্য এমন করে কাঁদছ। এই যে আমাকে এমন করে চাইছ। আমি চাই এই কান্নাটা সারা জীবন থাকুক, এই চাওয়াটাও।

মাহফুজ ভেজা চোখ মেলে তাকালো। সে বিভ্রান্ত বোধ করছে। অনু বলল, পেয়ে গেলে চাওয়াটা আর থাকে না। কে জানে, হয়তো পাওয়াটাও না। আমার কী মনে হয় জানো?

কী?

পুরোপুরি পেয়ে যাওয়া মানে পুরোপুরি হারিয়ে ফেলা।

মাহফুজ আর কোনো কথা বলল না। চুপচাপ অনুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

অনু বলল, এই যে তোমাকে এত পেতে ইচ্ছে করে, এর চেয়ে তীব্র কিছু আর নেই এ জগতে। কিন্তু জানো কি, পেয়ে যাওয়ার পর পেতে চাওয়ার এই তীব্র ইচ্ছাটা আর থাকে না। তোমারও থাকবে না। আজকের এই মুহূর্তটাকে তখন মনে হবে জীবনের সবচেয়ে যুক্তিহীন, সবচেয়ে ভুল একটি মুহূর্ত। এই তীব্র চাওয়ার অনুভূতিগুলো তখন ধীরে ধীরে মরে যেতে থাকবে। মরে যেতে যেতে একসময় পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে যাবে। তখন সবকিছু কেবল অভ্যাস হয়ে থাকে, অনুভূতি না।

অনু একটু থামলো। তারপর আবার বলল, আমি চাই না তুমি আমার অভ্যাস হয়ে যাও, আমি চাই তুমি আমার অনুভূতি হয়েই থাকো।

তখন সূর্যের শেষ আভাটুকুও মিলিয়ে যাচ্ছিল দিগন্তে। সেই আভাটুকুর দিকে তাকিয়ে অনুর যেন মনে হলো সে তার বুকের বা দিকটার ভার বহন করতে পারছে না।

আচ্ছা, মাহফুজ কি সত্যি সত্যিই রয়ে গেছে? কিন্তু অনুর তো মাহফুজকে মনে পড়ে না। অথচ সে-ই তো বলেছিল, যা পাওয়া হয় না, বরং তা-ই চিরকাল রয়ে যায়। মাহফুজকে তো তার পাওয়া হয়নি। কিন্তু সে কী আসলেই কোথাও রয়ে গেছে? না-কি যাবজ্জীবন নির্বাসন হয়ে গেছে হৃদয়ের? এই যে কত কত মানুষ চেনা হয় না, জানা হয় না, তাতে তো হৃদয়ের কোনো দোষ হয় না। কিন্তু কোনো একজনকে ভুলে থাকলে, না চিনলে যাবজ্জীবন নির্বাসন হয়ে যায় হৃদয়ের, কী অদ্ভুত!

অনু অয়নের হাত ধরে দীর্ঘসময় হাঁটলো। অবাক ব্যাপার হচ্ছে, অয়নের অসুখ, তার নিজের জীবন, চারপাশের অসংখ্য সংকট, সব ছাপিয়েও এই পুরোটা সময় অনুর মাথায় গেঁথে রইল ওই এক প্রশ্নই। মাহফুজ কি তাহলে সত্যি সত্যিই কোথাও রয়ে গেছে, তার

বুকের ভেতর? অবচেতনে, অজান্তে, অভিমানে? অয়নের বুঝতে না পারা প্রিয় কোনো ফুলের মতো, প্রিয় কোনো স্পর্শ বা অনুভূতির মতো? কে জানে, হয়তো কোনো তুমুল মন খারাপের দিনে, দুঃসহ মুহূর্তে সে প্রগাঢ় মমতায় চোখের পাতায়, বুকের ভেতর অনুভূতির, স্মৃতির আলতো স্পর্শ রেখে ফিসফিস করে বলে যাবে, আমি আছি, আমি আছি। তুমি একা নও।

*

দুপুর পড়ে যেতে বোটানিকাল গার্ডেন থেকে বের হয়ে এলো অনু আর অয়ন। অয়ন বলল, এখন কি করবি আপু?

বাসায় চলে যাবি?

তোর ইচ্ছা।

আমার ইচ্ছা কেন? আমি তো তোর জন্যই ঘুরতে এলাম।

ইশ! আমি কি বলেছি না-কি যে আমার বোটানিকাল গার্ডেন যেতে খুব ইচ্ছে করছে?

না, তা বলিসনি। কিন্তু আমার কেন যেন মনে হলো, তোর ভালো লাগবে।

এটা ভালো লাগার মতো কোনো জায়গা হলো?

কি জানি! আমার তো খুব ভালো লাগল।

সত্যি কথা কী জানিস? আসার আগে আমার মনে হয়নি যে ভালো লাগবে। কিন্তু আসার পর ভালো লেগে গেছে।

সত্যি সত্যি বলছিস তো? না-কি আমাকে খুশি করার জন্য বলছিস?

তোকে খুশি করে আমার কি লাভ?

তাও একটা কথা।

অনু আর অয়ন কিছুক্ষণ পার্কের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। অনু ভেবে পাচ্ছে না সে এখন কী করবে! অয়নকে একদম সময় দিতে পারছে না সে। অথচ সে খুব করে চাইছে, আরো কিছুটা বেশি সময় অয়নের কাছে কাছে থাকতে। যতটা সম্ভব আরো কিছুটা আনন্দময় সময় তাকে উপহার দিতে, কিন্তু পারছে কই?

একটা বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, অয়নের পরিণতিটা যেন সবাই কোনো না কোনোভাবে মেনেই নিয়েছে। না নিয়ে উপায়ও বা কী? জগতে জন্ম আর মৃত্যুর চেয়ে বড় অসহায়ত্ব আর মানুষের কী আছে! তবে মানুষের অভিযোজন ক্ষমতা আসলেই বিস্ময়কর। যে-

কোনো পরিস্থিতিতেই সে শেষ অব্দি খাপ খাইয়ে নেয়। কত সহজে মানুষ তার প্রিয়তম মানুষের মৃত্যুকে মেনে নেয়। দিন কয়েকের কান্না, মন খারাপ, কষ্ট ভুলে আবার রোজকার কাজ, আড্ডা, নতুন নতুন স্বপ্নে ডুবে যায় সে। আসলে এমন না হলে মানুষ বেঁচে থাকতেও পারত না। মানুষের বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড় শক্তি কী তাহলে মৃত্যু কিংবা স্মৃতি ভুলে থাকার ক্ষমতা?

.

অয়নকে নিয়ে বাড়িতে আজকাল খুব একটা কথাবার্তাও হয় না কারো মধ্যে। কিন্তু সবাইই জানে, তাদের সকলের মাথার ভেতর, বুকের ভেতর ক্রমাগত বয়ে যাচ্ছে তীব্র যন্ত্রণার সকরুণ এক নদী। সেই নদীর ঢেউয়ের শব্দ, পাড় ভাঙার শব্দ তারা যতটা পারছে পরস্পরের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখছে। আর ঠোঁটে ঠোঁট চেপে নিজেদের প্রস্তুত করে চলেছে এক অনিবার্য অসহায়ত্ব মেনে নিতে।

অনু হঠাৎ বলল, একটা কাজ করলে কেমন হয় অয়ন?

কি কাজ?

চল, আমরা ভালো কোথাও খেতে যাই।

কোথায়?

ধর সেদিনকার মতো কোনো ছাদখোলা রেস্টুরেন্টে?

আবার যদি বৃষ্টি নামে?

ধুর বোকা, রোজ রোজ বৃষ্টি হয় না-কি?

তাও ঠিক, আচ্ছা চল।

আরেকটা কাজ করলে কেমন হয়?

অয়ন এবার আর প্রশ্ন করলো না। সে মাথা তুলে তাকালো। অনু ঝলমলে মুখে বলল, ধর, নুহাকে একটা সারপ্রাইজ দিলে কেমন হয়?

নুহাকে? অয়ন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে গিয়েও সতর্ক হয়ে গেল। বড়পু কি তাকে নিয়ে আবারও কোনো মজা করবে?

হুম, ধর নুহার বাসার সামনে গিয়ে তুই ওকে ফোন দিলি। তারপর আমরা তিনজন মিলে খেতে চলে গেলাম।

অয়ন বেশ কিছুক্ষণ অনুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে বোঝার চেষ্টা করছে অনুর উদ্দেশ্য। কিন্তু তেমন কিছুই না পেয়ে আরো বিভ্রান্ত হয়ে গেল যেন। অনু বলল, আইডিয়াটা কেমন?

অয়ন বলল, নুহা ঢাকায় নেই আপু।

কই গেছে?

ওর নানু বাড়ি।

নানু বাড়ি কই?

কুমিল্লা।

চল, ওর নানুবাড়ির ঠিকানা বের করে চলে যাই।

অয়ন হাসলো। অনু রিকশা নিলো। রিকশায় উঠতে উঠতে অয়নের হঠাৎ মনে হলো, অনু আপু যা করছে তা কি স্বাভাবিক? সে কি আগেও তার সাথে এমন করতো? না-কি বড়'পু আলাদা করেই তার মন ভালো করতে চাইছে? কিন্তু তার মন তো খারাপ না, আর খারাপ হলেই কি? এসব খেয়াল করার সময় কী বড়পুর আছে? আগে তো কখনো ছিল না। এইসব নানা কিছু অয়নের বুকের ভেতর কোথায় যেন অস্বস্তির কাঁটা হয়ে খোঁচাতে লাগল।

অয়ন বলল, রেগে যাবি না তো আপু, একটা কথা জিজ্ঞেস করতাম?

রাগবো কেন, বল?

আমার কি হয়েছে বলবি?

তোর আবার কি হবে?

তুই আমার কাছে লুকাস না আপু, আমি কিন্তু জানি।

অনু চট করে অয়নের মুখের দিকে মুখ ফেরালো, তুই কি জানিস?

বড় চাচি বলেছিল, আমার কী বড় অসুখ না-কি হয়েছে, আর তা নিয়ে মা ফোনে কাঁদছিল।

মায়েদের কাছে সন্তানের সব অসুখই বড় অসুখ অয়ন। আর তুই তো মায়ের আরো বেশি আগ্লাদের। তিন মেয়ের পর একটামাত্র ছেলে। বুঝতেই পারছিস। ছোটবেলায় একবার তোর আঙুল কেটে গেল। এই এতটুকু নখের সমান কাটা। সেই নিয়ে সারা বাড়িতে কী

হুলস্থুল! মা চিৎকার করে রাজ্যের লোক জড় করে ফেলেছিল। মায়ের কান্না শুনে সবাই ভেবেছিল তোর আস্ত হাতখানাই বুঝি কেটে পড়ে গেছে!

তারপর?

তারপর আর কি? তোর সেই ওই সামান্য আঙুল কাটার জন্য তোকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হলো। ডাক্তার তো দেখে হেসেই গড়াগড়ি।

অয়ন খানিক চুপ করে রইল, তারপর কী ভেবে আবার সেই একই কথা বলল, আমার যদি তেমন বড় কোনো অসুখই হয়ে থাকে, তবে সেটা আমাকে বলে দিলেই কি ভালো না আপু? তাহলে ধর চিকিৎসাগুলো কী কী, কখন, কোথায় করাতে হবে, এসবই আমি জানতে পারতাম। কত টাকা লাগবে তাও। সামনে আমার পরীক্ষা। এখন থেকেই যদি বিষয়গুলো আমি স্পষ্ট করে জানতে পারতাম, তাহলে প্রস্তুতির জন্য ভালো হতো। পরীক্ষারও প্রস্তুতি, ট্রিটমেন্টেরও। ধর, ইমার্জেন্সি হলে এখনই টিচারস, ফ্রেন্ডস, সিনিয়রদের ইনফর্ম করা দরকার তাই না? পরীক্ষা আরো কাছে চলে এলে কিন্তু ফান্ড কালেকশন নিয়েও ঝামেলা হবে আপু।

তেমন কিছু হলে তো আমিই বলতাম।

সে জন্যই আমার অবাক লাগছে, তোরা কেউই আমাকে কিছু বলিস না। কেমন একটা লুকিয়ে রাখার মতো ব্যাপার। কিন্তু আমি তো কিছুটা হলেও বুঝতে পারি।

কি বুঝতে পারিস?

এই যে, আমার কোনো একটা সমস্যা হয়েছে। কিন্তু তোরা কেউই তা আমাকে জানাতে চাস না।

আর কী কী বুঝিস?

আর কী কী বুঝি মানে?

তোকে যে আমরা সবাই পাগলের মতো ভালোবাসি এটা বুঝিস?

অয়ন এই কথার জবাব দিলো না, চুপ করে রইল। অনুর ইচ্ছে করছিল দু'হাতে অয়নকে বুকের সাথে চেপে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে। তার বুকের ভেতর মেঘ জমে জমে কালো অন্ধকার হয়ে যাওয়া যে আকাশ মুখ ভার করে বৃষ্টির অপেক্ষায় আছে, সেই আকাশটাকে ভাসিয়ে দিতে। অনু অবশ্য তার কিছুই করলো না। সে বসে রইল চুপচাপ। তারপর কিছুক্ষণ আগের ইচ্ছেটা তার আচমকা মরে গেল। সে রিকশাওয়ালাকে ডেকে রিকশা ঘুরিয়ে নিতে বলল। আজ আর তার অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। তার চেয়ে বরং সে বাসায় গিয়ে অয়নকে পাশে নিয়ে খানিক বসে থাকবে।

.

বাসায় ঢোকার গলিটার কিছু আগে শামীমের সাথে দেখা হয়ে গেল অনুর। শামীমের কাঁধে একটা কাপড়ের ঝোলা। সিরিয়াস টাইপ কবি-সাহিত্যিকরা এই ধরনের ঝোলা কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। অনুকে দেখে সে রিকশার সামনে এসে দাঁড়ালো। অনু রিকশা থেকে নামতেই সালাম দিয়ে বলল, ভাগ্য ভালো, আপনার সাথে দেখা হয়ে গেল আপু।

অনু বলল, ভাগ্য ভালোর কী হলো শামীম? আমরা তো একই বাসায়ই থাকি!

না মানে আপনি এত ব্যস্ত থাকেন যে বাসায় তো দেখাই হয় না। আমি যখন থাকি, তখন আপনি থাকেন না। আপনি যখন থাকেন, তখন আমি থাকি না। একই বাসায় থাকি, অথচ দু'জনের কোনো দেখা-সাক্ষাৎ নেই। একটু যে প্ল্যান পরিকল্পনা করব, নিজের আইডিয়া শেয়ার করব সেই উপায়ও নেই।

বাসায় যাবে এখন?

না আপু। অয়ন বোধহয় বলেছে, একটা বিজনেস প্ল্যান নিয়ে খুব খাটছি। দেখি আল্লাহ যদি এবার মুখের দিকে ফিরে তাকায়।

বইয়ের বিজনেস?

জি আপু।

ভেবে-চিন্তে করছ তো শামীম?

শামীম অসহায় ভঙ্গিতে বলল, কী করব আপু? কম তো ভাবনা-চিন্তা করলাম না! তাছাড়া এর চেয়ে কম পুঁজিতে এর চেয়ে ভালো বিজনেস আর নেই আপু। এখন অন্যদের ব্যবসার অবস্থা বিবেচনায় নিলে হয়তো ভুলই করছি। কিন্তু আপু, আমার মনে হয় ব্যবসাটা আসলে নিজের কাছে।

তাহলে আর কী! তুমি যখন সব বুঝে শুনেই নামছ, তখন আমার আর কী বলার আছে?

শামীম কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বলল, একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার আছে আপু। ওই কথাটার জন্যই আসলে আমি আপনাকে খুঁজছিলাম।

কী কথা শামীম?

না মানে, আপনি তো সবই জানেন। তনু মনে হয় বলেছেও আপনাকে। আমার বলতে খুব লজ্জা করছে আপু। এই লজ্জাতেই এতদিনেও সামনে আসতে পারছি না। কিন্তু অনেক ভেবে দেখলাম, আপনি আমার আপন বোনের মতো। আমার নিজের বড় বোন থাকলে তার কাছে বলতাম না? বোনের কাছে। আবার লজ্জা কী?

অনু বুঝতে পারছে শামীম কী বলবে। এমন সহজ সরল সাদাসিধে চেহারার আড়ালেও যে এমন একটা মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে, তা শামীমকে না দেখলে সে হয়তো বুঝতেই পারত না।

শামীম বলল, বিজনেসটা বলতে গেলে একদম বিনা পুঁজিতেই শুরু করছি আপু। বেশিরভাগ পুঁজি আমার বন্ধুরাই দিবে। তারা বলেছেও যে আমার কিছু না দিলেও হবে। কিন্তু তাও আপু, চোখের লজ্জা বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। ওরা হয়তো কিছুই বলবে না। তাও খুব ছোট হয়ে যাচ্ছি সবার কাছে। নিজে কিছু টাকা দিতে না পারলে নিজের অধিকারটা ঠিক খাটানো যায় না আপু। বুঝতেই পারছেন, আসলে...।

শামীমের কথা শেষ হবার আগেই অনু বলল, এসব আলোচনা রাস্তায় কেন শামীম? বাসায় চলো, বাসায় বসে কথা বলি?

শামীম লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, আমি খুবই সরি আপু। কিন্তু আপু হয়েছে কী আমাকে এখনই জরুরি একটা কাজে বেরুতে হবে। আর কখন ফিরব জানি না। তাই অভদ্রের মতো রাস্তায় দাঁড়িয়েই এইসব বললাম।

অনু বলল, না না ঠিক আছে। তুমি তাহলে কাজ সেরে আসো? পরে বাসায় বসে কথা বলি?

শামীম একান্ত বাধ্যগত কিশোরের মতো মাথা নেড়ে সায় দিলো। তারপর কিছুটা দূর গিয়ে আবার ফেরত আসলো। তারপর মাথা চুলকে বিগলিত গলায় বলল, কীভাবে যে বলি আপু, আপনার কাছে শ'দুয়েক টাকা হবে?

অনু ব্যাগ খুলে একটা পাঁচ'শ টাকার নোট বের করলো। শামীম টাকাটা নিতে নিতে বলল, অবশ্য অয়ন গিয়ে যদি বাসা থেকে একটু মানিব্যাগটা এনে দিতে পারত, তাহলে আর এটা লাগত না আপু।

অনু বলল, না না, সমস্যা নেই। তুমি যাও।

শামীম চলে যেতে গিয়েও আবার ফিরে তাকালো। তারপর বলল, রাতেই ফেরত দিয়ে দিবো আপু।

.

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে প্রায়। বাসার গেটের কাছে এসে রিকশা থেকে নামতে নামতেই কেমন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হলো অনুর। রিকশার ভাড়া মেটানো, দোতলার সিঁড়ি বেয়ে ওঠা, বাইরের পোশাক ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নেয়া, এই পুরোটা সময় ধরেই সেই অস্বস্তিটা আঁকড়ে ধরে রইল তাকে। অয়নের সাথে অনেক রাত পর্যন্ত এটা-ওটা গল্প করলো অনু। কিন্তু সেই গল্পটা জুড়েও কোথাও যেন অস্বস্তির অনুভূতিটা থেকেই গেল।

ঘুমাতে যাওয়ার আগে আলমারি থেকে অয়নের রিপোর্টগুলো আবার বের করে নেড়েচেড়ে দেখলো অনু। কিন্তু বুঝতে পারল না তেমন কিছুই। তার কেন যেন মনে হলো, এই রিপোর্টগুলোর কোথাও কোনো ভুল আছে। অন্য কোথাও, অন্য কোনো ডাক্তারের কাছে সে আরো একবার নিয়ে যেতে চায় অয়নকে।

সেই রাতে অয়নকে নিয়ে কী সুন্দর একটা স্বপ্ন যে অনু দেখলো! বিশাল একটা মাঠ। মাঠভর্তি অসংখ্য ছোট ছোট শিশু ছুটে বেড়াচ্ছে। তাদের মাথার উপর উড়ে বেড়াচ্ছে হাজার হাজার রঙিন বেলুন। কিছু কিছু বেলুন উড়ে যাচ্ছে অনেক উঁচুতে। কিছু কিছু বেলুন আরো খানিক নিচ দিয়ে। কিছু আবার একদম হাতের নাগালে। রং-বেরঙের বেলুনে ছেয়ে যাওয়া আকাশটিকে স্বপ্নের মতোই লাগছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সেই অসংখ্য শিশুর মধ্যে অয়নও রয়েছে। কোকড়া চুলের ছোট্ট ফুটফুটে অয়ন। সে হঠাৎ খেলা ছেড়ে দৌড়ে অনুর দিকে ছুটে আসলো। তার মুখ ভার। চোখ টলমল করছে জলে। অনু হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাতে অয়নের ফোলা ফোলা গালগুলো চেপে ধরে বলল, কী হয়েছে অয়ন সোনার? মন খারাপ?

অয়ন মুখে জবাব দিলো না। তবে উপর নিচ করে মাথা ঝাঁকালো। তার ঠোঁট জোড়া ফুলে ফুলে উঠছে। অনু অয়নের ঠোঁটের কাছে ঠোঁট নিয়ে ফিসফিস করে বলল, কেউ বকেছে?

ছোট্ট অয়ন আবারো মাথা ঝাঁকালো। এবার বা থেকে ডানে। অনু বলল, তাহলে? মেরেছে কেউ?

অয়ন আবারো ডানে বায়ে মাথা ঝাঁকালো। অনু বলল, তাহলে?

অয়ন কিছুক্ষণ চুপ থেকে মাথা উঁচু করে আকাশের দিকে তাকালো। তারপর আঙুল তুলে দেখালো, তার ঠিক মাথার ওপর, অনেক উঁচুতে বিশাল একটা বেলুন উড়ে যাচ্ছে। অনু অয়নকে বুকের সাথে চেপে ধরে বলল, অয়ন সোনার ওই বেলুনটা চাই?

অয়ন এবার ওপর নিচ মাথা নাড়লো। অনু বলল, অয়ন সোনা ডাকলেই কিন্তু বেলুনটা তার কাছে চলে আসবে। অয়ন কী তাকে ডাকবে?

অয়ন খানিক মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধীরে আকাশের দিকে মুখ তুলে স্পষ্ট আদুরে গলায় ডাকলো, আসো, আসো, আসো।

অয়ন অবাক হয়ে দেখলো বেলুনটা ধীরে ধীরে নেমে আসছে। অনু তাকিয়ে আছে অয়নের মুখের দিকে। অয়নের মুখ আনন্দে ঝলমল করছে। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে পৃথিবীতে বুঝি স্বর্গ নেমে আসছে।

.

অনুর ঘুম ভেঙে গেল খুব ভোরে। এত ভোরে মা ছাড়া সাধারণত আর কেউ ঘুম থেকে ওঠে না। অনু দ্রুত রেডি হয়ে অয়নের রিপোর্টগুলো ব্যাগে ঢোকালো। অফিসের আগে আজ একবার পিজি হাসপাতালে যাবে সে। সেখানে পরিচিত এক বড় আপু আছে। তার সাথে অয়নের বিষয়ে আরো একবার কথা বলতে চায় অনু। তবে এই সময়টায় রাস্তায় যে জ্যাম থাকে, তাতে মোহাম্মদপুর থেকে শাহবাগ হয়ে গুলশানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে নির্ঘাত অফিসে দেরি হয়ে যাবে তার। অনু অবশ্য সব বুঝেশুনেই বের হচ্ছে। যা হয় হবে, আজ আরো একবার অয়নের রিপোর্টগুলো দেখিয়েই নিতে চায় সে।

কাঁধের ব্যাগ আর অয়নের রিপোর্টগুলো নিয়ে ঘর থেকে বের হতেই থমকে গেল অনু। ড্রইংরুমে অয়নের মাথার কাছে বসে আছেন মা। নিচে মেঝেতে জায়নামাজ পাতা। জানালার ফাঁক দিয়ে ভোরের মৃদু আলো আসছে। সেই আলোয় কেমন অন্যরকম একটা দৃশ্য চোখের সামনে। নামাজের সাদা কাপড় পরা সালমা বেগম বিড়বিড় করে দোয়া পড়ে অয়নের মাথায়, বুকে ফুঁ দিয়ে দিচ্ছেন। অয়ন ঘুমিয়ে আছে শান্ত, সমাহিত, নিঃস্পন্দন। অনুর বুকের ভেতরটা আচমকা ধ্বক করে উঠল। অয়নের দিকে ছুটে যেতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলো অনু। অয়ন ঘুমিয়ে আছে, খুব শান্ত ভঙ্গিতে ধীরে অয়নের বুক ওঠানামা করছে। অনু সামান্য দাঁড়িয়ে থেকে আবার হেঁটে মূল দরজায় কাছে গেল। পায়ে জুতা গলিয়ে দরজা খুলতে যাবে, এই সময়ে সালমা। বেগম ডাকলেন, অনু, একটু শোনতো মা।

অনু জুতো পায়েই দু'কদম এগিয়ে মায়ের পাশে এসে দাঁড়ালো। সালমা বেগম টেবিলের উপর থেকে একটা পত্রিকা তুলে নিয়ে অনুর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। অনু চোখেমুখে রাজ্যের প্রশ্নবোধক চিহ্ন ফুটিয়ে পত্রিকাটা নিলো। কিন্তু সে বুঝতে পারল না, এই পত্রিকা দিয়ে সে কী করবে? তাছাড়া এ বাড়িতে পত্রিকাও রাখা হয় না। এত সকালে আজকের পত্রিকাই বা মা কই পেল? পত্রিকা জুড়ে নানান খবর। সেইসব খবরের কোনটি মা তাকে দেখতে বলছে? মাকে জিজ্ঞেস করতে যাবে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে অনু থমকে গেল। তার চোখ আটকে গেছে নিচের দিকের চার আর পাঁচ নম্বর কলামে। সেখানে একটি সংবাদ, সাবেক ছাত্রনেতা জায়েদ মল্লিক খুন।

খবরটা দেখে বুঝতে খানিক সময় লাগল অনুর। সে কেমন একটা ঘোরগ্রস্ত ভঙ্গিতে মায়ের পাশে বসলো। তারপর সময় নিয়ে খবরটা পড়লো, সাবেক ছাত্রনেতা জায়েদ মল্লিকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তার পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, গত মঙ্গলবার থেকেই নিখোঁজ ছিলেন সাবেক এই ছাত্রনেতা। পুলিশের কাছে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল সন্ধ্যায় তার লাশ উদ্ধার করা হয় রায়েরবাজার বদ্ধভূমির পেছনে বসিলার একটি পরিত্যক্ত জলাশয় থেকে। ধারণা করা হচ্ছে, নিখোঁজ হবার দিনই খুন করা হয় তাকে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের ধারণা জায়েদকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু কে বা কারা এই খুনের সাথে যুক্ত থাকতে পারে, সে বিষয়ে পরিবার বা পুলিশের তরফ থেকে সুস্পষ্ট কোনো ধারণা পাওয়া যায়নি। তবে বিরোধীদলের ধারণা

রাজনৈতিকভাবে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়েই বর্তমান সরকারের মদদে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। এই ঘটনার সঠিক তদন্ত এবং বিচারের দাবিতে তারা আগামীকাল ঢাকা শহরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করেছে। যদিও ক্ষমতাসীন দলের তরফে তাদের মুখপাত্র এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন, জায়েদ মল্লিক ইয়াবাসহ নানা ধরনের মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন। ব্যবসায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সংঘাতে সে প্রতিপক্ষের হাতে খুন হয়েছে।

খবরটা পড়া শেষ হলেও অনু উঠল না। সে স্থির, স্তব্ধ বসে রইল। এই ঘটনায় কী তার খুশি হওয়া উচিত? অনুর জীবনের ভয়াবহ নারকীয় এক অভিজ্ঞতার নাম এই জায়েদ মল্লিক। সেক্ষেত্রে জায়েদের এমন মৃত্যুতে তার খুশিই হওয়ার কথা। কিন্তু কেন যেন অনু খুশি হতে পারল না। বরং তার ভয় করছে, তীব্র ভয়। সে সংবাদটা আরো বার দুই পড়লো। তারপর মাকে বলল, এই পত্রিকা তুমি কই পেয়েছ?

শামীম আনলো।

শামীম! ও কখন এসেছে?

এই তো, কিছুক্ষণ আগে। আমি নামাজ শেষ করে কোরআন শরিফ পড়ছিলাম, এই সময়েই কলিংবেল বাজলো।

পত্রিকাটা শামীম তোমাকে দিল?

না, ও দেয়নি। ঘরে ঢুকে হাতের ব্যাগ আর পত্রিকাটা টেবিলের ওপর রেখে জুতা খুলছিল। আমি কী মনে করে নিলাম।

অনু আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। তারপর ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। সালমা বেগম বললেন, আমার খুব ভয় করছে অনু।

অনু কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলো। তারপর সালমা বেগমের মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, ভয় পেয়ো না মা। নতুন করে আমাদের আর ভয়ের কী আছে বলো? অনুর কণ্ঠজুড়ে আড়ষ্টতা।

সালমা বেগম আরো কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই অনু বলল, আমি যাচ্ছি, দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিও। আর পরিচিত কেউ না হলে দরজা খুলো না। অয়নেরও আজ বাইরে যাওয়ার দরকার নেই।

অনু অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে সাবধানে নামলো। কলাপসিবল গেট খুলে সে যখন বাড়ির বাইরে এলো, তখনো রাস্তাটা ভীষণ ফাঁকা। কিছু কাক এখানে সেখানে ছোটাছুটি করছে। কা কা শব্দে চিড়ে দিচ্ছে ভোরের নৈঃশব্দ্য। অনু রাস্তা ধরে সামনে হেঁটে যেতে গিয়েও কেন যেন থেমে দাঁড়ালো। তারপর আচমকা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো দোতলার সেই

জানালাটার দিকে। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, জানালাটা আজ খোলা নেই। বছরের পর বছর অতন্দ্র প্রহরীর মতো সারাক্ষণ খোলা থাকা সেই জানালাটা আজ বন্ধ! অনু স্থির চোখে দীর্ঘসময় জানালাটার দিকে তাকিয়ে রইল। তার মনে হলো, গতকাল সন্ধ্যায় রিকশা থেকে নামার পর থেকে যে তীব্র অস্বস্তিকর অনুভূতিটা তার হচ্ছিল, আজ ঠিক এই মুহূর্তে সেই অস্বস্তিকর অনুভূতির কারণটা সে স্পষ্ট ধরতে পেরেছে। সম্ভবত শেষ কয়েকদিন ধরে জানালাটা এমন বন্ধই ছিল। কিন্তু কোনো কারণে অনু তা খেয়াল করেনি। অবশ্য পারতপক্ষে কখনো ওই জানালাটার দিকে তাকায়ও না অনু। তবে গতকাল সন্ধ্যায় বাড়িতে ঢোকার মুখে এই হঠাৎ বন্ধ জানালাটার কারণে অবচেতনেই হয়তো একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি নিজের ভেতরে বয়ে বেড়াচ্ছিল অনু। অনু আরো কিছুটা সময় সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল, সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে ওই জানালাটার ওপাশে এই মুহূর্তে আর কেউ দাঁড়িয়ে নেই। কোনো লাল টকটকে চোখ কিংবা সিগারেটের ধোঁয়াও নেই। জানালাটা শূন্য। কিন্তু তারপরও সেই শূন্য জানালাটা দেখেই অনুর ঘাড়ের কাছটা কেমন শিরশির করে উঠল।

*

কয়েকটা দিন অয়নকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হলো অনুর। আরো একদফা ডাক্তার দেখানো হলো তাকে। এবার দেখলেন পিজির হেমাটোলজি অ্যান্ড ওনকোলজি বিভাগের নামকরা এক ডাক্তার। নতুন করে আবারো একগাদা টেস্ট দিলেন তিনি। কিন্তু তাতে ফলাফলে উনিশ বিশ কিছু হলো না। অনু জানে না কেন, তার মনে এবার সুক্ষ্ম অথচ তীব্র একটা আশার সঞ্চার হয়েছিল। কেন যেন মনে হয়েছিল, কোনো একটা অলৌকিক ঘটনা এবার ঘটবে। হয়তো শেষ কিছুদিনের স্বপ্নগুলোই এর কারণ। প্রায় নিয়মিতই নানারকম স্বপ্ন দেখেছে সে। সেইসব স্বপ্নজুড়ে যেন একটা সুস্পষ্ট শুভ বার্তা থাকত। এসবে যে অনু বিশ্বাস করে, এমন নয়। কিন্তু ভয়াবহ বিপদে কত বড় বড় অবিশ্বাসীকেও যে তুমুল বিশ্বাসী আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে উঠতে দেখেছে অনু, তার হিসাব নেই। অয়নের সেই প্রথম রিপোর্ট থেকেই অনু নিজেকে রোজ কত কিছু বুঝিয়েছে, কত কত ভাবে শক্ত করেছে, কিন্তু তাতে ওই সামান্য কিছু সময়ের জন্যই কেবল নিজেকে স্থির রাখতে পেরেছে সে। তারপর কোনো এক ঝড়ো হাওয়ায় মুহূর্তেই আবার সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে।

পরদিন অয়নের রিপোর্টগুলো নিয়ে অনু যখন বাসায় ফিরল তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত। অয়ন বসেছিল খাটে। তারপাশে বেনু আর মা। অনু ঘরে ঢুকতেই তিনজোড়া চোখ একসাথে অনুর দিকে তাকালো। অনু ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটিয়ে বলল, আজকাল সবাই মিলে খুব গল্প হয়, না?

বেনু আর মা অনুর দিকে মুখ তুলে তাকালো, কিন্তু কথা বলল না কেউ। তবে তাদের চোখভর্তি রাজ্যের জিজ্ঞাসা। অনু অয়নের কাছে এসে কপালে হাত ছুঁইয়ে বলল, কোল্ড

এলার্জিটা ভালোই আছে, বুঝেছিস? এখন থেকে একটু পানি-টানি এড়িয়ে চলিস, দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।

সালমা বেগম কী বুঝলেন কে জানে! তিনি বসা থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, কী বলছিস তুই? কী বলছিস? সত্যি?

অনু মায়ের দিকে ফিরে বলল, মা, বাইরে আজও বৃষ্টি হচ্ছে। দেখেছ, ভিজে কী অবস্থা! তুমি কি আমাকে একটু গরম পানি করে দিতে পারবে? এখুনি গোসল না করে ফেললে আমারও ঠান্ডা বসে যাবে।

অনু কুসুম গরম পানিতে গোসল করলো। তারপর মা আর বোনেদের সাথে লম্বা সময় নিয়ে কথা বলল। শেষ কিছুদিনে এই ঘরে অয়নের পরিস্থিতি কোনো না কোনোভাবে মেনে নিয়ে যে এক ধরনের স্থিতাবস্থা তৈরি হয়েছিল, আজ তা আবার এলোমেলো হয়ে গেল। এই এলোমেলো অবস্থা আড়াল করে রাখবার সর্বোচ্চ চেষ্টাটাই সবাই করলো। কিন্তু সেই চেষ্টাটাই যেন সবচেয়ে প্রকটভাবে সবকিছু প্রকাশ করে দিতে থাকল। রাতে খাবার টেবিলে এসে অনু আবিষ্কার করলো কেউই খেতে আসেনি। সে মা আর বোনদের ডাকলো। কিন্তু কেউই তার ডাকে কোনো সাড়া দিলো না। তনু আর বেনু অন্ধকার ঘরে বালিশে মুখ খুঁজে পড়ে আছে। সালমা বেগম একবার জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজে বসে যাচ্ছেন, আবার পরক্ষণেই জায়নামাজ গুটিয়ে উঠে গিয়ে ভাগ্যকে শাপশাপান্ত করছেন। আবার খানিক বাদেই জায়নামাজে উবু হয়ে বসে কেঁদে কেটে আল্লাহর কাছে তার সন্তানের জীবন ভিক্ষা চাইছেন। খানিক আগে করা আচরণের জন্য করজোড়ে ক্ষমাও চাইছেন।

অনু কিছুক্ষণ মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। সালমা বেগমের তখন পাগলপ্রায় অবস্থা। অনু মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে শান্ত এবং অনুচ্চ গলায় বলল, তুমি কি চাও মা? তুমি কি চাও, অয়ন সব জেনে যাক?

সালমা বেগম জবাব দিলেন না, তবে তার কান্না থামলো। তিনি ধীরে জায়নামাজে লম্বালম্বি হয়ে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার দু'হাতে শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

অনু খাবারের টেবিলে এসে অয়নকে ডাকলো। অয়ন বলল, ক্ষিদে নেই আপু।

অনু বলল, না থাকলেও আমার সাথে একটু খা। আমার ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে।

আর কেউ খাবে না?

এখন না, পরে খাবে।

পরে খাবে কেন?

অনু জবাব দিলো না। সে দু'টো প্লেট ধুয়ে ভাত বাড়লো। অয়ন চেয়ারে বসতে বসতে বলল, মা কাঁদছে, তাই না?

রোজই কাঁদে।

রোজ কাঁদে?

হু, আমি মার সাথে এক ঘরে থাকি, আমি জানি।

কেন কাঁদে?

অনু প্লেটে তরকারি বেড়ে দিতে দিতে বলল, মায়েদের কাঁদার কারণ লাগে না। পান থেকে চুন খসলেই তারা কাঁদে। দেখিস না, তনু যখন তখন কাঁদে।

এই জন্যই তুই কাঁদিস না?

হুম।

সত্যি সত্যিই কাঁদিস না?

না।

অয়ন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। অনু ভাতের প্লেট টেনে নিয়ে ভাত মাখছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে না এই টেবিলে, প্লেটে, খাবারে তার কোনো মনোযোগ আছে। সে ভাত মাখছে আনমনা ভঙ্গিতে। প্রথম নলা ভাত মুখে দিয়েই ঢকঢক করে এক গ্লাস পানি খেয়ে ফেলল অনু। ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে বললেও শেষ পর্যন্ত কিছুই খেতে পারল না সে। ভাতের নলা মুখে দেয়া মাত্র পেট গুলিয়ে বমি চলে আসছিল তার। অয়ন বলল, শরীর খারাপ লাগছে আপু?

অয়নের দিকে তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করলো অনু। কিন্তু পারল না। বেসিনে গিয়ে হড়হড় করে বমি করে দিলো। অয়ন ছুটে গিয়ে দু'হাতে অনুর মাথা চেপে ধরলো। তারপর চিৎকার করে মাকে ডাকলো। সালমা বেগম শুনতে পেলেন। কি-না বোঝা গেল না। তবে অনু মুখ তুলে চোখের ইশারায় অয়নকে ডাকতে নিষেধ করলো। তারপর আঁজলা ভরে মুখে পানি ছিটিয়ে বলল, গ্যাস্ট্রিকটা একদম বসে গেছে, বুঝলি?

তুই খুব অনিয়ম করিস আপু।

অনু কথা বলল না। অয়ন বলল, এত অনিয়ম আর রাত দিন খাটাখাটনি করিস, দেখিস একদিন আমার মতো তুইও একটা বড় অসুখ বাধাবি।

অনু তোয়ালে নিয়ে মুখ মুছতে মুছতে অয়নের খাটে এসে বসলো। তারপর বলল, সবচেয়ে বড় অসুখ কী জানিস?

কী?

এই যে আমি বমি করতেই তুই অমন করে ছুটে গেলি, ওটা।

ওটা অসুখ হবে কেন?

ওটাই আসল অসুখ। এই অসুখ হচ্ছে একজন ভালো না থাকলে তার কারণে অন্যদেরও ভালো না থাকার অসুখ। এই অসুখের নাম কি বলতে পারবি?

অয়ন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। অনু বলল, এই অসুখের নাম মায়া। মানুষ তার খুব কাছের মানুষের জন্য বুকের ভেতর মায়া পুষে রাখে। সেই মায়া খুব কষ্ট দেয় অয়ন। এ অসুখ সবচেয়ে বড় অসুখ, সবচেয়ে কষ্টের অসুখ।

অয়নের হাতে কলম। সে সাদা একটা কাগজে কী সব আঁকিবুকি করছিল। অনু বলল, আমাদের কাছের মানুষেরা খারাপ থাকলে আমরাও ভালো থাকি না। আমাদের নিজেদেরও তখন খুব অসুখী লাগে। অসুখ মানে তো যেখানে সুখ নেই, তাই না? তো এটাও তো অসুখই। অসুখ না?

তুই আজকাল প্রায়ই কেমন জটিল জটিল সব কথা বলিস আপু, আমার শুনতে ভালো লাগে না।

অনু অয়নের আরো কিছুটা কাছে এসে বসলো। তারপর অয়নের হাত থেকে কলমটা নিয়ে অয়নের হাতের তালুতে কিছু একটা লিখতে লিখতে বলল, মানুষ যত বড় হয়, তত জটিল হয়ে যায়। কারণ, বড় হবার সাথে সাথে তাকে জটিল একটা পৃথিবীর মুখোমুখি হতে হয়। আর এই জটিল পৃথিবীর মুখোমুখি হতে হতে সে নিজেও একসময় নিজের অজান্তেই জটিল হয়ে যায়।

অয়ন তাকিয়ে আছে তার হাতের তালুর দিকে। সেখানে গোটা গোটা অক্ষরে অনু লিখে দিয়েছে, অয়ন।

অনু মৃদু হাসলো, ছোটবেলায় এভাবে লিখে দিতাম। তখন নামের সাথে লাল রঙের কলম দিয়ে ফুলও এঁকে দিতে হতো, না দিলে খুব কাঁদতি।

তাহলে এখন যে ফুল এঁকে দিলি না?

এখন তো আর কাঁদিস না, তাছাড়া লাল রঙের কলমও তো নেই।

অয়ন পেনবক্স থেকে একটা লাল রঙের কলম বের করে অনুকে দিলো। অনু বলল, এটা তো জেল পেন, বলপয়েন্ট নেই?

অয়ন বলল, নাহ্, লাল এই একটাই আছে।

অনু খানিক ঝুঁকে অয়নের নামের চারপাশে লালরঙের ফুল এঁকে দিলো। তারপর আরো কী কী সব কথা বলল তারা। তারপর অনু উঠে দাঁড়াতে যেতেই অয়ন হঠাৎ তার হাতের তালুটা অনুর সামনে মেলে ধরলো, দেখ আপু।

অনু তাকালো। লাল জেলপেনে আঁকা ফুলগুলোর লাল রং অয়নের সারা হাতের তালুতে ছড়িয়ে গেছে। ফুলগুলোকে এখন আর আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে না। কেবল কালো বল পয়েন্টের কালিতে লেখা অয়নের নামটা বোঝা যাচ্ছে। আর চারপাশে লেপ্টে থাকা লাল রং দেখে মনে হচ্ছে টকটকে তাজা রক্তের ভেতর অয়নের নামটা লেখা!

অনু আঁতকে ওঠা গলায় বলল, এ কী!

অয়ন ম্লান হেসে বলল, জেলপেনের কালি তো, লেপ্টে গেল।

অনু তার ওড়নার কোণাটা পানিতে ভিজিয়ে অয়নের হাতের লেপ্টে যাওয়া কালিগুলো মুছে দিতে লাগল। কিন্তু মুছতে গিয়ে দেখা গেল, অয়নের নামটাও কেমন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। খুবই তুচ্ছ একটি বিষয়, অথচ অনুর মনটা ভীষণ ভার হয়ে গেল। সে আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ অয়নের পাশে বসে রইল।

গভীর রাতে কিছুর শব্দে ঘুম ভেঙে গেল অনুর। এমনিতেও আজকাল তার ঘুম হয় খুব সামান্য। যেটুকুও হয় তাতে আজেবাজে স্বপ্নই বেশি থাকে। অনু। মুখ তুলে ঘুম জড়ানো গলায় ডাকলো, মা।

অন্ধকারে কোনো জবাব এলো না। অনু বিছানা হাতড়ে দেখলো মা নেই। সে বিছানা থেকে নামলো। তারপর পা টিপে টিপে সন্তর্পণে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। সালমা বেগম অয়নের বিছানার পাশে জায়নামাজ পেতে নামাজ পড়ছেন। রুকু থেকে সেজদাহ, সেজদাহ থেকে মোনাজাত, কী শান্ত এবং গভীর সমর্পণের ভঙ্গি! অনু চুপচাপ আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো, কিন্তু ঘুম আর এলো না। পরপর কয়েকদিন অফিসে দেরি হয়ে গেছে, আজও যদি ঘুমটা ঠিকঠাক না হয়, তাহলে অফিসে খুব ঝামেলায় পড়ে যাবে সে। অনু চোখ বন্ধ করে ঘুমানোর চেষ্টা করলো। খানিকটা তন্দ্রার মতো লেগেও এসেছিল বোধহয়। এই সময় আবার ঘুম ভেঙে গেল তার। কিন্তু চোখ মেলে তাকালো না। সে। চোখ বন্ধ করেই বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো। সেই নিঃশ্বাসের সাথে সাথে মায়াময় এক সুবাসে যেন অবশ হয়ে যেতে চাইল শরীর আর মন। বুকের ভেতর পাখির ভেজা পালকের স্পর্শের মতো ছুঁয়ে দিলো কেউ, এই ঘ্রাণটা যে কী চেনা অনুর! কী যে আপন! কখনো বোঝাতে পারবে না অনু।

মায়ের আঁচলটা তার মুখের উপর এসে পড়েছে। সে চোখ বন্ধ করে সেই আচলের ঘ্রাণ শুষে নিতে থাকল। সালমা বেগম অন্ধকারেই অনুর বুকে মাথায় বার দুই দোয়া পড়ে ফুঁ দিলেন। তারপর সামান্য ঝুঁকে অনুর কপালে আলতো করে ঠোঁট চুঁইয়ে চুমু খেলেন। অনু কোনো এক ব্যাখ্যাহীন উপায়েই যেন টের পেয়ে গেল সালমা বেগমের চোখ, গাল, চিবুক

কান্নার জলে ভেজা। তিনি উঠে দাঁড়াতেই অনু মায়ের আঁচলটা শক্ত করে মুঠোয় ধরে রাখলো। সালমা বেগম ধরা পড়ে যাওয়া অপরাধীর মতো গলায় বললেন, ঘুমাসনি?

অনু অস্পষ্ট গলায় বলল, উঁহু।

খারাপ লাগছে?

হুম।

ভয় লাগছে?

হুম।

সালমা বেগম আবার বসে পড়লেন। তারপর অনুর মাথাটা নিজের কোলের ভেতর টেনে নিয়ে অনুর গালে, কপালে, মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন। অনুর আচমকা মনে হলো, সে আজ থেকে ত্রিশ বা তারও বেশি বছর আগের অনু হয়ে গেছে। এই যে মায়ের স্পর্শ, এই যে আঁচলের ঘ্রাণ, এই যে অদ্ভুত ওম, এসব তার চেনা। খুব খুব চেনা। কিন্তু কতকাল এসব সে ভুলে গিয়েছিল। প্রায় শূন্য চরাচরের প্রবল খরতাপে রুক্ষ্ম হয়ে যাওয়া কোনো এক নিঃসঙ্গ বৃক্ষের মতো তৃষ্ণার্ত হয়ে ছিল তার বুকের ভেতর। অনুর কেন যেন খুব কান্না পাচ্ছিল। কিন্তু সে একটুও কাঁদতে পারছিল না। এই কাঁদতে না পারাটা যে কী ভীষণ কষ্টের, কী যন্ত্রণার!

.

নুহা এলো প্রায় পনেরো দিন বাদে। অয়ন কোনো এক রহস্যময় কারণে নুহার দিকে তাকাতে পারছে না। তার বুক ধুকফুক করছে। নুহা বলল, কেমন ছিলি অয়ন?

হ্যাঁ ভালো। তুই? অয়ন নুহার দিকে তাকালো না। সে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। কী শূন্য ধূসর আকাশ! একটা চিল একা একা উড়ছে। তারা বসে আছে বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের পেছনের বেঞ্চিটাতে। খটখটে নির্জন দুপুর।

তোর জন্য একটা গিফট আছে।

অয়ন মুখ তুলে তাকালো। নুহা তার ব্যাগের ভেতর থেকে সুন্দর একটা প্যাকেট বের করে দিলো। সাথে নীল রঙের পেনবক্স। অয়ন প্যাকেটটা খুললো, একটা চমৎকার নোট বুক। সে নোটবুকটার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল, খুব সুন্দর।

আদিল ভাইয়া দুটা দিয়েছে, একটা তোকে, একটা আমাকে।

আদিল ভাইয়া কে?

বড় খাঁলার ছেলে, সেদিন না তোকে বললাম! খুব হাসায় জানিস?

আমাকে চেনে?

কেন চিনবে না? আমি সবাইকেই তোর কথা বলি।

কী বলিস?

অত কী মনে থাকে? তবে আমাদের সব কথাই বলি। তুই যে একবার ভুলে আমার পিঙ্ক কালারের ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে সারাদিন ঘুরলি, সেটা শুনে বড়খালা হাসতে হাসতে শেষ।

অয়ন হাসলো, নুহাও। একটা বাদামওয়ালা এলো, নুহা কুড়ি টাকার বাদাম কিনলো। তারপর বাদামের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, তোকে বলেছিলাম আমার মন খারাপ, মনে আছে?

আছে।

মজার ব্যপার কি জানিস, এখন আমার মন ভালো।

কেন?

জানি না, তবে আমার ধারণা তোর সাথে থাকলে আমার মন ভালো থাকে। আচ্ছা, তোরও কী এমন হয়?

আমার উল্টোটা হয়।

উল্টোটা?

হুম।

কেন?

জানি না কেন, তবে আজকাল তোর সাথে থাকলে আমার মন খারাপ হয়।

আগে হতো না?

নাহ্।

আর আমার সাথে না থাকলে?

না থাকলে আরো বেশি খারাপ হয়।

কী অদ্ভুত কথা! আমার সাথে থাকলে তোর মন খারাপ হবে কেন?

অয়ন ম্লান হাসলো, জানি না নুহা, মন খারাপ হওয়াটা মনে হয় অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে।

তোর হয়েছে কী বল তো?

সেটা তো তোর বলার কথা।

আগে তোর কী হয়েছে শুনি?

নাহ্। তোর আগে বলার কথা।

নুহা দীর্ঘসময় চুপ করে রইল। তারপর বলল, তোর হাতটা একটু দিবি অয়ন? ধরবো?

নুহা কতবার অয়নের হাত ধরেছে। কিন্তু অয়নের কখনো এমন হয়নি। অয়নের মনে হচ্ছে তার হাত কাঁপছে। নুহা ধরতেই তার হাত জলের মতো মিশে যাবে। সে আর নিজেকে সামলাতে পারবে না। নুহা হাত বাড়িয়ে অয়নের হাত মুঠোয় নিয়ে নিলো। তারপর শক্ত করে চেপে ধরলো। অয়নেরও ইচ্ছে করছে শক্ত করে নুহার হাতটা ধরতে। কিন্তু কেন যেন সে তার হাতে শক্তি পাচ্ছে না। অয়ন চুপচাপ বসে রইল। নুহাও। দীর্ঘ নৈঃশব্দ্যের স্পন্দিত সময়। কী মনে হতেই অয়ন আচমকা নুহার দিকে তাকালো। নুহা কাঁদছে। তার দু'চোখের কোল গড়িয়ে দু'ফোঁটা জল নামছে। অয়ন কিছু একটা বলতে গিয়েও বলতে পারল না। তবে সে তার হাতের মুঠোয় নুহার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরলো। অয়নের বুকের ভেতর একটা সুবাসের নদী তিরতির করে সুবাস আর শিহরণ ছড়িয়ে বয়ে যেতে থাকল। এই যে খটখটে দুপুর, ধূসর আকাশ, ওই যে নিঃসঙ্গ চিল, রোদের ভেতর গাছের ছায়া, এ সকলই কেমন মায়াময় হয়ে উঠল। অয়ন ডাকলো, নুহা?

নুহা চোখ তুলে তাকালো না। তবে ফিসফিসে গলায় বলল, হুম।

কী হয়েছে, আমায় বল?

আমি একটা ভুল করে ফেলেছি অয়ন।

অয়ন কেঁপে ওঠা গলায় বলল, কী ভুল?

এই ভুলের কথা আমি কাউকে বলতে পারব না।

আমাকেও না?

না।

অয়ন আর কিছু বলল না, তবে নুহার হাতের ভেতর তার হাতটা কি খানিক শিথিল হয়ে গেল? নুহা আরো কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর ফিসফিস করেই বলল, আমি অমন মেয়ে নই অয়ন। কিন্তু ভালোবাসলে মানুষ বোধহয় অন্য কেউ হয়ে যায়, আমিও অন্য কেউ হয়ে গিয়েছিলাম।

অয়ন বসে আছে। কুয়াশায় ডুবে থাকা দিগন্ত বিস্তৃত শূন্য মাঠের বুক চিরে হারিয়ে যাওয়া মেঠো পথের মতো কী যেন কী তার বুক চিরে দিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে দূরে। অয়ন তা ধরতে পারছে না। তার ভীষণ ক্লান্ত লাগছে।

নুহা বলল, আদিল ভাইয়া মানুষটাই অমন অয়ন, ভালো না বেসে থাকা যায় না। মুহূর্তেই কেমন ঘোরের মধ্যে নিয়ে যায়। সেই ঘোর থেকে আর বের হওয়া যায় না।

অয়নের কানের পাশ দিয়ে চুলের ভেতর থেকে একটা উষ্ণ ঘামের স্রোত নেমে এলো। মনে হচ্ছে ভেঙে যাওয়া মাটির মূর্তির মতো সেও অজস্র টুকরো হয়ে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। তারপর ক্রমশ মিশে যেতে থাকবে ধুলোয়। নুহার হাতের ভেতর তার হাতখানা অসাড় হয়ে পড়ে রইল। সে বিড়বিড় করে বলল, কতটুকু ভালোবাসিস?

অয়নের কথা কী কান্নার মতো শোনালো? নুহা অবশ্য সেই কান্না শুনতে পেল না। সে বলল, আমি তোকে বোঝাতে পারব না অয়ন। আমার ইচ্ছে হয়, মানুষটাকে নিয়ে আমি দূরে কোথাও চলে যাই। অচেনা অজানা কোথাও।

অয়ন খানিক চুপ করে রইল। নুহা নিঃশব্দে কাঁদছে। অয়ন সঁতসেঁতে গলায় বলল, এমন করে ভালোবাসলে তো চলে যাওয়া যায়ই।

যায় না অয়ন, আমাদের সময়টা খুব ভুল।

মানুষটা তো ভুল নয়।

নাহ্ অয়ন, মানুষটা ভুল নয়। কেবল সময়টাই ভুল।

ভুল কেন?

আদিল ভাইয়া এবার যে দেশে এলো, সেটা আসলে ওর বিয়ের জন্যই। সবকিছু ঠিকঠাক, এনগেজমেন্ট অব্দি হয়ে গেছে। আমি কী করব অয়ন?

নুহা কাঁদছে। অয়নও কাঁদছে। তবে অয়নের কান্নাটা দেখা যাচ্ছে না। অয়নের মাথার ওপর সেই ধূসর আকাশ, গাছের ছায়া, একাকী চিল। কিন্তু অয়ন তার কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তার কেবল মনে হচ্ছে এই খটখটে রোদের দুপুরে একটা গাঢ় কুয়াশার চাদর ধীরে ধীরে নেমে আসছে। সেই চাদরে সে ক্রমশই ঢেকে যাচ্ছে।

.

অনু অফিসে ঢুকতেই হাসান বলল, আপনার ফোন এসেছিল কয়েকবার। আলতাফ সাহেব ডেকেছেন।

জরুরি কিছু?

তা তো বলেননি। তবে পরপর কয়েকবার ফোন দিয়েছেন। হেড অফিস থেকে লোক এসেছে।

অনু বহুদিন পর আলতাফ হোসেনে রুমে ঢুকলো। আলতাফ হোসেনের রুমের সাজসজ্জা কিছুটা বদলেছে। একটি বড় আলমারি এবং বুক শেলফ ছিল ডান দিকের দেয়ালজুড়ে। সে দুটো সরিয়ে সেখানে আলাদা করে মুখোমুখি দুই সেট সোফা বসানো হয়েছে। অনু ঘরে ঢুকেই কিছুটা চমকে গেল। সেই সোফায় আলতাফ হোসেনের সাথে হেড অফিসের দু'জন বড় কর্মকর্তা বসে রয়েছেন। এর মধ্যে মান্নান সাহেব অনুকে চেনেন। অন্যজনকে অনু চিনলেও তিনি অনুকে। চেনেন না। অনু ঘরে ঢুকতেই মান্নান সাহেব হাসিমুখে বললেন, কী খবর অনু?

অনু সালাম দিয়ে বলল, এই তো স্যার, ভালো।

মান্নান সাহেব হাতের ইশারায় ফাঁকা একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, বসুন।

অনু ইতস্তত ভঙ্গিতে চেয়ারটাতে বসলো। মান্নান সাহেব বললেন, আজ বৃহস্পতিবার, আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন?

না স্যার। ভুলে যাব কেন?

আজ সকাল ন'টা থেকে একটা মিটিং ছিল অনু।

অনুর বড়োসড়ো একটা ধাক্কা খাওয়ার মতো অবস্থা হলো। সে কিছু বলতে গিয়েও আবার থমকে গেল। প্রতি মাসের শেষ বৃহস্পতিবার হেড অফিস থেকে বড় কর্তারা আসেন। সেদিন অফিসের প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টেকেই পুরো মাসের আলাদা আলাদা রিপোর্ট দিতে হয়। নানান ধরনের প্রেজেন্টেশন দিতে হয়। বিষয়টি অনু একদমই ভুলে গিয়েছিল। গত কয়েকদিন নতুন করে আবার অয়নের ডাক্তার, টেস্ট, রিপোর্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বিষয়টি তার মাথায়ই ছিল না। তাছাড়া প্রতিবার বিষয়টি সরাসরি আলতাফ হোসেনের তত্ত্বাবধানেই হয়। কিন্তু এবার তার আর আলতাফ হোসেনের মধ্যে যোগাযোগহীনতার কারণেই। হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক এ বিষয়ে আলতাফ হোসেনও তাকে কিছু বলেননি। অনু কি বলবে ভেবে পেল না। মান্নান সাহেব বললেন, আপনি কি রোজই এভাবে লেট করে অফিসে আসেন?

অনু সন্ত্রস্ত গলায় বলায়, না স্যার।

আপনার অ্যাটেন্ডেন্স রিপোর্ট কিন্তু তা-ই বলছে অনু। এ সপ্তাহে প্রায় প্রতিদিনই হয় লেট করে এসেছেন, না হয় আর্লি বেরিয়েছেন, এভাবে অফিস চলে অনু?

অনু বলার জন্য আতিপাতি করে খুঁজেও যুতসই কোনো কারণ বের করতে পারল না। সে যে রোজ অফিসে দেরি করে এসেছে বিষয়টি এমন নয়। কিন্তু সে কথা এখানে বলে

কোনো লাভও নেই। আর অয়নের কথাটা অনু অফিসে জানাতেও চায় না। জানালে হয়তো সবাই কিছুটা সহানুভূতির চোখে তাকে দেখবে। তারপর দিন দুই বাদে আবার যেই সেই। অয়নের বেঁচে থাকার বাদবাকি সময়টাতে অফিস বরং এটাকে তার কাজের ক্ষেত্রে একটা বড় দুর্বলতা হিসেবেই দেখবে। এর আগেও এমন হয়েছে, এডমিনের নায়লা তার বাচ্চা হবার সময় অফিসের নিয়মানুসারেই মাতৃত্বকালীন ছুটি নিয়েছিল। মাঝখানে তার বাচ্চার কিছু গুরুতর জটিলতাও দেখা দিয়েছিল। এই সময়ে অফিস নায়লার পদে অন্য একজনকে খণ্ডকালীন হিসেবে নিয়োগ দিলেও নায়লা ছুটি শেষে ফিরে এসে আর জয়েন করতে পারেনি। অফিস ম্যানেজমেন্ট ধরেই নিয়েছিল যে নায়লার পক্ষে ঘর, সংসার, অসুস্থ বাচ্চা, এই সবকিছু সামলে আর আগের মতো অফিসকে সেবা বা সময় দেয়া সম্ভব হবে না।

অনু এই বাস্তবতাটা জানে। জানে বলেই এই দুর্বলতাটা সে প্রকাশ করতে চায় না। তাছাড়া অয়নকে নিয়ে কারো সহানুভূতি কুড়াতেও ভালো লাগে না অনুর। বিষয়টি যদি এমন হতো যে অয়নের কথা বললে অয়ন সুস্থ হয়ে যেত, তাহলে সম্ভাব্য সকল কিছুই করত সে।

মান্নান সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, এর আগেও আপনাকে নিয়ে নানান সমস্যা হয়েছে অনু। বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ, আপনি আলতাফ ভাইয়ের মতো একজন ভালো বস পেয়েছেন। হি অলয়েজ ডিফেন্ডস ইউ।

অনু মুখ তুলে আলতাফ হোসেনের দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করলো। আলতাফ হোসেন অবশ্য কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। মান্নান সাহেব বললেন, আপনি কতটুকু বোঝেন আমি জানি না, অফিসে আপনার যে রেসপন্সিবিলিটি, সেটা খুব সেনসিটিভ আর ইম্পর্টেন্ট। এখানে আমরা টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট এক্সপেক্ট করি। প্রোপার কনসেন্ট্রেশন আর ডেডিকেশন না থাকলে এটা অফিসের জন্য খুবই ডিফিকাল্ট টু হ্যাঁন্ডেল। কি বলেন আলতাফ সাহেব?

আলতাফ হোসেন মৃদু মাথা নাড়লেন কেবল। মান্নান সাহেব আবারো বললেন, এর আগে আমাদের গাইবান্ধা ফিল্ডের ডাটা নিয়ে ম্যাসিভ ঝামেলা হয়েছিল। আলতাফ সাহেব সবার এগেইনস্টে গিয়ে আপনার জন্য ফাইট দিয়েছিলেন। কিন্তু এটা তো ওনার একার এখতিয়ারও নয় অনু।

অনু মাথা নিচু করে বসে আছে। সে বলার মতো কোনো কথাই খুঁজে পাচ্ছে না। আলতাফ হোসেন অনুচ্চ গলায় বললেন, মান্নান ভাই, আমার মনে হয় এটা ঠিক হয়ে যাবে। আমি তো আছিই। আপনি টেনশন নিয়েন না। তাছাড়া ওনার ছোট ভাইটা অসুস্থও। এইজন্যই একটু ঝামেলা হচ্ছে। বাট এটা থাকবে না।

সবারই কম বেশি সমস্যা থাকে আলতাফ সাহেব। এখন ফ্যামিলি বা পারসোনাল লাইফ যদি প্রফেশনাল লাইফ হ্যাঁম্পার করে, তাহলে সেটা তো সমস্যাই। ওয়েল, যদি বাসায় কোনো সমস্যা থাকে, উনি ছুটি নিতে পারেন অফিস থেকে। সমস্যা কাটালে না হয় আবার অফিস শুরু করবেন। তাছাড়া এটা তো আর আনন্দ বা বিনোদনের কাজও নয়। প্রচণ্ড প্রেসারের কাজ। মাঝেমধ্যে প্রেসারের কাজে রিলিফ বা রিক্রিয়েশনেরও দরকার হয়।

আলতাফ হোসেন অনুর দিকে তাকালেন, আপনি কি কিছু দিনের জন্য ছুটি নিতে চান অনু?

এই ভয়টাই অনু করছিল। সে জানে, এই ছুটিটা নেয়া মানে একভাবে তার চাকরিটা হারানোই। সে মাথা তুলে বলল, আমি খুবই সরি স্যার। আশা করছি। সামনে আর এমন কিছু হবে না।

মান্নান সাহেব আশ্বাস দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন, আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন অনু? এমন তো হতেই পারে, সবার আগে তো আমরা মানুষ। আমাদের পারসোনাল, ফ্যামিলি লাইফকে তো আমরা চাইলেই আর পুরোপুরি ইগনোর। করতে পারি না, তাই না? বেটার আপনি কিছুদিনের জন্য লম্বা একটা ছুটি নিন।

অনু অনেকটা বেপরোয়া ভঙ্গিতেই বলল, আমার ছুটির দরকার হবে না স্যার। আমি আমার রেসপন্সিবিলিটিটা হান্ড্রেড পার্সেন্টই পালন করব। আই প্রমিজ।

.

সেদিন আর তেমন কথা এগুলো না, তবে দুই দিনের মাথায় আলতাফ হোসেন আবার ডাকলেন অনুকে। অনু ঘরে ঢুকতেই তিনি অনুর সামনে একটা কাগজ রাখলেন। অনু মৃদু গলায় বলল, কী এটা?

আপনার ওপর অনেক প্রেশার যাচ্ছে দেখেই আপনার একজন এক্সট্রা সহযোগী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। উনার নাম তামান্না। নেক্সট মাসের প্রথম থেকে উনি আপনার হেল্পিং হ্যান্ড হিসেবেই কাজ করবেন।

অনু কাগজটা হাতে নিয়ে দেখলো। যে মেয়েটাকে তার সহযোগী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে পাশ করেছে। সিভিতে দেখা যাচ্ছে এর আগে একাধিক বেসরকারি অর্গানাইজেশনে কাজও করেছে সে। এই মেয়ে কেন তার সহযোগী হিসেবে কাজ করবে অনু ঠিক বুঝতে পারল না। যদিও দু'জনের বেতন কাঠামো প্রায় সমান। অনু শান্ত কণ্ঠে বলল, উনি কি আমার রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে জয়েন করছেন?

আলতাফ হোসেন শশব্যস্ত হয়ে বললেন, তা কেন? এখানে স্পষ্ট লেখাই আছে উনি আপনার সহযোগী হিসেবে কাজ করবেন।

অনু মৃদু হাসলো, এতগুলো টাকা দিয়ে অফিস কেন অতিরিক্ত একজনকে পুষবে? তাও আমার এসিসটেন্ট হিসেবে? তাছাড়া উনি আমার চেয়ে অনেক বেটার অপশন।

সবসময় কী আমরা বেটার অপশনটাই খুঁজি অনু?

অনু এই প্রশ্নের জবাব দিলো না। সে ফিরে গেল আগের প্রসঙ্গেই, বিষয়টি যদি এমন হয় আলতাফ ভাই যে নেক্সট কয়েক মাস উনি আমার সাথে থেকে আসলে আমার দায়িত্ব আর কাজগুলো আমার কাছ থেকে বুঝে নেবেন, তাহলে সেটি আমাকে আগেভাগেই জানিয়ে দেয়াই ভালো। কারণ আপনি জানেন, চাকরি ছাড়া একদিনও আমি চলতে পারব না। এখানে চাকরি না থাকলে আমাকে অন্য কোথাও খুঁজতে হবে। একটু আগেভাগে জানিয়ে দিলে বিষয়টা আমার জন্য কিছুটা ভালো হতো আলতাফ ভাই।

আপনি যা ভাবছেন, তা নয় অনু।

না হলে তো ভালোই। কিন্তু আলতাফ ভাই, আমার মনে হয় আপনিও বুঝতে পারছেন বিষয়টা।

না অনু, একদমই তা নয়। হ্যাঁ হেড অফিস তেমন কিছুই চাইছিল। কিন্তু আমরা জানিয়েছি যে আপনাকে রিপ্লেস করাটা অফিসের জন্যই ক্ষতির। কারণ, আপনার মতো করে পুরো বিষয়টি দুম করে কারো পক্ষে বুঝে নেয়া এখনই সম্ভব হবে না।

আমিও তো তাই বললাম ভাইয়া।

নাহ, আপনি ভাবছেন, আগামী দুই তিন মাসের মধ্যে আপনার সাথে থেকে থেকে আপনার কাজ বুঝে নেয়ার জন্য তামান্নাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তারপর আপনার জায়গায় তাকে পারমানেন্টলি নেয়া হবে, বিষয়টি এমন নয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

অনু আর কথা বাড়ালো না। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আমি তাহলে উঠছি ভাইয়া?

আলতাফ হোসেন কিছু বলতে গিয়েও বললেন না। অনু উঠে দরজার কাছ অব্দি গেল। এই সময়ে আলতাফ হোসেন ডাকলেন, একটু শুনবেন অনু?

অনু ধীরে ঘুরে দাঁড়ালো, জি?

আলতাফ হোসেনও উঠে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু সাথে সাথেই কিছু বললেন না। খানিক নীরব থেকে গাঢ় কণ্ঠে বললেন, ওই দিনের জন্য আমি সরি অনু।

অনু কোনো কথা বলল না। আলতাফ হোসেন আরো কিছুটা সময় দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন, আমি জানি আমি যেটা করেছি তার কোনো ক্ষমা নেই। কিন্তু বিশ্বাস করুন অনু, ওইদিন আমার কি হয়েছিল আমি জানি না। আমি অত জঘন্য মানুষ নই অনু।

অনু যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমন দাঁড়িয়েই রইল। আলতাফ হোসেন বললেন, আপনি আরেকটু বসবেন অনু?

অনু বসলো না, তবে সামান্য এগিয়ে এসে বলল, বলুন।

আলতাফ হোসেন বললেন, এই অফিসে আমি কাজ করি আজ আঠারো বছর। এই আঠারো বছরে কোনো নারী এমপ্লয়ি আমার বিরুদ্ধে কখনো কোনো অভিযোগ করেনি, করতে পারবেও না অনু।

অনু ঠান্ডা গলায় বলল, কেউ তো করেওনি আলতাফ ভাই, এমনকি আমিও করিনি। করেছি?

আলতাফ হোসেন বিধ্বস্ত গলায় বললেন, আমি জানি আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু অনু...।

অনু আলতাফ হোসেনের কথা শেষ করতে দিলো না। সে বলল, আমি রেপড হলেও সম্ভবত অভিযোগ করতে পারতাম না আলতাফ ভাই। সেই সাহস বা অবস্থান আমার নেই। বেশিরভাগ মেয়েরই থাকে না। আর সেখানে শেষ পর্যন্ত ভালোয় ভালোয় নিরাপদে ফিরে এসে কেন অভিযোগ করব?

আলতাফ হোসেন কিছু বলতে চাইছিলেন। তার আগেই অনু আবার বলল, বরং একটা থ্যাঙ্কস আপনার প্রাপ্য।

আলতাফ হোসেন বিভ্রান্ত গলায় বললেন, থ্যাঙ্কস?

অনু বলল, সব মেয়েদের জন্য সব অভিযোগ করাটা সবসময় সহজ না আলতাফ ভাই। সেটা আপনিও যেমন জানেন, আমিও জানি। আর আমার মতো কারো জন্য অভিযোগ করাটা বরং আরো কঠিন। তার ওপর আপনি আমার বস।

অনু থেমে যেন সামান্য হাসলো। তার গলায় কিছুটা শ্লেষ আমি তো বরং ভয়েই ছিলাম যে আপনিই না আবার অফিসে এসে আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করে বসেন! সেটা করলে আমার আর কোনো উপায় থাকত না আলতাফ ভাই। আমাদের মতো মেয়েদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করাটা যত সহজ, আমাদের পক্ষে সেই অভিযোগ খণ্ডানো ঠিক ততটাই কঠিন। কারণ আমাদের পায়ের নিচে মাটি নেই। তাই সবাই আগেভাগেই ধরে নেয় যে সমস্যাটা আমাদেরই। সো আপনি তেমন কিছু করলে সেটা আমার জন্য খুব বিপদ হয়ে যেত। তা যে করেননি, এইজন্যই আপনাকে থ্যাঙ্কস।

অনু, আপনাকে আমার কিছু কথা বলা দরকার। কিন্তু এই অফিসে নয়, অন্য কোথাও। প্লিজ অনু।

অনু আলতাফ হোসেনের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তার ঠোঁটের কোণায় কী অতি সূক্ষ্ম হাসির আভাস? আলতাফ হোসেন বেপরোয়া ভঙ্গিতে বললেন, যে-কোনো রেস্টুরেন্টে? আপনি যেখানে বলবেন, সেখানেই। এমনকি আপনি চাইলে আপনার বাসায়ও হতে পারে।

অনু কথা বলল না, দীর্ঘসময় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, আমি জানি আপনি কী বলবেন আলতাফ ভাই।

আলতাফ হোসেন চমকে ওঠা গলায় বললেন, কী জানেন আপনি?

আপনার ওয়াইফের একটা পরকীয়া সম্পর্ক আছে, এই নিয়ে আপনি মানসিকভাবে প্রচণ্ডরকম ডিপ্রেসড। আপনি চেষ্টা করেছিলেন সম্পর্কটা রিভাইভ করতে কিন্তু সেটাও পারেননি। আবার বাচ্চাদের কারণে সেপারেশনেও যেতে পারছেন না। শুধু বাচ্চাদের কারণেই এই অসুস্থ সম্পর্কটা মেনে নিতে আপনি বাধ্য হচ্ছেন, এই তো? আর এইসব কিছু নিয়ে আপনি ভয়াবহ মানসিক যন্ত্রণায় আছেন। জীবন নিয়ে আপনি যখন ভয়াবহ অতিষ্ঠ, ঠিক সেই সময়ে আমাকে দেখে আপনার মনে হলো আপনি এতদিন যাকে খুঁজেছেন, যার কাছে একটু হলেও শান্তি খুঁজে পেতে পারেন, আশ্রয় খুঁজে পেতে পারেন, সে আমি? তাই তো?

আলতাফ হোসেন কিছু একটা বলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু অনু থামল না। সে ধীর এবং স্থির গলায় বলল, তারপর ধরুন, সবকিছু মিলিয়েই ওই দিন আপনি মানসিকভাবে পুরোপুরি বিধ্বস্ত ছিলেন। তার ওপর অতিরিক্ত মদ খাওয়ার কারণে আপনার হিতাহিত জ্ঞান বুদ্ধি ছিল না। এখন আপনার প্রচণ্ড গিল্টি ফিলিংস হচ্ছে। আপনি আসলে ওইরকম মানুষ নন, আপনি অন্যরকম একজন মানুষ।

অনু, আপনি এখন বিষয়টি নিয়ে আমাকে মক করছেন, আগে তো আমার কথাটা শুনুন...

আরো আছে? আপনি আমাকে সত্যি সত্যি ভালোবাসেন, বিয়ে করতে চান। লুকিয়ে-চুরিয়ে নয়। একদম প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দিয়েই বিয়ে করতে চান, এই তো বলবেন?

আলতাফ হোসেন এবার যেন খানিকটা অসহিষ্ণুই হয়ে গেলেন, আমার কথাটা তো আপনি শুনবেন অনু?

অনু শান্ত গলায় বলল, যে কথাগুলো আপনি জানেন, সেই একই কথা আপনার বারবার শুনতে ইচ্ছে হয় আলতাফ ভাই?

আপনি কী করে এত নিশ্চিত হলেন যে আমি আপনাকে এই কথাগুলোই বলব?

কারণ, ঠিক এই কথাগুলোই আপনি এর আগেও অনেকজনকে বলেছেন। কেউ কেউ আপনার পাতা ফাঁদে পা দিয়েছে, কেউ কেউ দেয়নি।

আপনি কিন্তু এবার বাউন্ডারি ক্রস করছেন অনু।

আমি জানি আলতাফ ভাই, কিন্তু কী করব বলুন? সারাজীবন নানারকম ভয়ে সীমা অতিক্রম করতে পারিনি কখনো। কতরকম ভয় যে সারাক্ষণ ঘিরে রাখে! এরমধ্যে সবচেয়ে বড় ভয় হচ্ছে চাকরির ভয়, চাকরি হারালে খাবো কী? এখন তো অ্যাটলিস্ট চাকরির ভয়টা নাই। তো, বাউন্ডারি ক্রস করতে আর ভয় কী?

অনু, খুব সহজ, সাধারণ একটা বিষয়কে আপনি শুধু শুধু জটিল করছেন।

আমার জগতটাই জটিল আলতাফ ভাই। অনু হাসলো।

আলতাফ হোসেন বললেন, এগুলো আপনাকে কে বলেছে, বলবেন?

কে বলেছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, ভুল কিছু বলেছি কি-না, সেটা গুরুত্বপূর্ণ।

অবশ্যই আপনি ভুল অনেক কিছুই বলেছেন। আমার স্ত্রীকে নিয়ে আপনি যে নোংরা কথাগুলো বলেছেন সেটা তার জন্য অসম্মানজনক। আপনি আমার অপরাধের জন্য তাকে অসম্মান করতে পারেন না।

অনু সামান্য সামনে এগিয়ে এলো। তারপর টেবিলের ওপর থেকে স্বচ্ছ পেপারওয়েটটা হাতে তুলে নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। অনুর আচরণে কেমন একটা বেপরোয়া কিন্তু শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন ভাব। সে বলল, আপনি নিজেও জানেন, আমি মিথ্যা কিছু বলিনি। শুধুমাত্র সিম্প্যাথি ক্যারি করার জন্য আপনার স্ত্রীকে নিয়ে এই নোংরা জঘন্য কথাগুলো আপনিই অন্য মেয়েদেরকে বলে বেড়ান। এখন শুধু শুধু কেন ভান করছেন? নায়লা আপুর কথা মনে আছে আলতাফ ভাই? এখানে অ্যাডমিনে জব করতেন? প্রেম করে পালিয়ে বিয়ে করেছিলেন, হাজবেন্ডের তখনো চাকরি-বাকরি কিছু নেই। ফলে এখানকার চাকরিটাই ছিল তার একমাত্র অবলম্বন। এটা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না তার। আর তার সেই অসহায়ত্বের সুযোগটাই আপনি নিতে চাইছিলেন, মনে আছে?

আলতাফ হোসেন এবার রীতিমত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, আপনি বুঝতে পারছেন, আপনি কি বলছেন?

জি, পারছি। নায়লা আপুকে ফাঁদে ফেলতে না পেরে সেই প্রতিশোধটা আপনি কীভাবে নিয়েছিলেন, মনে আছে? প্রেগন্যান্সির সময় সে ম্যাটারিনিটি লিভে গেলে আপনি নানান কারণ দেখিয়ে তার টেম্পোরারি রিপ্লেসমেন্টের। বদলে পারমানেন্টলি একজনকে নিয়ে নিলেন। মনে আছে আপনার? নায়লা আপু তখন তার বাচ্চার অসুস্থতা নিয়ে ভয়াবহ

বিপদে। হাতে একটা পয়সা নেই, বাচ্চার দুধ কেনার টাকা নেই। সেই সময় আপনি তার চাকরিটাও কেড়ে নিলেন। আপনার মনে আছে আলতাফ ভাই?

অনু মুহূর্তখানেক বিরতি নিয়ে আবার বলল, শুধু শুধু একটা মিথ্যে ঢাকতে কেন হাজারটা মিথ্যে বলছেন? এসব কথা কম বেশি, আগে পরে সবাইই জানে আলতাফ ভাই। আমিও অনেক দেরিতেই জেনেছি। আসলে আমাদের তো নানান ভয় থাকে, ওই ভয় থেকে আমরা বের হতে পারি না। আর পারি না বলেই এগুলো সহজে প্রকাশ্যে আসে না। হয় আমরা চুপচাপ সয়ে যাই, না হয় সরে যাই। নায়লা আপুও সরেই গিয়েছিল। আরো কতজন চুপচাপ সয়ে গিয়েছিল কিংবা তার মতোই সরে গিয়েছিল কে জানে!

আলতাফ হোসেন এবার আর কথা বলার চেষ্টা করলেন না। দাঁড়িয়ে রইলেন যেমন ছিলেন তেমনই। অনু হাতের পেপারওয়েটটা টেবিলের ওপর রেখে দিতে দিতে বলল, আমার ক্ষমতা থাকলে আমি আপনার চেহারাটা প্রকাশ্যে উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু সেই ক্ষমতা আমার নেই। আমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই। কেউ আমার পক্ষে এসে কথাও বলবে না। অভিযোগও করবে না। আমাকেও চুপচাপ সরেই যেতে হবে আলতাফ ভাই।

অনু সামান্য থেমে হঠাৎ উষ্ণ গলায় বলল, আপনি কী একটু আমার কাছে আসবেন আলতাফ ভাই? আপনাকে আমি একটা জরুরি কথা বলব, ভীষণ জরুরি।

আলতাফ হোসেন যুগপৎ ভীত এবং কৌতূহলী দৃষ্টিতে অনুর দিকে তাকালেন, কী কথা?

ভয় পাচ্ছেন? আপনি ভালো করেই জানেন, আপনার কোনো ক্ষতি করার ক্ষমতা আমার নেই।

আপনি বলুন।

অনু হাসলো, আপনার অফিসে, আপনার ঘরে বসে আপনি আমাকে ভয় পাচ্ছেন, কী হাস্যকর না আলতাফ ভাই? লোকে শুনলে কী বলবে বলুন?

আলতাফ হোসেন তাও এগুলেন না। অনুই আবার বলল, কথাটা শোনা আপনার খুব জরুরি আলতাফ ভাই।

আলতাফ হোসেন দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গিতে টেবিলের পাশ ঘেঁষে বের হয়ে দু'পা সামনে এসে দাঁড়ালেন। অনুও সামান্য সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। তারপর হঠাৎ করেই সেই নিস্তব্ধতা চিড়ে বিকট শব্দে আলতাফ হোসেনের চোখের চশমাটা ছিটকে গিয়ে পড়লো দূরে মেঝেতে। চশমার ভাঙা কাঁচগুলো ছড়িয়ে পড়লো চারধারে।

আলতাফ হোসেন একদম শেষ মুহূর্তে ঘটনা যতক্ষণে আঁচ করতে পেরেছিলেন, ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছিল অনেক। তিনি চকিতে একবার তার চশমাটা ধরে রাখতে চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু পারেননি। চশমা ছিটকে পড়েছে। কয়েক হাত দূরে। আলতাফ হোসেন

একহাতে নিজের গাল চেপে ধরে হতভম্ব ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার তখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে অনু তার গালে চড় বসাতে পারে! তিনি দীর্ঘসময় বজ্রাহতের মতো তাকিয়ে রইলেন। অনু তাকে ধাতস্ত হওয়ার সময় দিলো। কিন্তু চশমাবিহীন আলতাফ হোসেন অনুকে স্পষ্ট দেখতে পেলেন না। তিনি দেখতে পেলেন একটা অস্পষ্ট অবয়বের মতো। তবে আলতাফ হোসেন স্পষ্ট টের পাচ্ছেন, চশমার ফ্রেমের আঘাতে তার নাকের উপরের অংশ সামান্য কেটে গেছে। সেই কাটা অংশ থেকে সরু প্রস্রবনের মতো রক্তের ধারা নেমে আসছে। অনু টেবিলের টিবক্সটা আলতাফ হোসেনের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, আমি চাকরিটা ছেড়ে দিলাম আলতাফ ভাই।

৪

ভোররাতের দিকে অয়নের ঘুম ভেঙে গেল। তনুর ঘর থেকে মৃদু কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। কান্নার শব্দ যেন বাইরে থেকে কেউ শুনতে না পায়, সম্ভবত সেইজন্যই মুখ চেপে ধরে কাঁদছে তনু। তারপরও অয়নের ঘুম ভেঙে গেল। সে খাট থেকে নামতে গিয়ে আবিষ্কার করলো, সালমা বেগম খাটের ঠিক পাশেই, নিচে মেঝেতে জায়নামাজের উপর শুয়ে আছেন। অয়ন আবছা অন্ধকারেই ঘুমন্ত মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। সালমা বেগমের মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, তবে তার পরনের সাদা শাড়ি আর তজবির দানাগুলো অন্ধকারেও যেন জ্বলজ্বল করছে। অয়ন আরো কিছুক্ষণ সেভাবেই বসে রইল। তার কেন যেন মনে হচ্ছে মা আজও খুব করে কেঁদেছে। তার খুব ইচ্ছে করছে মায়ের কোলের কাছে গিয়ে গুটিশুটি মেরে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে, কিন্তু সে তা করলো না।

তনুর ঘর থেকে কথা বলার শব্দ আসছে। সাথে কান্নাও। অয়ন একবার ভাবলো সে উঠে তনুর ঘরের দিকে যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হলো, এত রাতে আপা দুলাভাইয়ের ঘরে যাওয়াটা কী তার ঠিক হবে? এই ভাবতে ভাবতেই ফজরের আজান দিয়ে দিলো। আজানের শব্দে সালমা বেগম ধড়ফড় করে উঠে বসলেন। অয়নকে বসে থাকতে দেখে আঁতকে ওঠা গলায় বললেন, অয়ন?

অয়ন বলল, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল মা, তারপর আর ঘুম আসছিল না।

তাই বলে এভাবে বসে থাকবি? আমাকে ডাকলেই পারতি।

তোমাকে ডাকতে ইচ্ছা করছিল না মা।

কেন? ডাকতে ইচ্ছা করছিল না কেন?

অয়ন লজ্জা পাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, তোমাকে দেখতে খুব ভালো লাগছিল মা। মনে হচ্ছিল তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলেই আর তোমাকে এভাবে দেখতে পারব না।

কী সামান্য সহজ এইটুকু কথা। কিন্তু তাতেই সালমা বেগমের বুকের ভেতরটা যেন হুহু করা হাওয়ায় কেঁপে উঠল। তিন উঠে অয়নের পাশে বসলেন। তারপর অয়নের গালে, কপালে, বুকে হাত ছুঁইয়ে বললেন, শরীর খারাপ লাগছে না তো বাবা?

না, মা। শরীর ঠিক আছে।

তাহলে?

তাহলে কিছু না মা।

খিদে পেয়েছে?

নাহ্, এই সাত সকালে কারো খিদে পায়?

সালমা বেগম বুঝতে পারছিলেন না তিনি কী করবেন। বাইরে একটা-দুটো পাখি ডাকছে। পূবাকাশ ফর্সা হয়ে উঠছে। সালমা বেগম বললেন, আমি যাই, অযু করে নামাজটা পড়ে নেই।

অয়ন মাথা নেড়ে বলল, আচ্ছা।

সালমা বেগম বসা থেকে উঠে দাঁড়াতেই অয়ন হঠাৎ মাকে ডাকলো, মা।

সালমা বেগম ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, কী?

অয়ন বলল, আমিও আজ তোমার সাথে নামাজ পড়ি মা?

সালমা বেগম খুবই খুশি হলেন। তিনি অয়নকে ধোয়া কাপড় এনে দিলেন। অয়ন ওজু করে এসে মায়ের পাশে বসে নামাজ পড়লো। নামাজ শেষে অয়নের মাথাটা কোলের মধ্যে নিয়ে গুনগুন করে কোরআন শরিফ পড়তে লাগলেন সালমা বেগম। ছোট্ট শিশুর মতো মায়ের কোলের ভেতর মাথা রেখেই কখন ঘুমিয়ে গেল অয়ন! চারদিকে তখন ঝলমলে আলো ফুটতে শুরু করেছে। সালমা বেগমের হঠাৎই মনে হলো, অনু এখনো উঠছে না কেন, এত বেলা অব্দি তো সে কখনো ঘুমায় না! তিনি অয়নের মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে অনুকে ডাকতে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, অনু জানালার পাশে বসে আছে, জানালাটা খোলা! খোলা জানালা দিয়ে ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়া আর ঝলমলে আলো আসছে। আজ কতকাল পর এই জানালাটা খোলা হলো? তিনি গিয়ে অনুর কাঁধে আলতো। করে হাত রাখলেন। অনু ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। সালমা বেগম বললেন, আজ অফিসে যাবি না?

অনু মাথা নাড়লো, যাব মা।

কখন? বেলা হয়ে গেল তো! উঠে গোসল-টোসল কর, আমি নাস্তা দিচ্ছি।

আরেকটু পরে যাই মা।

রোজ দেরি করে অফিসে গেলে চাকরি থাকবে? আর তুইই তো বলিস, তাড়াতাড়ি বেরুতে পারলে রাস্তার জ্যামটা একটু কম থাকে!

অনু মৃদু হাসলো, কতদিন পর এই জানালাটা খুলোম বলতো মা? একটু বসি।

সালমা বেগম অনুর কথার জবাব দিলেন না। কিন্তু হঠাৎই যেন মনে পড়েছে, এমন ভঙ্গিতে গিয়ে তিনি জানালাটা বন্ধ করে দিতে দিতে বললেন, তুই কী পাগল হয়ে গেছিস অনু?

হলে তো বেশ হতো মা।

সালমা বেগম জানালাটা বন্ধ করতে গিয়ে পলকের জন্য পাশের দোতলার জানালাটা দেখে নিলেন। জানালাটা এখনো বন্ধ। তিনি আচমকা গলা নামিয়ে বললেন, ওই জানালাটা আর খোলেনি?

জানি না মা!

তোর কি হয়েছে বল তো?

আমার কিছু হয়নি মা।

কিছু একটা তো হয়েছেই, বল?

অয়ন উঠেছে? অনু প্রসঙ্গ পাল্টালো।

নাহ্। সালমা বেগম বুঝলেন, অনু আর এই বিষয়ে কথা বলতে চায় না। তিনিও আর ঘাটালেন না। অনু উঠে বাথরুমে ঢুকলো। যতই গরম পড়ক, ভোরবেলার প্রথম পানির স্পর্শটা হাড় কাঁপানো হয়। অনু মুখে পানির ঝাঁপটা দিয়ে আয়নায় তাকালো। তাকে দেখে কী বোঝা যাচ্ছে যে তার চাকরি নেই? এখন কী করবে সে? এই মুহূর্তে বাসায় কোনোভাবেই বলা যাবে না যে তার চাকরি নেই। কিন্তু সারাদিন কী করবে সে? বাসায় থাকলে সবাই নানান প্রশ্ন করবে। কিন্তু বাইরেও বা কোথায় যাবে? অনু একটু সময় নিয়েই বাথরুম থেকে বের হলো। তার চেয়েও বেশি সময় নিয়ে বাইরের পোশাক পরলো। তারপর খেতে বসলো। অয়ন তখনো ঘুমাচ্ছে। সালমা বেগম তাড়া দিলেন, কী হলো? তুই অফিসে যাবি না আজ?

যাচ্ছি মা।

মনে আছে, কাল যে শুক্রবার?

মনে থাকার কী হলো?

সালমা বেগম গলা নামিয়ে বললেন, অয়নের নামে একটা খাসি ছদকা হবে, বেনু কিনেছে। আগামীকাল বাদজুমা মিলাদও হবে। খরচ সব বেনুই দিবে।

অনু কথা বলল না। খেয়ে উঠে দাঁড়ালো। সে ভাবছে আজ বসুন্ধরা সিটির দিকটাতে একটু যাবে। যদিও যেতে মন সায় দিচ্ছে না। সেদিন পরপর দু'বার তোহা ইকরামকে ফোন দেয়ার পরও ফোন ধরেনি সে। এমনকি পরে আর ফিরতি ফোনও করেনি। বিষয়টি নিয়ে একটা অস্বস্তি খচখচ করছিল অনুর মনে। কিন্তু এছাড়া তো আর কোনো উপায়ও দেখছে না সে। যাওয়ার আগে আরেকবার ফোন দিয়ে দেখবে কি-না ভাবছিল অনু। এই সময়ে বেনু এলো।

বড়'পু, একটু শুনবি?

হু, বল?

গতকাল রাতেও তনুকে শামীম ভাই মেরেছে।

কেন?

কেন আবার? টাকা। একটা কাজ করব বড়পু?

কী কাজ?

আমার কাছে কিছু টাকা আছে, ওটা শামীমকে দিয়ে দেই?

তুই টাকা পেলি কই? শুনলাম অয়নের জন্য খাসিও ছদকা দিচ্ছিস?

আরিফুল গ্রিস যাওয়ার আগে আমাকে কিছু টাকা দিয়ে গিয়েছিল, ওগুলো খরচ হয়নি। পড়েই ছিল।

পড়ে থাকুক। আরিফুলের অবস্থা তো ভালো না। কখন কোন বিপদ আসে, তার ঠিক নেই।

কিন্তু তনুর তো এখন মহাবিপদ। শামীম বলছে কিছু টাকা হলেই না-কি ও ব্যবসাটা দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারবে।

পারবে না। আর তুই কোনো বিপদে পড়লে তখন তোকে দেখবে কে? নিজেকে বিপদে ফেলে অন্যকে উদ্ধার করার দরকার নেই।

তুইও তো তাই করছিস, করেছিস। তা করছিস কেন?

অনু আর কথা বাড়ালো না। সে তনুর ঘরে গিয়ে দেখলো তনু টেবিলে মাথা রেখে আধশোয়া ভঙ্গিতে বসে আছে। তার চোখ মুখ ফোলা। ভ্রুর উপরের দিকটা খানিকটা কেটে গেছে। অনুকে দেখেও তনু নড়লো না, বসেই রইল।

অনু পাশে গিয়ে বসলো। তারপর শান্ত গলায় বলল, শামীম কই?

তনু জবাব দিলো না। অনুই বলল, কত টাকা চায় ও?

তনু তাও কথা বলল না। তার চোখে শূন্য দৃষ্টি। অনু আলতো করে তনুর মাথায় হাত রাখলো। তারপর গালে, কপালে। তনুর গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। অনু আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বলল, আমি এখন বেরুচ্ছি। শামীম ফিরলে ওকে বলবি, ও যেন বাসায় থাকে। ওর সাথে আমার কথা আছে।

তনু তাও কোনো কথা বলল না। কেবল তার ফোলা চোখের কোল গড়িয়ে এক ফোঁটা জল পড়লো।

অনু সেদিন আর তোহা ইকরামকে ফোন দিলো না। সে সারাদিন পরিচিত, অর্ধপরিচিত মানুষজনের কাছে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালো। সরাসরি চাকরির কথা বলতে তার সংকোচ হচ্ছিল খুব। দুয়েকজনের কাছে বললেও বেশিরভাগের কাছেই বলতে পারল না। চাকরির সরাসরি আশ্বাসও অবশ্য কেউ দিলো না। একজন খুব আফসোস করে বললেন, ইশ, এই আর কয়েকটা দিন আগে যদি বলতেন, তাহলেই হয়ে যেত। তখন কী যে একটা সুযোগ ছিল!

আরেকজন সিভি পাঠিয়ে রাখতে বললেন, সুযোগ এলে ডাকবেন। সারাদিনের এই অভিজ্ঞতা নিয়ে অনু যে হতাশ তা নয়। বরং সে আগে থেকেই জানতো, চাকরিটা এখন সহজ কিছু নয়। আর যদি কিছু জোটেও, তাতে আগের চাকরির অর্ধেক বেতনও সে পাবে না। বিজয় সরণীর কাছে এসে বাস দীর্ঘ সিগন্যালে পড়লো। ঘামে গরমে অতিষ্ঠ হয়ে আছে সবাই। কী মনে হতে অনু বাস থেকে নেমে হাঁটা শুরু করলো। এ জায়গাটায় চওড়া ফুটপাত। হাঁটতে বেশ আরাম। ভিড়ভাট্টা তেমন নেই। মৃদু হাওয়া বইছে। অনু অনেকটা পথ হাঁটলো। সেদিন হাসানের সাথে রাতে বাইকে এসে যে জায়গাটায় থেমেছিল, সেখানে এসে থামলো অনু। এত তাড়াতাড়ি বাড়িতে গিয়ে কী করবে! তাছাড়া এখন বাড়িতে গেলেই আবারো সেই নানান প্রশ্ন। ক্রিসেন্ট লেকের সেতুটা পার হয়ে উদ্যানে ঢুকলো সে। ফাঁকা একটা জায়গা দেখে বসলো। তার সামনে দুটো চড়ুই পাখি মাটিতে পড়ে থাকা খাবার খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। দৃশ্যটা খুব সাধারণ, কিন্তু অনু যেন তন্ময় হয়েই দৃশ্যটা দেখলো। কতক্ষণ বসে আছে অনুর খেয়াল নেই। তার তন্ময়তা কাটলো হাওয়াই মিঠাইওয়ালার ডাকে, হাওয়াই মিঠাই নিবেন আফা?

অনু হাওয়াই মিঠাই নিলো। একটা লাল আরেকটা হলুদ। তারপর হাওয়াই মিঠাই দুটো হাতে নিয়ে বসে রইল।

অনুর হঠাৎ মনে হলো, সে যে এখানে এসে একা একা বসে আছে, এর পেছনে একটা স্পষ্ট কারণ আছে। সেই কারণটা সে এতক্ষণ ধরতে পারেনি। ধরতে পারেনি বলেই পুরোটা সময় ধরে কিছু একটা খচখচ করছিল মনে। তার আসলে মাহফুজের কথা ভীষণ মনে পড়ছে। ঠিক এই জায়গাটায় মাহফুজের সাথে কতবার এসে বসে থেকেছে সে! কী অদ্ভুত, সে কী তাহলে অবচেতনে মাহফুজের কথা ভাবতে ভাবতেই এখানে চলে এসেছে!

অনুর নিজের কাছেই বিষয়টা অবাক লাগল। এই এতগুলো বছর তো মাহফুজকে একরকম ভুলেই ছিল সে। আজকাল হঠাৎ হঠাৎ তাকে এমন করে মনে পড়ার কারণ কী? না-কি খারাপ সময়ে মানুষ চেতনে অবচেতনে আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়? আচ্ছা মাহফুজ কী কখনোই তার আশ্রয় ছিল? ওই ভীরু, খানিকটা বোকা বোকা স্বভাবের সহজ ছেলেটা? অনু দীর্ঘসময় ভাবলো, কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট উত্তর খুঁজে পেল না।

সে আরো কিছুক্ষণ একইভাবে বসে রইল। কত কত মানুষ তার চারপাশজুড়ে। কিন্তু এই এত এত মানুষের ভিড়েও কী নিঃসঙ্গ একা এক মানুষ সে!

একজোড়া সদ্য বিবাহিত কম বয়সি ছেলে-মেয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। মেয়েটার পরনে ভারি চকমকিওয়ালা সস্তা লাল শাড়ি। ছেলেটার পরনে ছোপ ছোপ জিন্স আর লম্বা ঢোলা শার্ট। মেয়েটা এখনো শাড়ি সামলাতে শেখেনি। সে একহাতে শাড়ির কুঁচি আর আরেক হাতে স্বামীর হাত ধরে খুব সাবধানে হাঁটছে। এত লোকের ভিড়ে বউ তাকে অমন জড়াজড়ি ধরে হাঁটছে দেখে ছেলেটা লজ্জায় ভীষণ গুটিয়ে আছে। শাড়িতে পা বেঁধে মেয়েটা আচমকা হোঁচট খেলো। শেষ মুহূর্তে ছেলেটা খপ করে বউকে ধরে ফেলল। তারা এসে বসলো অনুর ঠিক সামনেই। ছেলেটা মেয়েটাকে বকছে, বলছিলাম না, শাড়ি পরন লাগত না। না ওনার শাড়ি না পরলে চলতোই না।

মেয়েটা চাপা স্বরে বলল, আপনের মায়ই তো কইলো, শাড়ি ফিন্দা আইতে। আমি কী আইতে চাইছি?

মায় কইলেই শুনতে হইবো?

তাইলে কার কথা শুনমু?

কারো কথাই শোনোন লাগত না।

রাগ করেন ক্যা?

রাগ ক্যান করব? আমার কী রাগ আছে যে রাগ করব?

আপনের আবার রাগ নাই? আপনের প্যাট ভর্তি রাগ। মানুষ হইছেন এইটুক, রাগ হইছে আসমান জোড়া।

তুই আর কথা কইস না।

আমি কথা না কইলে কেউ কথা কইবো? ওই যে জিন্সের প্যান্ট ফিন্দা হাইট্টা যাইতেছে, ওই মাইয়ায় আইয়া কথা কইবো?

ছেলেটা কথা বলল না। সে মুখ ভার করে বসে আছে। মেয়েটা হঠাৎ বলল, আচ্ছা, আর রাগ কইরা থাইকেন না। আরেকদিন জিন্সের প্যান্ট আর ওই যে কি জানি আনছেন, ওইগুলান ফিন্দাই বাইর হইমু।

নাহ, তোর ফেন্দন লাগত না। আইজই বাসাত গিয়া ওইগুলান যদি আগুন দিয়া না পুড়ছি, তো আমার নাম আলম না।

কী তাইলে? জানে আলম? আলমের আগে একখান জান লাগাই ডাকমুনে, ঠিক আছে?

মেয়েটা খিলখিল করে হাসছে। ছেলেটা যেমন গম্ভীর মুখে বসে ছিল, তেমন গম্ভীর মুখেই বসে আছে। মেয়েটা হাসি থামিয়ে বলল, আপনে খালি খালি রাগেন, বোঝেন না তো কচুটাও। আচ্ছা, এহন ঘরভর্তি লোক, ময়মুরুব্বি সবাই আছে। আর বিয়াও হইলো মাত্র কয়দিন, এহনই কী সবাইর সামনে ওইগুলান ফিন্দা বাইর হওন যায়? মাইনসে কইবো গ্রামেরতন আইসাই মাইয়ার গায়ে টাউনের বাতাস লাগছে। আফনে না হয় শহরে থাহেন, আমি তো আর শহরে থাহি নাই কোনোদিন। আর লজ্জা শরম বলতেও তো একটা জিনিস আছে, না-কি?

বললাম তো, তুই তোর লজ্জা শরম লইয়াই থাক।

এইবার কিন্তু আমার রাগ লাগতেছে।

ছেলেটা তাও কথা বলল না। মেয়েটাই আবার বলল, আমার লগে ভালো কইরা কথা কন কইলাম। আমার রাগ কিন্তু খারাপ জিনিস।

ছেলেটা বিরক্ত গলায় বলল, আমি ভালো কথা জানি না।

ক্যান, ভালো কথা জানেন না ক্যান?

কারণ আমি খারাপ মানুষ।

আপনে খারাপ মানুষ হইবেন ক্যান? আমি তো খারাপ মানুষের বউ হমু না।

ছেলেটা আবারো চুপ। মেয়েটা হঠাৎ বলল, আমি এখন একটা কাণ্ড ঘটামু।

ছেলেটা মেয়েটার দিকে ঘুরে বলল, কী কাণ্ড?

আপনে যদি আমার লগে ঠিক মতো কথা না বলেন, তাইলে এহন সবার সামনে আপনেরে জাইত্তা ধইরা একখান চুমা দিয়া দিমু। গালে লাল লিবিস্টিকের দাগ লইয়া আপনে ঘুইরা বেড়াইবেন।

ছেলেটা হঠাৎ আতঙ্কিত ভঙ্গিতে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করলো। মেয়েটা তার আগেই হাত বাড়িয়ে ছেলেটার শার্টের কলার টেনে ধরলো। তারপর বলল, কই যান? আইজ আপনের এক দিন কী, আমার একদিন।

ছেলেটা করুণ কণ্ঠে বলল, দ্যাহো, এই মানুষের মইধ্যে এইরম কইরো না। মাইনষে কী কইবো, কও? তোমার না কোনো লজ্জা শরম নাই।

আপনের জন্য জিন্সের প্যান্ট পইরা মাইনষের মইধ্যে ঘুইরা বেড়াবো, লজ্জা শরম রাইখ্যা আর কী হইবো। আসেন চুমা দেই, চুমা।

ছেলেটা দুই হাতে মেয়েটার হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। সে ভীত সন্ত্রস্ত হরিণের বাচ্চার মতো এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে। কেউ দেখে ফেলল না তো!

মেয়েটা খিলখিল করে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে। সে বলল, আইজ আপনার মাফ নাই। গালে লিবিস্টিকের দাগ লইয়াই আইজ আপনেরে আমি ঘুরামু। কোনো মাফ নাই আপনের।

ছেলেটা শেষ পর্যন্ত নানান শর্তে রাজি হয়ে মাফ পেল। তারা দুজন এখন কুটকুট করে বাদাম খাচ্ছে। ছেলেটা বাদাম খুঁটে খুঁটে বাঁধানো বেঞ্চির উপর রাখছে। মেয়েটা একটা একটা করে বাদাম মুখে তুলে দিচ্ছে। নিজের মুখে একবার, স্বামীর মুখে একবার। অনু চোরাচোখে দীর্ঘসময় তাদের দেখলো। তারপর উঠে গিয়ে তার হাতের হাওয়াই মিঠাই দু'খানা দুজনের সামনে ধরে বলল, তোমাদের দুজনের জন্য, নেবে?

মেয়েটা ফট করে হাত বাড়িয়ে বলল, লালখান আমারে দেন।

অনু যখন ফিরে আসছে, তখন ছেলেটা আবারও মেয়েটাকে বকাঝকা শুরু করছে। মেয়েটা অপরিচিত কারো কাছ থেকে কেন হাওয়াই মিঠাই নিলো, কেন তার ভালো-মন্দ বোঝার বুদ্ধি নেই, কেন সে বুঝতে পারে না যে ঢাকা শহরে অপরিচিত মানুষের কাছ থেকে কোনো কিছু নেয়া মোটেও ঠিক নয়। এমন আরো কত কী! মেয়েটা অবশ্য স্বামীর বকাঝকাকে পাত্তাই দিচ্ছে না। সে। খিলখিল করে হাসছে। অবাক ব্যাপার হলো, সেই হাসি শুনতে শুনতে অনুর চোখ কেন যেন ভারি হয়ে এলো।

*

বাড়ি ঢোকার ঠিক আগে গেটের সামনে এসে দাঁড়াতেই অনুর চোখজোড়া আপনা আপনিই চলে গেল দোতলার জানালায়, জানালাটা আজও বন্ধ। তবে একটা বিষয় দেখে অনু থমকে গেল। বন্ধ জানালার স্বচ্ছ কাঁচের ভেতর থেকেও জানালার পর্দাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দীর্ঘদিনের ফিনফিনে সাদা পর্দার বদলে আজ নতুন নীল রঙের পর্দা দেখা যাচ্ছে। জানালাটায় বহুদিন ধরে সেই একই রঙের সাদা পর্দা ঝুলছিল। বিষয়টা খুব অবাক করলো অনুকে। গত কয়েকটা দিন ঐ জানালার কথা যেন কিছুটা ভুলেই ছিল সে। আজ এই মুহূর্তে আবার সেদিন ভোরের সেই গা শিরশির করা অনুভূতিটা ফিরে এলো।

অনু যখন ঘরে ঢুকলো তখন মাগরিবের আজান হয়ে গেছে। বেনু রাজ্যের থালা বাসন এক করে মাজছে। তনু ড্রইংরুমে অয়নের বিছানাটা গোছাচ্ছে। অয়ন ঘরে কোথাও নেই। অনু বলল, তোর জ্বরটা কমলো?

তনু বিছানা ঝাট দিতে দিতেই বলল, হুম, কমেছে।

অনু টেবিলে ব্যাগটা রেখে ঝুঁকে তনুর কপালে হাত রাখলো। তনুর জ্বর এখনো কমেনি।

কই, জ্বর তো কমেনি!

এমন সিরিয়াস কিছু নয়।

ওষুধ খেয়েছিস?

হুম।

অয়ন কই?

আমার ঘরে হাফসার সাথে শুয়ে আছে।

শামীম ফিরেছে?

না ফেরেনি।

ফোন করেছিস? ফোন করে বল বাসায় আসতে। আজও যেন দেরি না। করে।

ওর ফোন বন্ধ।

বন্ধ কেন?

বৃষ্টিতে ভিজে একবার ফোনে পানি ঢুকেছিল, তারপর থেকেই যখন-তখন বন্ধ হয়ে যেত। কাল একবারে পার্মানেন্টলি বন্ধ হয়ে গেছে।

অনু আর কথা বলল না। ঘরে ঢুকে হাত-মুখ ধুয়ে পোশাক পাল্টালো। তার নিজেরও শরীরটা ভালো লাগছে না। গা ব্যথা, জ্বরজ্বর ভাব। সে একগ্লাস পানি। আর একটা প্যারাসিটামল খেয়ে নিলো। ড্রইংরুম গুছিয়ে তনু এলো এ ঘর। গোছাতে। অনু বলল, গায়ে এত জ্বর নিয়ে আবার এসব করছিস কেন?

কাল অয়নের মিলাদ।

শামীমের বিষয়টা কি করব বল তো?

তনু জবাব দিলো না। অনু বলল, এভাবে কতদিন সহ্য করা যায়? সহ্য না করে কী করব আপু?

এটি সেই সহজ প্রশ্নের একটি, যেটির উত্তর সবচেয়ে কঠিন। এই প্রশ্নের উত্তর অনুও জানে না। অনু বলল, অয়নের ঘটনা শামীম জানে?

ওকে কিছু বলতে ইচ্ছে করে না আপু। তবে কিছু যে আচ করে না তা না। ওর ধারণা, অসুখ-বিসুখ হয়েছে, সেরে যাবে। ওকে যাতে টাকা দেয়া না লাগে, সেই জন্যই যতটা না, তার চেয়েও বাড়িয়ে বলা হচ্ছে।

কাল তোর গায়ে হাত তুলেছে কেন?

তনু জবাব দিলো না। সে আলনায় এলোমেলো হয়ে থাকা কাপড় ভাঁজ। করে রাখছে। অনু বলল, ও কি রোজই তোর গায়ে হাত তোলে?

নাহ্, টাকা-পয়সা নিয়ে ঝামেলা হলে।

কাল কী হয়েছিল?

ফোনটা নষ্ট হলো, সেই নিয়ে...।

ফোন কিনে দিতে বলে?

তনু এই প্রশ্নেরও জবাব দিলো না। অনু বলল, ফোনের ব্যবস্থা না হয় করা গেল। কিন্তু তাতে কি কিছু সমাধান হবে?

তনু চুপ করেই রইল। শামীম সেই রাতে বাসায় ফিরল না। ফিরল না পরদিনও।

শুক্রবারটা নানা ঝামেলায় কেটে গেল। অনু চায়নি বাসায় অয়নের উপস্থিতিতেই দোয়া হোক। ফলে দোয়া-মিলাদ হলো মসজিদেই। রাতে অনেক ভেবে বান্ধবী অদিতিকে ফোন দিলো অনু। অদিতির সাথে কথা বলে যদি তার স্বামী তোহা ইকরামের কোনো অবস্থা জানা যায়। অদিতি কিছুটা অসুস্থ। দীর্ঘ বিরতির পর তার দ্বিতীয় সন্তান হবে। অনু ফোন দিতেই অভিমানী গলায় স্বামীর নামে একগাদা অভিযোগ করলো সে, বুঝলি অনু, বিয়ে শাদি না করে ভালোই করেছিস। বিয়ে শাদি করা মানে দাসী বান্দি হওয়া।

অনু সামান্য হাসলো। অদিতি বলল, জামাই ফকির হোক, আর জমিদার হোক, শেষ পর্যন্ত জামাই জামাই-ই। দিনরাত শুধু কাজ, কাজ আর কাজ। টাকা, টাকা আর টাকা। যেন পৃথিবীতে টাকা ইনকাম ছাড়া আর কোনো কাজ নেই।

টাকারও তো দরকার আছে।

তাই বলে ঘরের বউয়ের দিকে কোনো খেয়াল থাকবে না? সারাক্ষণ এই মিটিং, সেই মিটিং। ফোন করলে ফোন পর্যন্ত ধরে না। গণ্ডারের মতো অবস্থা, সকালে ফোন করলে ফোন ব্যাক করবে বিকালে। মাঝে মাঝে তো তা-ও ভুলে যায়।

অদিতির কথা শুনে অনুর একটু স্বস্তি লাগছে। তোহা তাহলে তার ফোন দেখে ধরেনি, তা নয়। সে নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত। অনু বলল, তোহা ভাইদের নতুন প্রজেক্টগুলোর কী অবস্থা?

এইগুলা আমি জানি না অনু। এইগুলার কথা শুনলেও গা জ্বলে। এদিকে ডাক্তার ডেলিভারি ডেট দিয়ে দিয়েছে। ডিসেম্বরের শেষে ডেলিভারি। এখন সমস্যা হচ্ছে, আমি চাচ্ছি ডেলিভারিটা সিঙ্গাপুরে করাবো।

সিঙ্গাপুরে কেন?

তুই জানিস না অনু। এই দেশে কোনো চিকিৎসা নাই, সিস্টেম নাই, সেফটি নাই। এই দেশে আমি আমার বাচ্চা হওয়াবো না। কিন্তু তার এখন টাইম নাই। সে চাইছে আমি বাংলাদেশেই বাচ্চা হওয়াই। সে না-কি সিঙ্গাপুরে যাওয়ার সময় দিতে পারবে না। তার ব্যস্ততা। তুই-ই বল, এই সময়ে কেউ এই ধরনের কথা বলে, বল?

অদিতির গলা ভারি হয়ে এসেছে। মনে হচ্ছে সে যে-কোনো সময় কেঁদেই। ফেলবে। অনু কী বলবে বুঝতে পারছে না। অদিতিই বলল, জীবনে টাকা পয়সাই কী সব বল? সম্পর্কে যদি মায়া, ভালোবাসা, রেসপন্সিবিলিটিই না থাকে, তাহলে সেই সম্পর্কের মূল্য কী? এই যে এত টাকার পেছনে ছুটছে, কী হবে এত টাকা দিয়ে? আমি কি টাকার পাগল? অন্য বউদের মতো আমি কী টাকা টাকা করি? এখন সে বলছে, ঢাকায়ই না-কি ভালো ভালো অনেক হাসপাতাল আছে। কিন্তু আমি আমার সন্তান এই দেশে হওয়াবো না। এটা। ফাইনাল। শুধু যে হওয়াবোই না, তা-ই না। সন্তান হওয়ার পরপরই দেশেও আসবো না।

অনু চুপ করেই রইল। এসব পরিস্থিতিতে খুব দমবন্ধ লাগে তার। অদিতি বলল, তা তোর কী অবস্থা বল তো? বিয়ে শাদির কিছু হলো? না-কি তোহাকে বলে দেখবো? ওর ছোটবেলার এক বন্ধু আছে, কারওয়ান বাজারে পাইকারি সবজির ব্যবসা। শুনে আবার মুখ ভেঙুচাস না যেন! সবজির ব্যবসা হলে কী হবে, টাকা-পয়সা মাশাআল্লাহ অঢেল। আগে বিয়ে-শাদিও করে নাই। আর পড়াশোনাটা একটু কম। সংসারের ঝামেলায় ম্যাট্রিক পাশটা কোনোভাবে করতে পেরেছিল। তারপর আর পড়ে নাই।

এসব কথা এখন থাক অদিতি?

আরে থাকবে কেন? থাকতে থাকতে তো কম থাকল না। বয়স তো আর থেমে থাকে না, বুঝলি? আমার বড় মেয়ে ক্লাস সিক্সে পড়ে, বুঝেসিস?

দেখতে দেখতে কত বড় হয়ে গেল না?

বড় হয়ে গেল মানে? শুধুই কী বড়? প্রতিমাসে তার হাত-খরচ কত জানিস? এই বয়সেই দেখি কত ফ্যাশান-ট্যাশান শিখে গেছে। রেগুলার পার্লারে যাবে। আর কতরকম যে সাজগোজ, পোশাক। দেখলে তো মনে হয় আমি বুড়িই হয়ে গেছি। আমি এখনো সেই গতবছরের আইফোন চালাই। আর তার যে কত বায়না। যুগ, বুঝলি, সবই যুগের হাওয়া। শুনেছি ওর বান্ধবীরা না-কি প্রেম-ট্রেমও করে। তুই-ই বল, ওদের বয়সে আমরা প্রেম কী জিনিস জানতাম? আরো কী কী সব যে বলে, শুনলে লজ্জায় আমার মাথা হেট হয়ে যায়। তাও মেয়ের সাথে কোনো আড়াল রাখি না। ক'দিন পরতো বান্ধবীর মতোই হয়ে যাবে। কী বলিস?

তা তো ঠিকই।

শোন কি হয়েছে, সে আমাকে এসে বলছে, মাম, আই হ্যাভ আ ক্রাশ অন মাই টিচার। আচ্ছা, তুই-ই বল, ক্রাশ কী? ক্রাশ? এইসব জীবনে কখনো শুনেছিস? সে নাকি তার লিটারেচার টিচারের উপর ক্রাশ খেয়েছে। তুই দুধের বাচ্চা, আর সে তোর বাপের বয়সি টিচার। এইসব কী বলে বল তো? শোন। একটা কথা বলি, ক'দিন পর দেখা যাবে মেয়ে বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরে বড়াচ্ছে, বিয়ে-টিয়েও করে ফেলছে। তখন সেই বিয়েতেও তুই আসলি জামাই ছাড়া। তখনো তোর বিয়ে হয়নি। ভাব একবার? মুখ দেখাতে পারবি কাউকে? আমিও পারব না। মেয়ে মানুষের পরিচয় শেষ পর্যন্ত তো জামাই-ই। তা সে সবজি ব্যবসায়ী হোক আর রিকশাওয়ালা তোক। টাক হোক, আর ভূরিওয়ালা হোক। তুই বললে, আমি তোহাকে বলে দেখতে পারি। বলব?

অনু সামান্য হাসলো, তোর প্রেসারটা বোধ হয় বেড়ে গেছে। এই সময়ে এমন হয়। একটু কন্ট্রোলে রাখিস।

.

অনু ফোন রেখে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। কেন যেন তোহা ইকরামকে ফোন দেয়ার আগ্রহটা আর সে পাচ্ছে না। তবে আশ্চর্য ব্যাপার হলো পরদিন সকালে তোহা ইকরাম নিজেই অনুকে ফোন দিলেন। ফোন দেখে অনু কিছুটা ভড়কেই গেল, অদিতি উল্টাপাল্টা কিছু বলেনি তো আবার! সে ফোন ধরে সালাম দিলো। তোহা সালামের জবাব দিয়ে বললেন, আমি খুব সরি অনু। আপনার ফোনের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। গতকাল বাসায় ফিরতেই অদিতি বলল, আপনার সাথে কথা হয়েছে। আর ঠিক তখুনি মনে পড়লো।

না না ভাইয়া, ইটস ওকে। আমি জানি আপনি খুব ব্যস্ত।

ব্যস্ত তো আমরা সবাই। তারপর বলুন, কী খবর?

অনু চট করে বুঝতে পারল না, সে কীভাবে কী বলবে! তারপরও ইতস্তত করে বলল, একটা দরকার ছিল ভাইয়া, একদিন আপনার অফিসে আসতে চাই। আগেও এই বিষয়ে একদিন কথা হয়েছিল।

তোহা কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা। তা একদিন চলে আসুন না?

অনু বুঝতে পারল, এর আগে তার বন্ধুর চাকরি বিষয়ক যে কথা অনু বলেছিল, তা তোহা ভুলে গেছেন। একটা দিক থেকে এটা ভালোই হয়েছে, অনু এবার সরাসরি নিজের কথাই বলতে পারবে। সে বলল, কাল আসি ভাইয়া?

একটা মিনিট- বলে তোহা তার মিটিং শিডিউলটা দেখে বলল, আজ। বিকেল বা সন্ধ্যার দিকে কী ফ্রি আছেন? তাহলে আজই চলে আসুন না? কাল। পরশু খুব ব্যস্ত যাবে।

আজ অনুর কোনো কাজ নেই। তারপরও তাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই বাসা থেকে বের হতে হবে। সারাদিন বাসায় বসে থেকে সে কী করবে? তাছাড়া একটা না একটা কাজ তো তাকে জোটাতেই হবে। অনু বলল, জি ভাইয়া, আমি চলে আসবো।

অনু আজ সারাটা দিনও এখানে-ওখানে গেল। তবে খুব একটা শক্ত আশ্বাস পেল না কোথাও। দুপুরের দিকে তাকে ফোন করলো হাসান, আপনি না-কি জব ছেড়ে দিয়েছেন?

কেবল জানলেন?

অফিসিয়ালি তো এখনো জানানো হয়নি, তবে অফিসে কানাঘুষা চলছে।

কী কানাঘুষা চলছে?

না তেমন কিছু না।

কেমন কিছু না?

এইতো, আলতাফ ভাইয়ের সাথে আপনার ঝামেলা হয়েছে কোনো।

কে বলেছে এই কথা? আলতাফ ভাই নিজে?

না, তিনি কিছু বলেননি। উনি নিজেও দু'দিন ধরে অফিসে আসছেন না। কীভাবে যেন নাক কেটে গেছে।

আর কিছু?

অফিসে এডমিনে কথা হচ্ছিল, এভাবে জব ছেড়ে দেয়াটা তো অফিসিয়াল প্রসিডিওরের মধ্যে পড়ে না। সবকিছুরই তো একটা সিস্টেম আছে। আপনার রেসপন্সিবিলিটিগুলো বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে। সম্ভবত অফিস থেকে আপনাকে ফোন করা হবে।

আচ্ছা।

আরেকটা কথা।

বলুন।

আমি কী আপনার সাথে একদিন দেখা করতে পারি?

পারেন, তবে এখন না।

কেন?

এখন আমার কারো সাথে দেখা করতে ইচ্ছে করছে না।

আচ্ছা। আপনার যখন ইচ্ছে করবে, বলবেন।

অনু ফোন রাখতে যাবে, এই সময়ে হাসান বলল, অফিসজুড়ে একটা ফিসফিসানি, আলতাফ ভাইয়ের সাথে আপনার সিরিয়াস কিছু হয়েছিল?

সিরিয়াস কী?

সেটা তো জানি না।

কথা এর বেশি আর এগুলো না। অনু সন্ধ্যার দিকে তোহা ইকরামের অফিসে গেল। চাকরির কথাও বলল। তোহা জানালেন বর্তমান প্রজেক্টটাতে কাজ করার সুযোগ নেই অনুর। কারণ এই প্রজেক্টের পুরোটাই টেকনিক্যাল। তবে মাসখানেকের মধ্যে তাদের অন্য কিছু প্রজেক্ট লোক লাগবে। তখন সেখানে অনুর একটা না একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে।

বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত হলো অনুর। ফিরে দেখে বাসায় রক্তারক্তি অবস্থা। তনুকে আবারো মেরেছে শামীম। অনু ঘরে ঢুকতেই সালমা বেগম তাকে জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করলেন। অনু অবশ্য কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালো না। সে পোশাক পাল্টে গোসল করলো, খেলো। তারপর চুপচাপ দীর্ঘসময় একা একা বসে রইল। রাত এগারোটার দিকে সে তনুর ঘরে গেল। তনুর গায়ে আবারো জ্বর। সে শুয়ে আছে বিছানায়। শামীম হাফসাকে নিয়ে খেলছে। অনু ঘরে ঢুকতেই শামীম অনুকে সালাম দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। অনু সালামের জবাব দিয়ে বসলো। শামীম বলল, আপনার শরীর ভালো আপু?

হ্যাঁ, ভালো।

অফিস কেমন যাচ্ছে?

এইতো যাচ্ছে। তোমার কী অবস্থা শামীম?

ব্যবসাটা নিয়ে খুব ঝামেলায় আছি আপু। হাতে টাকা-পয়সা নেই। তার ওপর ফোনটাও নষ্ট হয়ে গেল। কী যে করব, মাথা ঠিক থাকে না।

তনুর শরীর কেমন?

সে ভালো আছে, ঘুমাচ্ছে আপু। তার ঘুম খুব কড়া। দেখেন না, সারারাত মেয়েটা কাঁদে, আর সে মরা মানুষের মতো ঘুমায়।

তোমাদের ঘরে কোনো থার্মোমিটার আছে?

আছে আপু।

তনুর জ্বরটা মাপো তো।

একটু ঠান্ডা লেগেছে, তেমন সিরিয়াস কিছু না আপু।

তারপরও একটু মাপো।

শামীম বাধ্য ছেলের মতো তনুর জ্বর মাপলো, একশ দুই আপু।

অনু শামীমের হাত থেকে থার্মোমিটার নিয়ে দেখলো তনুর জ্বর একশ তিনেরও বেশি। তাকে দেখে মনে হচ্ছে না তার জ্ঞান আছে। অনু থার্মোমিটার। ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল, শুধু মুখেই মেরেছ, না-কি গায়েও?

শামীম অবাক ভঙ্গিতে বলল, কী বলছেন আপু? মারবো কেন? সে রাতে এমনভাবে ঘুমায়, হুঁশ থাকে না। সেদিন ঘুমের মধ্যে টেবিলের কোণায় ধাক্কা লেগে রক্তারক্তি কাণ্ড।

আচ্ছা। তুমি এক কাজ করো, বাইরে যাওয়ার শার্ট প্যান্ট পরো।

এত রাতে কোথাও যেতে হবে আপু?

হুম, পরো।

কোথায় যেতে হবে আপু? আপনার কিছু লাগবে?

না, তোমার জন্যই যেতে হবে।

আমার জন্য? শামীম ভারি অবাক হলো।

হুম, তোমাকে আমি থানায় নিয়ে যাব, সাথে তনুকেও। তনু তোমার নামে মামলা করবে।

শামীম অবাক ভঙ্গিতে বলল, মামলা? কিসের মামলা?

নারী নির্যাতনের মামলা। নারী নির্যাতনের মামলায় কোনো জামিন নেই। মামলা চালানোর কোনো খরচও লাগে না। মামলা চলবে সরকারি খরচে।

শামীম থতমত খাওয়া গলায় বলল, কী বলছেন আপু?

অনু শান্ত, ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, কী বলছি শোনো। এই মামলায় সর্বোচ্চ একশ আশি দিনের মধ্যে রায় হয়ে যায়। সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন থেকে মৃত্যুদণ্ড। এর কম হলেও এড়ানোর উপায় নেই, মামলায় জামিনও নেই। তাছাড়া তনুর গায়ে, মুখে কালশিটে দাগ পড়ে গেছে। অপরাধ প্রমাণের অভাব হবে না।

আপু বিশ্বাস করেন, আমি এইসব কিছু জানি না, সে ঘুমের ঘোর...।

অনু শামীমের কথা শেষ করতে দিলো না। সে বলল, তুমি না করে থাকলেও মামলা হবে। ধরো মিথ্যা মামলা হবে তোমার নামে। মামলা মিথ্যা হোক আর সত্য, শাস্তি

তোমার হবেই। তুমি প্রমাণ করতে পারবে না।

শামীম কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আপু, আপনি এইসব কী বলছেন আপু? আমি কিছু জানি না।

না জানলেও হবে। তুমি রেডি হও, আমি ঘর থেকে আসছি।

শামীম ছুটে এসে অনুর পথ আগলে দাঁড়ালো, আপু, আমার ভুল হয়েছে আপু। বিশ্বাস করেন আপু...।

আমি সবকিছুই বিশ্বাস করব শামীম। তবে তার আগে তোমাকে একটা জিনিস বিশ্বাস করতে হবে।

জি আপু, আপনি যা বলবেন, সবই আমি বিশ্বাস করব আপু। আপনি বলেন আপু, বলেন।

তুমি যে এখনো সুস্থভাবে চলছ, ঘুরছ, ফিরছ, এসবই তনুর দয়ায়। তনু চাইলে তুমি এক মুহূর্তও সুস্থ স্বাধীনভাবে কিছু করতে পারবে না। তুমি ভেবো না, তোমার মেয়ের চিন্তা করে তনু তোমাকে কিছু বলছে না। তোমার মেয়ের ভরণ-পোষণের কোনো দায়িত্বই তুমি নাওনি। ভবিষ্যতে নেবে বলেও মনে হয় না। সুতরাং মেয়ের কী হবে চিন্তা করে তোমার সবকিছু মেনে নেয়া হচ্ছে, এটা ভেবো না।

শামীম কথা বলছে না। সে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনু বলল, তনু তোমাকে এতদিন কেন কিছু বলেনি, জানো? কারণ, তনু তোমাকে অসম্ভব ভালোবাসে। কিছু কিছু ভালোবাসা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু মানুষ যখন সেই ভালোবাসায় পড়ে, তখন সে তা বোঝে না। আর বোঝে না বলেই অন্যজন তখন সেই ভালোবাসার সুযোগ নেয়। তুমি এতদিন সেই সুযোগটা নিয়েছ।

অনু সামান্য থেমে বলল, তনুকে ওঠাও। আমি আসছি।

শামীম হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। অনুর মন তাতে গললো না। সে ঘরে গিয়ে পোশাক পাল্টে এলো। শামীম দরজার কাছে চেয়ারে বসে আছে। অনু ঢুকতেই সটান দাঁড়িয়ে গেল। তারপর কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, এই একবার আমাকে একটা সুযোগ দিয়ে দেখেন আপু। এই লাস্ট টাইম। এমন আর হবে আপু।

অনু কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর বলল, ঠিক আছে। তবে তুমি এখন বাইরে যাবে। তনুর জন্য ডাক্তার নিয়ে বাসায় ফিরবে। কীভাবে কোথা থেকে আনবে, আমি জানি না। কিন্তু নিয়ে আসবে। এটাই তোমার সুযোগ।

শামীম আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালো না। সে ঘরের পোশাকেই বেরিয়ে গেল। টাকা-পয়সাও কিছু চাইলো না। সে ফিরল রাত একটায়। কোনো ডাক্তার আনতে না পারলেও এক

ডিসপেন্সারি থেকে তোক নিয়ে এসেছে। সেই লোক তনুকে দেখলো, ওষুধপত্র দিলো। তনুর তখনো জ্ঞান নেই।

সারারাত শামীম তার পাশে বসে রইল। সকালে ঘুম থেকে উঠে শামীমকে ওভাবে পাশে বসে থাকতে দেখে তনু আঁতকে উঠল। কিন্তু শামীম তার পাশ থেকে নড়লো না। তনু প্রচণ্ড অবাক হয়েছে, এক রাতের মধ্যে কী এমন ঘটনা। ঘটলো যে শামীম এমন রাতারাতি পাল্টে গেল! সে সারাদিন ছায়ার মতো তনুর সাথে লেগে রইল। তনুকে নিজ হাতে ভাত খাইয়ে দিলো। গোসল শেষে তনুর কাপড় কেঁচে দিলো। তনুর কী যে লজ্জা লাগছিল। কিন্তু সেই লজ্জার কোথায় যেন একটা তীব্র ভালোলাগাও। নাহ্, মানুষটাকে সে এখনো ভালোবাসে। অসম্ভব ভালোবাসে।

*

অনু জানতো এমন হবে, কিন্তু মানতে কষ্ট হচ্ছে তার। চাকরি নেই দেড় মাসেরও বেশি। এই দেড়টা মাস প্রায় প্রতিটি দিন সে পরিচিত অপরিচিত মানুষের কাছে ঘুরেছে। হাতে অল্প যা কিছু টাকা ছিল, তাও প্রায় শেষ। বাসায় এখনো কেউ কিছু না জানলেও সালমা বেগম কিছু একটা আঁচ করতে পেরেছেন। অনুকে সেদিন জিজ্ঞেসও করলেন, কোনো সমস্যা অনু?

না তো মা?

তোর অফিসে কোনো ঝামেলা হয়নি তো?

কেন?

এই যে প্রায়ই লেট করে বাসা থেকে বের হচ্ছিস। ফেরারও কোনো টাইম টেবিল নাই।

ওহ্, এই কথা! অফিসের বাইরে কিছু কাজ করতে হচ্ছে তো, এই জন্য এমন হচ্ছে।

সালমা বেগম কাছে এসে দু'হাতে অনুর মুখ তুলে ধরে বললেন, কী হয়েছে, আমাকে বল?

অনু হাসার চেষ্টা করলো, কিছু হয়নি মা। ভাত আছে, ভাত দাও। ভাত খেয়ে বের হবো, জরুরি কাজ আছে।

অনু উঠে হাত মুখ ধুয়ে নিলো। আজকাল সে বাসা থেকে যতটা সম্ভব খেয়েই বের হয়, বাইরে বাড়তি খরচ যতটা কমানো যায়।

এর মধ্যে আগের অফিস থেকে ফোন এসেছিল। একদিন যেতেও হয়েছিল অনুর। সে ভেবেছিল নতুন কোনো ঝামেলা করবে অফিস। তবে সেরকম কিছু হলো না। দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে আসতে হলো কেবল। তবে পুরোটা সময় অফিসের সবাই কেমন

অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকালো। দুপুরে বাইরে খাওয়ালো হাসান। খেতে খেতে হাসানের সাথে অনেক কথাও হলো। সে সামান্য নিচু গলায় বলল, আপনি না-কি আলতাফ ভাইকে চড় মেরেছিলেন, এই কথা সত্য?

অনু বলল, এসব উদ্ভট কথা কে বলেছে?

সম্ভবত পিয়ন নাজমুল। সে না-কি তখন আলতাফ ভাইয়ের জন্য চা নিয়ে যাচ্ছিল?

নাজমুল বলেছে?

ঠিক জানি না। তবে এই কথা অফিসে এখন কম বেশি সবাই জানে। কেউ অবশ্য প্রকাশ্যে কিছু বলছে না। তবে আড়ালে-আবডালে ফিসফিসানি তো চলছেই। যা হয় আর কী!

অনু কথা বলল না। হাসান বলল, ঘটনা কী সত্য?

আমি উনাকে চড় মারতে যাব কেন?

কেন যাবেন, সেটি আপনিই ভালো জানেন। তবে ঘটনা যাই হোক, এই অভিযোগ ধোপে টিকবে না। তাছাড়া এ কথা তো উনি কোথাও কাউকে বলতেও পারবেন না।

কেন?

এমনিতেই অধস্তন এমপ্লয়ী, তার ওপর আবার মেয়ে। এমন কারো হাতে চড় খাওয়ার কথা কাউকে বলা যায়!

আপনি হলেও বলতেন না?

হাসান থতমত খাওয়া গলায় বলল, আমি কেন হবো?

আমি তো বলিনি যে হবেন, বলেছি হলে...।

মেয়েদের হাতে মার খেলে পুরুষ বলতে পারে না।

কেন? বলতে পারে না কেন?

হয়তো অহমে লাগে। তবে আপনি সবসময় বলেন না যে মেয়েদের এই অসুবিধা, সেই অসুবিধা। অসুবিধা পুরুষেরও কম কিছু নয়। এই যে লোকটা চড় খেয়েও অভিযোগ করতে পারবে না। আর করলেই সকলে সবার আগে ভাববে দোষটা তারই। সে নিশ্চয়ই এমন কিছু করেছিল যে চড় খেতে হয়েছে।

তা ভাববে কেন?

এটাই নিয়ম। সচরাচর এই ঘটনা তো ঘটে না। যখন ঘটে, তখন সবাই। ধরে নেয়, পুরুষটা নিশ্চয়ই বড়সড় কোনো অপরাধ করেছে।

কিন্তু মেয়েটাও তো করতে পারে। পুরুষ যেমন কারণে-অকারণে মেয়েদের গায়ে হাত তোলে, মেয়েরা তেমন পারে না?

এর আগে দেখেছেন এমন কাউকে?

অনু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, চড় মারা যে খুব বীরত্বের কিছু তা কিন্তু নয়, তা সে পুরুষ হোক, আর নারী। তবে আমার কী মনে হয় জানেন?

কী?

নারীর চড় হচ্ছে দুর্বলের মারের মতো। দুর্বলের মার কেউ খেতে চায় না, তাকে সবাই মারতেই চায়। আর কেউ খেলে প্রমাণ হয়ে যায় সে আরো দুর্বল। আর এই জন্যই পুরুষ তার এই দুর্বলতা প্রকাশ করতে চায় না।

কিন্তু কত কত মেয়েও তো রোজ পুরুষের মার খায়। সেগুলোও তো তারা বলতে পারে না।

দুটার কারণ আলাদা। প্রথমত, খুব এক্সট্রিম কিছু না হলে নারী এমন কিছু করে না। করলে তার পেছনে হয় পুরুষের বড় কোনো অপরাধ থাকে, অথবা তার সেই অহংকার। আর অপরাধ থাকলে যে কেউই খুব স্বাভাবিকভাবেই চাইবে না যে সেটি নিয়ে নাড়াচাড়া হোক। দ্বিতীয়ত, আমাদের সিস্টেমটাই তো এমন যে পুরুষ মারবে, আর নারী মুখ বুজে সহ্য করবে।

কিন্তু দুজনই তো লুকাচ্ছে?

একজন অহংকারের কারণে, অন্যজন অধস্তনতার কারণে।

তাহলে সমাধানটা কী?

জানি না। হয়তো পুরুষের এই যে পুরুষসুলভ অহম আর নারীর যে অধস্তনতা, এই দুটোকেই বিদেয় করতে পারলে...।

তাহলে কী দুজনই দুজনের কথা মাইক ভাড়া করে সবাইকে জানিয়ে বেড়াতো? যেন খুব মজার কথা বলেছে, এমন ভঙ্গিতে হো হো হো করে হেসে উঠল হাসান।

অনু বলল, তা কেন? তখন বলার কারণগুলোই তো আর ঘটত না। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধটা থাকলে আর কিছুর দরকার হয় না। ওটাই সবচেয়ে বেশি দরকার।

খাওয়া শেষে হাসান বলল, তা কী সেই মারাত্মক ঘটনা, যার জন্য এভাবে চাকরি ছেড়ে দিলেন?

অনু হেসে প্রসঙ্গ পাল্টালো, মারাত্মক ঘটনাটা হলো আমাকে যত দ্রুত সম্ভব চাকরি পেতে হবে।

.

অনুর সেই চাকরি এখনো পাওয়া হয়নি। সময় চলে যাচ্ছে, বাড়ছে নানাবিধ সংকট, সমস্যা। তোহা ইকরামের অন্য প্রজেক্টটাও এখনো শুরু হয়নি। আজ নবীনগর ইপিজেড-এ একজনের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল সে। ছোটখাট একটা চাকরির ব্যবস্থা হয়তো সেখানে হয়েও যাবে। সমস্যা হচ্ছে বেতন যা পাবে, তার অর্ধেকের বেশি চলে যাবে বাস ভাড়াতেই। তার ওপর যেতে আসতে কম করে হলেও আধাবেলা লেগে যাবে। আজই যেমন ফিরতে গিয়ে খুব বিড়ম্বনায়ই পড়তে হলো। সন্ধ্যা থেকে কী কারণে রাস্তা বন্ধ। তারপর শুরু হলো অবিশ্বাস্য জ্যাম। গাবতলী পৌঁছাতে পৌঁছাতেই এগারোটা বেজে গেল। এরপর আর এই বাস যাবে না। ফলে সেখানে নেমে আবার অন্য বাস ধরতে হবে। এর মধ্যে ফোনের চার্জও ফুরিয়ে গেল। সে যখন তাজমহল রোডের মাথায় নামলো, তখন চারপাশ শুনসান। কী কারণে যেন পরপর দুটো ল্যাম্পপোস্টে আলোও জ্বলছে না। অনু বাস থেকে নেমে হেঁটেই ফিরছিল। এটুকু পথ শুধু শুধু পনেরো কুড়ি টাকা রিকশা ভাড়া দিয়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। অনু অন্ধকার জায়গাটা পার হচ্ছিল। একটা রিকশা দাঁড়িয়ে আছে মোড়ে। রিকশাওয়ালা সিটের উপর বসে সিগারেট খাচ্ছে। অনু রিকশাটার কাছাকাছি যেতেই সে বলল, যাইবেন?

অনু কথা বলল না। সে দ্রুত পায়ে হেঁটে রিকশাটাকে পার হলো। রিকশওয়ালা আচমকা পেছন থেকে শিষ কেটে বলল, ভাড়া না থাকলেও পবলেম নাই, অন্যকিছু দিয়া পোষাই দিলেই হইবো।

অনু পেছনে তাকালো না। সে যেমন হাঁটছিল, তেমন হাঁটতেই থাকল। রিকশাওয়ালা রিকশায় প্যাডেল চেপে অনুর পিছু নিলো। সে এবার গলা ছেড়ে গান গাইছে, সব সখিরে পার করিতে নেবো আনা আনা, তোমার বেলা নেব সখি তোমার কানের বালা।

অনু বাসার খুব কাছাকাছি এসে গেছে। সামনে গলির মাথায় পরিচিত ছোট দোকানটা এখনো ভোলা। অনু দূর থেকেই দোকানের ছেলেটাকে ডাকলো। ছেলেটা অবশ্য খেয়াল করলো না। সে কানে হেডফোন দিয়ে গান শুনছে। তবে এতে কাজ হলো, রিকশাওয়ালা মুহূর্তেই রিকশা ঘুরিয়ে আবার পেছন দিকে চলে যেতে থাকল।

অনু বাসার সামনে এসে ব্যাগ থেকে চাবি বের করলো। তার মন আর শরীরজুড়ে ভয়াবহ অবসাদ। কিন্তু সেই অবসাদ নিয়েও সে দোতলার জানালাটার দিকে তাকালো। বহুদিন পর জানালাটা আবার খোলা। অবাক ব্যাপার হচ্ছে, জানালাটায় আজ কোনো পর্দাই

নেই। ভেতরে আলোও জ্বলছে। তবে সেই আলোয়ও বাইরে থেকে স্পষ্ট তেমন কিছু বোঝা যাচ্ছে না। সে জানে

কেন, তার ঘাড়ের কাছটায় সেই শিরশিরে অনুভূতিটা আবার ফিরে এলো। কলাপসিবল গেটের তালা খুলতে গিয়ে সে আবিষ্কার করলো তার হাত কাঁপছে। অনু তালাটা খুলে গেটের এক পাশটা টেনে সরালো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে কেউ একজন তার সামনে এসে দাঁড়ালো। অনুর বুকের ভেতরটা ছ্যাত করে উঠল। সে ঝট করে মুখ তুলে লোকটাকে দেখলো, লোকটাকে সে চেনে। খুব ভয়ংকরভাবেই চেনে। আজ থেকে ঠিক তিন বছর আগের এক সন্ধ্যায় ঘরের দরজা খুলতেই লোকটা ঠিক এভাবেই তার সামনে দাঁড়িয়েছিল। তারপর ফ্যাসফ্যাসে ঠান্ডা গলায় বলেছিল, ঘরে তো আর কেউ নাই, একা একা ভয় পাচ্ছেন কি-না তাই সঙ্গ দিতে আসলাম।

আজ অবশ্য লোকটা তেমন কিছুই বলল না। কিছুক্ষণ কেবল স্থির দৃষ্টিতে অনুর দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখ টকটকে লাল। মুখভর্তি খোঁচাখোঁচা দাড়ি। প্যান্টের দুই পকেটে দুই হাত। অনু যখন তাকে শেষবার দেখেছিল, তখন মুখভর্তি এই দাড়িটা কেবল ছিল না। আর সবকিছু সেই আগের মতোই। সেই ধীর-স্থির, শান্ত ভঙ্গি। সাথে গা হিম করে দেয়া ঠান্ডা, হিংস্র চোখ। লোকটা গেটের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আয়েশি ভঙ্গিতে পকেট থেকে বা হাত বের করলো। তারপর একহাতেই সিগারেট ধরালো। সিগারেটে লম্বা টান। দিয়ে মুখভর্তি ধোঁয়া ছেড়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, আমি তো জানতাম খুব সাহসী মেয়ে। কিন্তু সেই কোন কালের ভয় এখনো কাটেনি?

অনু কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। সে যেমন ছিল তেমনই দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছে বছর তিনেক আগের সেই ভয়ংকর সন্ধ্যা। বাসায় কেউ নেই, মা আর অয়ন কী কাজে বাইরে। কলিংবেল বাজতেই তাই দরজা খুলে দিয়েছিল সে। ভেবেছিল মা আর অয়ন ফিরে এসেছে, কিন্তু দরজা খুলতেই অনুর মেরুদণ্ড বেয়ে তীব্র ভয়ের এক শীতল স্রোত বয়ে গিয়েছিল। ঠিক এই একই ভঙ্গিতে, ঠিক এই একইরকম শান্ত, ঠান্ডা অথচ হিংস্র দৃষ্টি মেলে লোকটা দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। তারপর ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলেছিল, বাসায় একা তো, সঙ্গ দিতে এলাম। অনু দু'হাতে দরজার দু'পাশের পাল্লা আগলে ধরে দাঁড়িয়েছিল। লোকটা নিস্পৃহ ভঙ্গিতে একটা পা বাড়িয়ে দিয়েছিল সামনে, যাতে চাইলেও দরজার পাল্লা আটকে দিতে না পারে অনু। আজও ঠিক একই ভঙ্গিতে কলাপসিবল গেটের মাঝ বরাবর পা রেখে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে।

অনু যতটা সম্ভব গলায় সাহস ঢেলে বলল, আপনি কী চান?

লোকটা ডান হাতের পকেট থেকে তার হাতটা বের করলো। অনু প্রথম কিছুক্ষণ ভাবছিল সে ভুল কিছু দেখছে। প্রচণ্ড আতঙ্কে হয়তো তার হ্যাঁলুসিনেসন হচ্ছে। কিন্তু দৃশ্যটা বাস্তব এবং স্পষ্ট, লোকটার ডান হাতের পাঁচটি আঙুলই নখের গোড়া থেকে নেই!

সে মৃদু হাসলো। তারপর বলল, আঙুলগুলো।

অনু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তীব্র আতঙ্কে তার মাথা কাজ করছে না। একটা ঘোরের মতো মনে হচ্ছে সব কিছু। এ কী করে সম্ভব!

লোকটা বলল, করাতকলের ধারালো করাতে আঙুলগুলো কাটা। দেখেছেন, কী মসৃণ আর একদম একই মাপ!

অনুর কানে কিছুই ঢুকছে না। তার শরীর বেয়ে দরদর করে ঘাম নামছে, বুকের ভেতর শব্দ হচ্ছে হাতুড়ি পেটার। এই কারণেই কি-না কে জানে, সালমা বেগম আর বেনুর উপস্থিতি সে টের পেল না। অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে আসতে সালমা বেগম উঁচু গলায় বলতে লাগলেন, এত দেরি করে বাসায় ফিরে আবার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কার সাথে কী কথা, হ্যাঁ? ফোনটা পর্যন্ত বন্ধ। সেই সন্ধ্যা থেকে কতবার যে এই দুইতলা সিঁড়ি বেয়ে নামলাম আর উঠলাম, সেই খেয়াল কারো আছে!

অনু লোকটার ঘাড়ের উপর দিয়ে মায়ের দিকে তাকালো। সালমা বেগম পেছন থেকে উদ্বিগ্ন এবং কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছেন। অনু কিছু বলতে যাবে কিন্তু তার আগেই লোকটা বলল, আজ যাই, তবে অনেক কিছুই বাকি রয়ে গেছে। আমার হিসেব বাকি রাখতে ভালো লাগে না।

সে বড় বড় পা ফেলে অন্ধকার গলির ভেতর মিলিয়ে গেল। সালমা বেগম গেটের মুখে এসে অনুর কাঁধে হাত রেখে বললেন, কে ওটা?

অনু কথা বলল না। সে দু'পা সামনে বাড়িয়ে ভেতরের অন্ধকার জায়গাটায় ঢুকলো। এখানে আলো নেই। যেন এই অন্ধকারটায় সে লুকাতে চায়, কিংবা কোনো ছায়া চায়। সালমা বেগম কিছু একটা যেন আঁচ করতে পারলেন। তিনি আবারো বললেন, অনু? কে ও?

অনু মায়ের এক হাত শক্ত করে ধরলো। তারপর বিড়বিড় করে বলল, ওয়াসিম।

.

সালমা বেগম বাকিটা সময় অনুর গা ঘেঁষে বসে রইলেন। অনু অবশ্য মার সাথে তেমন কোনো কথা বলল না। সে অন্ধকার ঘরে চুপচাপ শুয়ে রইল। বাইরের পোশাক অব্দি পাল্টালো না। হাত-মুখ ধুলো না। যেমন এসেছিল ঠিক তেমনই শুয়ে রইল। অনু জানে যা ঘটেছে তাতে তার যেমন কোনো ভূমিকা ছিল না, তেমনি সামনে যা ঘটবে, তাতেও থাকবে না। কিন্তু অস্বাভাবিক হলেও সত্য যে এর সবকিছুর ফলাফলটা শেষ অব্দি তাকেই ভোগ করতে হবে। যেমনটা পেছনেও হয়েছে।

আসলে কিছু কিছু মানুষ এমনই, যারা অন্যের জন্য জন্মায়, অন্যের জন্য বেঁচে থাকে। অন্যের অপরাধের শাস্তি ভোগ করে। যাদের প্রস্থানও হয় অন্য সকলের অভিযোগ আর আক্ষেপের বোঝা মাথায় নিয়েই। অথচ তাদের জীবন কেটে যায় এই ভেবে ভেবে যে হয়তো তাদের জন্যও এই জগতের কোথাও না কোথাও কেউ অপেক্ষায় আছে; কিছু অপেক্ষায় আছে! কিন্তু তাদের সেই চিরন্তন। অপেক্ষার গল্প শেষ হয় ভয়াবহ উপেক্ষায়।

সালমা বেগম কী মনে করে হঠাৎ উঠে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালেন। বারান্দাটায় খুব একটা কারো আসা হয় না, তার ওপর কদিনের বৃষ্টি আর মেঘলা আবহাওয়ায় কেমন একটা সঁতসেঁতে ভাব। তিনি খুব সাবধানে দাঁড়িয়ে ডান দিকে তাকালেন। পাশের দোতলার সেই জানালাটার সবগুলো পাল্লা খোলা। জানালায় পর্দা নেই। পর্দাবিহীন জানালাটার ওপাশে আলো জ্বলছে। সেই আলোয় ওয়াসিমকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটা বিশাল ইজি চেয়ারে বসে মৃদু দোল খাচ্ছে সে। তার মুখে সিগারেট, দৃষ্টি ছাদের দিকে নিবদ্ধ। সেখানে সিলিংফ্যান ঘুরছে। আলোর উৎস তার উল্টোদিকে হওয়ায় ফ্যানের ঘূর্ণায়মান পাখা এবং তার কম্পমান দীর্ঘ ছায়া পড়ছে পেছনের দেয়ালে। পুরো দৃশ্যটার মধ্যে কেমন একটা গা ছমছমে ভাব। সালমা বেগম কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার ঘরে চলে এলেন। অয়ন ঘুমিয়ে পড়েছে। গত কিছুদিন থেকে অয়নের জ্বর আসাটা আর একদমই নেই। তিনি অনুর কাছে এসে আবার বসলেন। তারপর বললেন, মারে।

অনু মায়ের দিকে ফিরে তাকালো। সালমা বেগম বললেন, ও কী বলেছে আমাকে বলবি মা? আমার খুব ভয় হচ্ছে।

সালমা বেগম আলতো করে তার মাথাটা রাখলেন অনুর কাঁধে। তারপর এক হাত দিয়ে অনুকে জড়িয়ে ধরলেন। অনু কিছু বলল না। আরো বেশ কিছুক্ষণ যেমন ছিল, তেমনই বসে রইল। তারপর যেন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। সালমা বেগম অন্ধকারেই কিছুটা অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন। অনু বাতি জ্বালিয়ে টেবিলের উপর থেকে ডেস্ক ক্যালেন্ডারটা টেনে নিয়ে মায়ের কাছে এসে বসলো। তারপর সময় নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কিছু একটা দেখতে দেখতে নরম গলায় বলল, একটা কথা বলি মা?।

সালমা বেগম কিছু বললেন না, তিনি তখনো অবাক চোখেই তাকিয়ে আছেন। অনু বলল, ধরো মাঝ সমুদ্রে হঠাৎ ভয়ংকর ঝড় উঠল, তুমি একটা ডিঙি নৌকায়, তখন ভয় পেলে কী কিছু ঠিক হবে, মা? হবে না। তখন হয় যা আছে তাই নিয়েই বাঁচার চেষ্টা করতে হবে, না হলে সব ভাগ্যের হাতে ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে বসে থাকতে হবে। দুশ্চিন্তা করে, ভয় পেয়ে তো কিছু হবে না, হবে' মা?

সালমা বেগম তারপরও কথা বললেন না। অনু ক্যালেন্ডার থেকে মুখ তুলে বলল, জানো? আজ যে চারমাস পেরিয়ে সতেরো দিন?

সালমা বেগম এবার স্খলিত কিন্তু ফিসফিসে গলায় বললেন, আল্লাহ, ও আল্লাহ, আল্লাগো, আল্লাহ মালিক।

অনু বলল, অয়নের জ্বরটা তো আর আসে নাই না, মা?

নাহ।

আল্লাহ চাইলে কত মিরাকলই তো ঘটে মা।

সালমা বেগম দুই হাতে বুক চেপে ধরে ফিসফিস করেই বললেন, আমি শ্বাস নিতে পারি নাগো মা। আমি কত দিন শ্বাস নিতে পারি না। আমার কলিজাটা শুধু কাঁপে আর কাঁপে, থরথর করে কাঁপে। ব্যথা, মাগো খালি ব্যথা, আর ভয় করে। কী যে ভয়রে মা।

অনু মায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে তার একটা হাত চেপে ধরে বলল, দেখি কাল আরো একবার ডাক্তারের কাছে যাব।

সালমা বেগম কথা বললেন না। তিনি উঠে ধীর পায়ে অয়নের ঘরে গেলেন। অয়ন ঘুমাচ্ছে, তার ভারি নিঃশ্বাস পড়ছে। মেঘলা আবহাওয়ার। কারণেই একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। সালমা বেগম পাতলা কাঁথাটা টেনে দিলেন অয়নের গায়ে। অয়নের মাথার কাছে টেবিলে একটা সুন্দর নোট বুক পড়ে আছে। নোটবুকটার ভেতরে একটা কলম থাকায় মাঝামাঝি জায়গাটা সামান্য ফুলে আছে। তিনি টেবিলের কাছে গিয়ে সন্তর্পণে নোটবুকটার উপর হাত রাখলেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে অয়ন ডাকলো, মা।

সালমা বেগম ফিরে তাকিয়ে বললেন, শরীর খারাপ লাগছে বাবা?

না মা, আগের চেয়ে বরং ভালো লাগছে। তুমি ঘুমাওনি?

সালমা বেগম স্বাভাবিক গলায় বললেন, অনুর আসতে দেরি হলো এইজন্য জেগে আছি।

আপু কই?

ও ঘরে। তুই ঘুমা, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দেই?

অয়ন মৃদু হাসলো, দাও।

সালমা বেগম অয়নের পাশে বসে তার চুলের ভেতর বিলি কেটে দিতে থাকলেন। অয়ন হঠাৎ মায়ের হাতটা চেপে ধরে বলল, আমাকে খুব ভালোবাসো মা?

সালমা বেগম নিজেকে যেন সামলে রাখতে পারলেন না। তিনি নিচু হয়ে অয়নের কপালে চুমু খেলেন। তারপর দু'হাতে অয়নের মাথাটা বুকে চেপে ধরে বসে রইলেন। অয়ন বলল, মা, আজকাল আমার শরীরটা ভালো ঠেকছে।

সালমা বেগম ভেজা গলায় প্রায় ফিসফিস করে বললেন, আল্লাহ সাফি, আল্লাহ মাফি, রাতে জ্বরটাও তো আর আসছে না?

না মা।

সালমা বেগম অয়নকে জড়িয়ে ধরে রইলেন। অয়নের মনে হলো, মায়ের শরীর জুড়ে কী আশ্চর্য ভালো লাগার এক ওম! কী অপার্থিব অনুভূতির এক সুবাস! কিন্তু অয়ন কী জানে? মায়ের শরীরের এই সুবাস, এই উষ্ণতা সন্তান ছাড়া জগতে আর কেউ টের পায় না। না-কি মায়েদের শরীর সবার অলক্ষে খুব সযতন সতর্কতায় এই ওম আর ঘ্রাণ কেবলমাত্র তার সন্তানের জন্যই লুকিয়ে পুষে রাখে? এই ঘ্রাণ, এই আশ্চর্য ওম সে সন্তান ছাড়া আর কারো কাছে। কখনোই প্রকাশ করে না!

*

নুহা এলো সকাল নটার দিকে। ঠিক এক মাস তেইশ দিন পর নুহার সাথে দেখা হলো অয়নের। সেদিনের পর থেকে খুব একটা কথাও হয়নি আর। অয়ন অবশ্য বহুদিন ঘরের বাইরেও যায় না। মাঝখানে দু'তিনবার ফোনে কথা হয়েছিল। নুহা খুব ভেঙে পড়েছিল বলে অয়ন যতটা সম্ভব তাকে সাহস জোগানোর চেষ্টাই করেছে। এর মাঝে আরো একবার নানুবাড়ি গিয়েছিল নুহা। অনেক ঝামেলা করে হলেও আদিলের বিয়েটা আপাতত পেছানো গেছে। আদিল বাসায় জানিয়েছে, কী এক জরুরি কাজে তাকে তাড়াহুড়া করে সপ্তাহ দুয়েকের জন্য আবার আমেরিকা যেতে হচ্ছে। আমেরিকা থেকে ফিরে নতুন করে বিয়ের তারিখ ঠিক করবে। এই নিয়েও যে তুলকালাম কম হয়েছে তা নয়। পাত্রীপক্ষ। তো মানতেই চায়নি। কিন্তু আদিল নিজেই যথাসম্ভব সবাইকে বুঝিয়ে রাজি করিয়েছে। নুহা এতে কিছুটা স্বস্তি পেলেও তার আশঙ্কা আর অনিশ্চয়তা তাতে এতটুকুও কমেনি। সেদিন ফোনে হাউমাউ করে কেঁদেছেও সে। অয়ন কী। বলবে! সে চুপচাপ সেই কান্না শুনেছে কেবল।

ঘুম ভেঙে নুহাকে বিছানার পাশে দেখে অয়ন রীতিমত চমকে গেল। নুহা পরেছে হলুদ রঙের কামিজ। সাথে হলুদ ওড়না আর সেলোয়ারও। তাকে দেখতে লাগছে হলুদ পাখির মতো। তবে অয়নের আজ সত্যি সত্যিই মনে। হলো, নুহার বয়স যা-ই হোক না কেন, সে কদিনেই যেন অয়নের চেয়ে হঠাৎ অনেক বড় হয়ে গেছে। সেই কিশোরী কিশোরী ভাবটাই আর নেই। পরিপূর্ণ তরুণী মনে হচ্ছে তাকে। অয়ন বলল, তুই হঠাৎ অনেক বড় হয়ে গেছিস নুহা।

নুহা গম্ভীর গলায় বলল, এতদিনে বুঝতে পারলি?

অয়ন বলল, হুম। আচ্ছা, তোর বয়স কত হলো রে?

আঠারো বছর, তিন মাস।

বিশ্বাসই হচ্ছে না! তোকে আরো বেশি লাগছে।

এটা কি প্রশংসা, না অপমান?

প্রশংসা। অয়ন মৃদু হাসলো, এতদিনে বুঝলাম, মেয়েরা সবসময় ছেলেদের চেয়ে বড়ই হয়।

গাধারা দেরি করেই বোঝে।

সেটাও বুঝে গেছি।

নুহা বলল, তুই আর কোচিংয়ে যাচ্ছিস না, বাসা থেকেও বের হচ্ছিস না, কেন? দিব্যি তো সুস্থ আছিস।

অয়ন বলল, সেদিনই না বললি, না দেখেও অনেক কিছু বোঝা যায়। তাহলে দেখেও কতকিছু বোঝা যায় না, একবার ভাব?

নুহা আচমকা গম্ভীর হয়ে গেল, তোর কী হয়েছে, সত্যি করে বলতো, অয়ন?

কিছু হয়নি, কিন্তু হতে কতক্ষণ? ধর, একদিন দেখলি টুপ করে নাই হয়ে গেছি। অয়ন কথা শেষ করতে না করতেই হা হা হা করে হেসে উঠল। যেন খুব মজার কোনো কথা বলেছে। কিন্তু অয়নের দিকে তাকিয়ে নুহার কেন যেন হাসি পেল না। বরং তার খুব অস্বস্তি হতে লাগল। সে উদ্বিগ্ন গলায় ডাকলো, অয়ন?

হুম।

নাই হয়ে যাবি মানে?

ধর, দুম করে মরেটরে গেলাম! হতে পারে না?

হুম, তা তো হতেই পারে। কিন্তু সে তো যে কেউই হতে পারে।

সেই জন্যই তো বললাম।

নুহা কিছু একটা বলতে গিয়েও থমকে গেল। অনু দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। সে নুহাকে দেখে যেন প্রথম চিনতেই পারল না। নুহা উঠে সালাম দিতেই অনু বলল, তুমি কত বড় হয়ে গেছ মেয়ে!

নুহা হাসলো, আপনি ভালো আছেন আপু?

অনু একহাতে নুহাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বলল, হ্যাঁ, ভালো। বাসার সবাই ভালো?

নুহা ঘাড় কাত করে বলল, জি আপু, ভালো।

অনু অয়নের গায়ে হাত দিয়ে উষ্ণতা দেখলো। তারপর বলল, সকালের ওষুধগুলো খেয়েছিস?

অয়ন না বোধক মাথা নাড়লো, এখনো তো বিছানাই ছাড়িনি।

যা, ফ্রেশ হয়ে কিছু খেয়ে ওষুধগুলো খেয়ে নে।

অয়ন বিছানা ছাড়তেই অনু নুহার দিকে তাকালো, পরীক্ষা তো চলেই এলো?

জি আপু।

প্রিপারেশন কেমন?

এই তো আপু মোটামুটি। নুহা উত্তরটা দিয়েই খুব সামান্য সময়ের জন্য থামলো। তারপর আবার সাথে সাথেই বলল, আচ্ছা আপু, একটা কথা, অয়নের কী কোনো সমস্যা হয়েছে?

অনু অবাক হবার ভঙ্গিতে বলল, কী সমস্যা?

সেই প্রথম দিন থেকেই অনু চায়নি অয়নের এই ব্যাপারটা বাইরের কেউ জানুক। তা সে অয়নের বন্ধু হোক বা অন্য কেউ। প্রথমত, একবার কেউ জানলে সেটা কোনো না কোনোভাবে অয়নের কান অব্দি পৌঁছাবেই, এটা অনু জানে। আর দ্বিতীয়ত, এই নিয়ে মানুষজন যে অতিরিক্ত সহানুভূতি দেখাবে বা দলবেঁধে নানা ছল ছুঁতোয় অয়নকে দেখতে আসবে এই বিষয়গুলো বরং তাদের এবং অয়নের জন্যও আরো বেশি কষ্টকরই হতো।

নুহা বলল, না আপু, আমার হঠাৎ মনে হলো।

নুহাকে আর কিছু বলার সুযোগ দিলো না অনু। চুলায় কিছু একটা পুড়ছে এমন ভান করে সে শশব্যস্ত হয়ে উঠে রান্না ঘরে গেল। অয়ন তখনো বাথরুম থেকে বের হয়নি। কী মনে হতেই নুহা রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর বলল, আপু, আরেকটা কথা বলি?

তুমি বসো, আমি আসছি। অনু রান্না ঘরে কিছু একটা কাজ সেরে আবার এসে বসলো। নুহা বলল, আপু, কিন্তু পরীক্ষার আগে আগে অয়নকে এমন একটা ফোন কিনে দিলেন!

অনু মৃদু হাসলো, ওর শখের কিছু তো কখনো দেইনি, তাই দিলাম। আমাকে একটু বের হতে হবে নুহা, আমি উঠি?

নুহা বুঝতে পারছিল, অনু তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে। সে আর কথা বাড়ালো না। অয়ন সামান্য কিছু খাবার খেয়ে ওষুধ খেলো। নুহা বলল, তুই বাইরে যাস না, সে ঠিক আছে। কিন্তু তোর ফোনটাও তো সেই কবে থেকে অফ। ফোন অফ কেন?

আমার ফোনে তো তেমন কেউ ফোন দেয় না। এইজন্য অফই থাকে।

কিন্তু আমি তো তোকে ফোন করলে কখনোই পাই না।

অয়ন বলল, এখন থেকেই প্র্যাকটিস কর।

কী প্র্যাকটিস?

ফোনে না পাওয়াটা।

মানে?

অয়ন কথা ঘুরিয়ে নিলো, মানে, বিয়ে হয়ে গেলে তো আর ফোন দিতে পারবি না।

নুহা কিছুক্ষণ অয়নের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল। তার মুখ গম্ভীর। সে বলল, তুই এটা মিন করিসনি অয়ন!

অয়ন হাসলো, এত সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছিস কেন?

তুই আমার কাছে কিছু লুকাচ্ছিস।

অয়ন মুহূর্তেই কেমন চুপ হয়ে গেল। তারপর বালিশটা দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে তাতে পিঠ ঠেকিয়ে বসে বলল, লুকানো জিনিস লুকানো থাকাই ভালো নুহা।

তুই আমাকে বলবি না? বলতে চাইলে কেউ লুকায়? আর সব লুকানো জিনিস সবাই খুঁজেও পায় না।

অয়ন হাসলো। নুহার মনে হলো ওই হাসির অন্য নাম কান্না।

.

অনুর সাথে শামীমের দেখা হয়ে গেল বাসার গলিটা ছাড়িয়ে সামনের মোড়ে। সেখানে হাতের ডানে তিনতলা অর্ধসমাপ্ত একটা বিল্ডিং রয়েছে। বিল্ডিংয়ের দোতলা পর্যন্ত কাজ শেষে হলেও তিনতলার কাজটা অর্ধেক হয়ে থেমে আছে। এলাকার বখাটে ছেলেদের আড্ডা বসে সেখানে। দোতলায় আগে একটা কোচিং সেন্টার ছিল, কিন্তু নানা অভিযোগে সেই কোচিং সেন্টার বছর তিনেক আগে বন্ধ হয়ে যায়। নিচতলায় ছোট আকারের মার্কেট রয়েছে। এখানে বই-খাতা, স্টেশনারি থেকে শুরু করে ফটোকপি, প্রিন্টিং, ওষুধসহ নানা-কিছু পাওয়া যায়। মূলত কোচিং সেন্টার আর পাশের স্কুলটিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল এই মার্কেট।

শামীমকে এখানে দেখে অনু কিছুটা অবাক হলো। এখানে যারা আড্ডা দেয় তাদের সম্পর্কে খুব একটা ভালো ধারণা বা অভিজ্ঞতা অনুর নেই। শামীম অবশ্য অনুকে দেখেই

.

উঠে এসে সালাম দিলো। অনুর হাতে বাজারের ব্যাগ ছিল। সে ব্যাগটা হাতে নিয়ে বলল, আপু, আল্লাহর ইচ্ছায় ব্যবসাপাতির একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছি।

সেইরাতের ঘটনার পর শামীম আর তনুর গায়ে হাত তোলেনি। বরং খুবই ভালো ব্যবহার করেছে। টাকা-পয়সা সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও কোনো কথা বলেনি। ওইটুকুতেই শামীম এতটা বদলে যাবে অনু ভাবেনি। বরং অবাকই হয়েছে সে। কিন্তু আজ আবার ব্যবসার প্রসঙ্গ তুলতেই অনু কিছুটা সতর্ক হলো। সে বলল, কী ব্যবস্থা?

বাস স্ট্যান্ডের কাছে যেই স্কুলটার সামনে দোকান দিবো ভাবছিলাম, সেখানে দোকান পেয়ে গেছি আপু।

কিন্তু ওখানে দোকান পেতে তো অনেক টাকা লাগে। এত টাকা পেলে কোথায়?

ব্যবস্থা হয়ে গেছে আপু। আসলে বন্ধুবান্ধবের মতো বন্ধুবান্ধব থাকলে কোনো কিছুই আটকে থাকে না।

সেটা ঠিক আছে। কিন্তু যা-ই করো, সাবধানে ভেবে বুঝো করো শামীম। আমি জানি না, বইয়ের বিজনেস করার বুদ্ধিটা তোমাকে কে দিলো? এই সময়ে এসে বইয়ের বিজনেস খুবই রিস্কি।

জি আপু, তা জানি। কিন্তু আপু, এ ছাড়া তো আর কোনো উপায়ও দেখছিলাম না। সব বই প্রায় বাকিতে এনেই বিজনেস করা সম্ভব। অন্য কিছু তো এভাবে সম্ভব না।

আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখো কী হয়! তবে সাবধান, আবার বড় কোনো ঝামেলায় জড়িয়ো না। শুনেছি, ওসব জায়গায় দোকান পেতে বড় নেতা ধরতে হয়, পলিটিক্যাল লবিং পর্যন্ত লাগে। তুমি কি করে এত সহজে সব ব্যবস্থা করে ফেললে জানি না। আমার আবার অল্পতেই ভয় হয় বুঝলে?

শামীম আচমকা রাস্তার মাঝখানে টুক করে ঝুঁকে পড়ে অনুর পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে ফেলল। তারপর বলল, আমার আপন বড় বোন নেই আপু। কিন্তু আপনি আমাকে যে স্নেহ করেন, আদর করেন, এই যে আমার ভালো-মন্দ নিয়ে এত ভাবেন। এতে আমার বড় বোনের সেই আফসোসটা আর থাকে না।

অনু খানিক বিব্রত হলেও শামীমকে কিছু বলল না। শামীম বলল, দেখবেন আপু, বিজনেসটা দাঁড়িয়ে যাবে, আপনি শুধু একটু দোয়া...। শামীম কথা শেষ করতে পারল না, তার আগে তার ফোন বেজে উঠল। সে তড়িঘড়ি করে পকেট থেকে ফোন বের করে বলল, আপু, আমার জরুরি একটা ফোন এসেছে, এখুনি যেতে হবে। আপনি একা যেতে পারবেন?

অনু হাসলো, কোনো সমস্যা নেই। তুমি যাও।

অনু ঘরে ঢুকে দেখলো অয়ন বসে আছে। সে বাজারের ব্যাগটা রান্না ঘরে রেখে এসে বলল, তোর ফোনটা কী তুই শামীমকে দিয়ে দিয়েছিস?

অয়ন বলল, আমার তো ফোন লাগে না আপু। তেমন তো কেউ ফোনও দেয় না।

শামীম চেয়েছিল তোর কাছে?

নাহ্।

তাহলে?

এমনি আপু, ভাইয়ার ফোনটা তো কাজ করছিল না।

কবে দিয়েছিস?

অয়ন চুপ করে রইল। অনু বলল, তনুকে কী সেদিন রাতে ফোনের জন্যই মেরেছিল? তুই জেগে জেগে সব শুনেছিলি না?

অয়ন কথা বলল না, অনুও না। কিছুক্ষণ অয়নের দিকে তাকিয়ে থেকে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অনু বলল, মানুষ হতে গেলে খুব কষ্ট পেতে হয় বুঝলি অয়ন?

অয়ন ম্লান হেসে বলল, না, বুঝিনি।

.

অয়ন মারা গেল সেই রাতেই। সালমা বেগম অয়নের বিছানার পাশে মেঝেতে জায়নামাজেই শুয়ে ছিলেন। তিনি ফজরের নামাজ পড়ে প্রতিদিনকার মতোই দোয়া-দরুদ পড়ে অয়নের গায়ে ফুঁ দিলেন। তারপর অয়নের কপালে হাত দিয়ে জ্বর আছে কি-না দেখতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন, তার বুকের ভেতরটা তীব্র এক ঝাঁকুনিতে হঠাৎ শূন্য হয়ে গেছে। সেই শূন্যতা সহ্য করার ক্ষমতা তার নেই। তনু আর বেনু শেকড়হীন বৃক্ষের মতো আছড়ে পড়লো মেঝেতে। অনুর বড় চাচিরা এলেন। এলো আত্মীয়-স্বজন যারা ছিল কম বেশি সকলেই। এমন মৃত্যু মেনে নেয়া সকলের জন্যই কঠিন। কান্নার রোল পড়ে যাওয়া ওই স্যাঁতসেঁতে ছোট্ট ঘরের বাড়িটাতে একজন মাত্র মানুষ কাঁদলো না। কোনো শব্দ করলো না। মৃত অয়নকে এক পলক দেখতেও চাইলো না। সেই মানুষটা অনু।

সে চুপচাপ বসে রইল। তাকে কতজন ডাকলো। সান্ত্বনা দিতে এলো, কত কত কথা বলল। কিন্তু তার কিছুই যেন সে শুনলো না। সেই সারাটা দিন সে স্থির, স্তব্ধ বসে রইল। সকাল গড়িয়ে দুপুর হলো, বড় চাচারা অয়নের লাশ দাফন করতে নিয়ে গেলেন গ্রামে। সাথে গেল তনু, বেনু আর শামীম। সালমা বেগম সংজ্ঞাহীন পড়ে রইলেন বিছানায়। শুধু অনু সেই যে বসে ছিল, ঠিক তেমনই বসে রইল। নিঃশব্দ, নিথর, নিস্পন্দন। দুপুর

গড়িয়ে বিকেল নামলো, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। সেই সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে রাতের মতো গাঢ় অন্ধকার আর শুনসান নিস্তব্ধতা হয়ে বসে রইল অনু।

*

অয়নের মৃত্যুর ঠিক পাঁচ মাসের মাথায় বিয়ে হয়ে গেল নুহার। তার এইচএসসির শেষ পরীক্ষাটা পর্যন্ত অপেক্ষা করছিল আদিল। পরীক্ষাটা শেষ হতেই তাড়াহুড়া করে ঘরোয়াভাবে বিয়ে হয়ে গেল তাদের। আগের বিয়েটা ভাঙা নিয়ে এমনিতেই খুব ঝামেলা হয়েছিল। আর কোনো ঝামেলা বা আড়ম্বর। চায়নি কোনো পরিবারই। তার কিছুদিন বাদে নুহাকে নিয়ে আমেরিকা চলে গেল আদিল। এই সময়টায় দুম করে বদলে গেল আরো অনেক কিছুই। সবাইকে ভুল প্রমাণ করে দিয়ে বইয়ের ব্যবসায় রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিলো শামীম। জলের মতো টাকা আসতে লাগল তার দোকান থেকে। ভেজা তুলোর মতো মিইয়ে থাকা তনু যেন ভোরের রোদে আড়মোড়া ভেঙে চনমনে হয়ে উঠল। বেনু চলে গেল মাদারীপুর। অনুর চাকরি হয়েছে নতুন। আগের মতোই ব্যস্ত হয়ে। পড়েছে সেও। সকলই কেমন বদলে গেল, কেবল বদলে গেলেন না একজন। তিনি সারাক্ষণ অয়নের বিছানায় মাথা রেখে মেঝেতে বসে থাকেন। অয়নের বিছানার চাদর, গায়ের কাঁথা, পরনের কাপড়, পায়ের জুতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে তার চারধারে। তার কেবল মনে হতে থাকে এইখানে অয়নের গন্ধ লেগে আছে, অয়নের গায়ের স্পর্শ লেগে আছে। তিনি বুক ভরে সেই গন্ধ নিতে থাকেন। তিনি জড়িয়ে ধরে সেই স্পর্শ নিতে থাকেন। আর খানিক বাদেই বিড়বিড় করে বলেন, অয়ন, তোর গায়ের জ্বরটা এখনো কমে নাই?

অয়ন তাকে জবাবও দেয়, এখন তো জ্বর নেই মা।

তাহলে শুয়ে আছিস কেন? ওঠ, ওঠ।

আমার উঠতে ইচ্ছে করছে না, মা।

কেন উঠতে ইচ্ছে করছে না?

আমার তোমার কাছে শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে।

আমার কাছে শুয়ে থাকলে কি হয়?

সুখ হয় মা?

সুখ কী?

যেটা অসুখ না।

তাহলে কীভাবে হবে?

তোমার কাছ থেকে দূরে গেলেই আমার অসুখ করে মা। আমার অসুখকে খুব ভয় হয়।

সালমা বেগম অয়নকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরেন, তিনি অয়নকে কোথাও যেতে দেবেন না। অয়নের অসুখকে তিনিও ভয় পান। অয়নের শার্ট, গেঞ্জি, পাঞ্জাবি, বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি তাতে নাক ডুবিয়ে ঘ্রাণ নিতে নিতে বলেন, তুই আজও গোসল করিসনি অয়ন?

অয়ন বলে, আজ কী ঠান্ডা পড়েছে দেখেছ মা? তুমিই না বলো ঠান্ডা লাগালেই আমার আবার জ্বর হবে।

তাহলে গরম পানি করে কর।

আমার গরম পানি করতে ইচ্ছে করে না মা।

সালমা বেগম উঠে গরম পানি করেন। তারপর সেই পানিতে অয়নের জামা কাপড়গুলোকে ডলে ডলে গোসল করান।

তোর গায়ে এত ময়লা কেন অয়ন?

তোমার মতো এমন ডলে ডলে গোসল করি না বলে।

কেন করিস না?

তুমি যে বলো আমার গায়ের গন্ধ রেখে দিতে। এভাবে গোসল করলে গায়ের গন্ধ থাকে!

সালমা বেগমের হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে আসে। তিনি ঝটপট অয়নের জামা কাপড়গুলো বালতি থেকে তুলে ফেলেন। তারপর সেই কাপড়গুলো রোদে মেলে দিয়ে বসে থাকেন। তার খুব সন্দেহ হতে থাকে, অয়নের গায়ে তার গন্ধ লেগে আছে তো? তিনি একবার উঠে গিয়ে জামা কাপড়গুলোয় নাক ডুবিয়ে গন্ধ শুঁকে দেখেন। আবার একবার নিজের জায়গায় এসে বসে পড়েন। তার একবার মনে হতে থাকে, তিনি ঠিক ঠিক অয়নের গায়ের গন্ধ পাচ্ছেন। আবার পরমুহূর্তেই মনে হয়, পাচ্ছেন না। অয়নের কাপড়গুলো নিয়ে তিনি তখন এ-ঘর। থেকে ও-ঘর ঘুরতে থাকেন। তনু, শামীম, অনু যাকেই সামনে পান জিজ্ঞেস করতে থাকেন, দ্যাখ তো, অয়নের গায়ের গন্ধ আছে কি-না? একটু দেখ না? দেখে বল?

.

অনুর চাকরি হতে মাস তিনেক সময় লেগেছে। তার চাকরি হয়েছে একটা বিজ্ঞাপনী সংস্থায়। সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাওয়ার পরও একদম শেষ মুহূর্তে এসে তোহা ইকরামের অফিসে তার চাকরিটি হয়নি। এই না হওয়াটা বেশ রহস্যজনক। অনু এপয়েনমেন্ট লেটারও হাতে পেয়েছিল। কিন্তু জয়েন করার মাত্র দু'দিন আগে তোহা ইকরাম তাকে ডেকে বললেন, অনু, একটা সমস্যা হয়েছে। সমস্যাটা আমি আপনাকে বলতে পারব না।

শুনলে আপনার ভালোও লাগবে না, আর আমার জন্যও বিষয়টা অস্বস্তিকর। আমি যদি আপনাকে অন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেই, তাতে কী আপনি মনঃক্ষুণ্ন হবেন?

অনুর তখন মনঃক্ষুণ্ন হওয়ার মতো অবস্থা নেই। যে-কোনো একটা চাকরি তার খুব দরকার। কিন্তু এই না জানতে পারা রহস্যময় কারণটি তাকে খুব অস্বস্তি দিতে থাকল। তার চাকরি হয়ে গেল তোহা ইকরামের এক বন্ধুর নতুন বিজ্ঞাপনী সংস্থার মার্কেটিং বিভাগে। যদিও এই কাজের কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা তার একদমই নেই। এমনকি সে এতদিন যে কাজ করেছে, তার সাথে এর দূরতম কোনো সম্পর্কও নেই। তারপরও যে তার চাকরিটি হয়ে গেল, তা শুধুমাত্র তোহা ইকরামের কল্যাণেই। বেতন খুব একটা বেশি না হলেও অফিসের জন্য কাজ জোগাড় করে দিতে পারলে কমিশনের ব্যবস্থাও রয়েছে। অনু জানে না, এই কাজটি সে কতটা কী করতে পারবে! তবে তোহা ইকরামের প্রতি মনে মনে একধরনের প্রবল কৃতজ্ঞতাবোধ তৈরি হয়েছে তার। যদিও অনু জানে, বেশিরভাগ মানুষের প্রতি যখনই তার কৃতজ্ঞতাবোধ তৈরি হয়েছে। ঠিক তখনই ধীরে ধীরে সেই মানুষটির প্রতি সে শ্রদ্ধাটা হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছে। মানুষ কেন যেন আজকাল বিনিময়বিহীন কিছু ভাবতেই পারে না। তা সে যা-ই হোক, আর সেই বিনিময়ে সে সবসময় জিততেই চায়। এটি অনুর এই এতদিনকার ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনের অভিজ্ঞতা। তোহা ইকরামের প্রতি মুগ্ধ এবং কৃতজ্ঞ হতে গিয়েও অনু তাই নিজেকে সামলে নিয়েছে।

অফিস শুরু করার তিন দিনের মাথায় তোহা ইকরাম ফোন করলেন অনুকে। কাজের খোঁজ খবর নিলেন। কোনো সমস্যা হলে তাকে জানাতে বললেন। কিছু ঠিকানা আর ফোন নম্বর দিয়ে বললেন, অনু যেন অফিসের জন্য কাজের ব্যবস্থা করতে সেসব জায়গায় যায়। অনু একবার ভাবছিল তোহাকে জিজ্ঞেস করবে সেই সমস্যাটার কথা। কিন্তু তারপর আবার নানা কিছু চিন্তা করে আর জিজ্ঞেস করা হয়নি। এই নিয়ে মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি সবসময়ই ছিল। তবে মাসখানেকের মাথায় সেই রহস্য যেন কিছুটা ভাঙলো। এক রাতে তাকে ফোন দিলো অদিতি, কী রে কেমন আছিস?

অনু তখন কেবল অফিস থেকে ফিরেছে। সে ক্লান্ত গলায় বলল, হ্যাঁ, ভালো। তুই?

আমার আর খবর!

কেন কী হয়েছে?

জীবনটা কেমন ঘরবন্দি হয়ে গেল। তোর মতো চাকরি-বাকরি করতে পারতাম। একটা স্বাধীন জীবন।

চাকরি-বাকরি কী স্বাধীন না-কি?

নয়তো কী? যখন যা ইচ্ছে করা যায়।

কই, আমি তো কিছুই পারি না।

তুই আবার পারিস না? আমার তো মনে হয় তুই পারিস না, এমন কোনো কাজ নেই।

এটা কেন মনে হয়?

এই যে কত কিছু করিস। সবকিছু একহাতে সামলে নিস, ম্যানেজ করে ফেলিস।

অনু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কিছুই পারি না রে।

সে তো কেবল ওই বিয়েটাই পারলি না, আর সবই তো ঠিকঠাক করে ফেললি। তা ওটা না হয়ে ভালোই হয়েছে, তাহলে কী এমন যখন যা ইচ্ছে করতে পারতি? এই যে চাকরি চলে গেল, আবার কেমন কেমন করে নতুন একটা চাকরিও পেয়ে গেলি?

চাকরি চলে যায়নি, আমি ছেড়ে দিয়েছি।

অদিতি হাসলো, একবার হয়েছে কী শোন, পাশ করেই চাকরিতে ঢুকেছি, তিন মাসের প্রাইমারি কন্ট্রাক্ট। ভালো করলে পারমানেন্ট হবে। আমরা তেরোজন একসাথে ঢুকলাম। তো ওই কাজের তো আমি কিছু বুঝি না। শেষে বারো জনের কন্ট্রাক্টই রিনিউ হলো। একমাত্র বাদ পড়লাম আমি। এখন? সবাইকে কী বলব? বললাম যে ওই চাকরি আমার ভালো লাগে না। তাই অফিস কন্ট্রাক্ট রিনিউ করতে চাইলেও আমিই বাদ দিয়ে দিয়েছি।

অদিতি কথা শেষ করেই হাসলো। অনু বলল, তোর ধারণা, আমি মিথ্যে বলছি?

ধুর, আমি কী তা বলেছি না-কি? আচ্ছা, এখন নতুন চাকরি কোথায় হয়েছে?

একটা অ্যাড এজেন্সিতে, মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ।

এই বয়সে অ্যাড এজেন্সিতে, তাও আবার মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ? বুঝিস কিন্তু...।

কী বুঝবো?

মেয়েদের একটু বুঝে শুনে চলতে হয়, বুঝলি?

হুম, বুঝলাম।

তোর অবশ্য বুঝে শুনলে চললে তো হবে না, তোর হচ্ছে কাজ উসুল দিয়ে কথা। বুঝে শুনে চললে এভাবে যখন তখন জব-টবের ব্যবস্থাও তো হয়তো হতো না, তাই না?

অনুর হঠাৎ মনে হলো অদিতি তাকে কিছু ইঙ্গিত করছে। সে বলল, মানে?

কোনো এক্সপেরিয়েন্স ছাড়াই এই বয়সে এসে হঠাৎ করেই এভাবে ট্র্যাক চেঞ্জ করা তো সহজ নয়। সবাই পারে না। তুই পেরেছিস, রহস্যটা কী বলতো?

কী রহস্য?

মানে একেবারে কোনো স্ট্রং রেফারেন্স ছাড়া তো আর সম্ভব নয়। তা রেফারেন্সটা কে বলতো?

অনু কথা বলল না। অদিতিই বলল, সেদিন তোহা বলেছিলে ওর সাথে–কি তোর কথাবার্তা হয়? তা ওর অফিসেই তো একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারতো। তুই আমাকে বলতে না পারলেও ওকে তো বলতে পারতিস?

অদিতির খোঁচাটা এবার খুব বেশি সরাসরি। তার কাছে না বলে তোহার কাছে চাকরির বিষয়ে কথা বলার জন্য অদিতি বিষয়টি ভালো ভাবে নিতে পারেনি। অনু এতক্ষণে বুঝতে পারল ঘটনা। সেদিন আর তাদের কথা হলো না। অনু একবার ভাবছিল তোহার সাথে বিষয়টি নিয়ে সরাসরি কথা বলবে। কিন্তু এতে অদিতির সাথে তোহার সম্পর্কটা যদি আরো খারাপ হয়ে যায়। তাছাড়া এটা একভাবে অদিতির নামে তোহার কাছে অভিযোগ করাও। এইসব সাতপাঁচ ভেবে শেষ পর্যন্ত নিবৃত রইল সে। তবে পুরো বিষয়টি খুব বাজেভাবে স্পষ্ট হলো তারও মাস দুই পরে।

সন্ধ্যাবেলা অফিসে জরুরি একটা কাজ করছিল অনু। এই সময়ে অদিতির ফোন। অনু ফোন ধরে বলল, আমি তোকে কিছুক্ষণ পরে ফোন দেই অদিতি?

অদিতি কেমন করে হাসলো, কেন? ডেটিংয়ে না-কি?

অনু আর কথা বাড়ালো না। সে ফোন রেখে যতক্ষণে কাজ শেষ করলো, ততক্ষণে রাত হয়ে গেছে। পরদিন শুক্রবার হওয়াতে রাস্তায় ভয়াবহ জ্যাম। অনু ভাবলো বাসায় গিয়ে ধীরে সুস্থে অদিতিকে ফোন করবে। জ্যাম ঠেলে বাসে করে বাসায় ফিরতে রাত হয়ে গেল অনেক। গোসল, খাওয়া সেরে অদিতিকে ফোন দিতে গিয়ে রীতিমত ভড়কে গেল অনু, প্রায় কুড়িটিরও বেশি মিসড কল উঠে আছে ফোনে। বাসে থাকায় টের পায়নি সে। কিন্তু অদিতি তাকে এতগুলো ফোন কেন দিলো? অনু তড়িঘড়ি ফোন দিতেই অদিতি বলল, কী, রসলীলা ভঙ্গ হলো তাহলে?

অনু অবাক গলায় বলল, মানে কী অদিতি?

মানে কী অদিতি না? নিজের ঘর হচ্ছে না বলে এখন অন্যের ঘরও থাকবে না? এখন যাদের ঘর আছে, তাদের ঘরও ভাঙতে হবে?

অনু হতভম্ব হয়ে গেল। সে বলল, কী হয়েছে অদিতি?

এমন ভান করছিস যে কিছু জানিস না?

অনুর হঠাৎ মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। সে শক্ত গলায় বলল, যা বলার স্পষ্ট করে বল।

তুই দুদিন পরপর তোহাকে ফোন দিস ঘটনা কী? তোহা প্রথম প্রথম আমাকে যখন বলেছিল, তখন সাদা মনে বিষয়টিকে পাত্তা দেইনি। কিন্তু তলে তলে তুই যে এতটা এগুবি, সেটা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারিনি। বান্ধবী হয়েও এত বড় ক্ষতি কী করে করলি?

অনুর রাগটা হঠাৎ পড়ে গেল। সে হাল ছেড়ে দেয়া মানুষের মতো হতাশ ভঙ্গিতে বলল, আমি কী কী করেছি তুই বল, আমি একটু শুনি?

এমন ভাব করছিস যেন কিছু জানিস না। তোহা যেদিন বলেছিল যে তার অফিসে তুই চাকরি চাইছিস, সেদিনই আমার মনে কামড় দিয়েছিল। জীবনে এরকম মেয়ে মানুষ তো আর কম দেখলাম না অনু। এরা সবসময় সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে। আর দোষ হয় পুরুষ মানুষের। এরা সুযোগ নিলে দোষ নাই, আর পুরুষ মানুষ যদি দেয়ার বদলে কিছু নিতে যায়, তখনই তাদের দোষ। সেদিনই তোহাকে পইপই করে বলে দিয়েছিলাম, ভুলেও যেন এই কাজ না করে। পরে কী না কী বদনাম উঠবে, সাবধান! আমরা তো একটা ভদ্র সমাজে বাস করি না-কি? আগের অফিসেও তো খুব নাম করে আসিসনি। কোনো কিছুই চাপা থাকে না বুঝলি, বাতাসে সবই ভাসে।

অনুর প্রচণ্ড হতাশ লাগছে। তার সম্ভবত রাগ লাগা উচিত। কিন্তু তার একটুও রাগ হচ্ছে না। সে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, আর কিছু বলবি অদিতি? আমি ফোনটা রাখবো।

তা তো রাখবিই। আমার জামাইর মাথাটা চিবিয়ে খাওয়া তো শেষ, এখন আর আমাকে লাগবে কেন? তা নতুন চাকরি যে করছিস, সেটা কী করে বাগালি? তোহা যে দিয়ে দিয়েছে, তা তো জানি। কিন্তু বিনিময়ে তোহাকে তুই কী দিলি?

অনু নির্বিকার গলায় বলল, সব দিয়ে দিয়েছি অদিতি।

আচমকা অনুর এমন কথা নিতে পারল না অদিতি। সে ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া গলায় বলল, সব দিয়ে দিয়েছিস মানে? কী সব দিয়ে দিয়েছিস? তোর লজ্জা করছে না অনু? তোর মুখে কিছু আটকাচ্ছে না? আটকাবে কী করে! লজ্জা শরম থাকলে তো কেউ এমন কাজ করতে পারে না।

অনু রান্না ঘরে এসে ফিল্টার থেকে গ্লাসে পানি ঢাললো। তারপর সময় নিয়ে সেই পানি খোলো। তারপর ওড়নায় মুখ মুছতে মুছতে নির্বিকার গলায় বলল, আমি পারি।

অনুর আচরণে অদিতি রীতিমত হকচকিয়ে গেল। সে হতভম্ব গলায় বলল, তুই এখন কই? তোহা তোর সাথে? কোথায় তোরা, আমাকে বল? তোহা গত দুই দিন ধরে আমার ফোন ধরছে না। ধরলেও ঠিকমতো কথা বলছে না। বাসায় আসছে না। আমি জানি সে তোর সাথে আছে। তুই আমাকে বল, তোরা কোথায় আছিস? অনু, আমি কিন্তু পুলিশে খবর দিবো।

উঁহু।

উঁহু মানে?

পুলিশে খবর দিস না।

নাহ্, আমি পুলিশেই খবর দিবো। আমার বড় মামা রমনা থানার ওসি। আমি এখুনি তাকে ফোন দিবো, এখুনি।

তুই বরং এক কাজ কর, ডাক্তার খবর দে। তোর ইমার্জেন্সি ট্রিটমেন্ট দরকার অদিতি।

অনু ফোন রেখে দিলো। ফোন রেখে মনে হলো, বিষয়টি নিয়ে তোহা ইকরামের সাথে কথা বলা ছাড়া আর উপায় নেই। এই যন্ত্রণা আর ভালো লাগছে না তার। অয়নের বিছানাটার দিকে তাকাতে অনুর খেয়াল হলো, বাসায় আসার পর থেকে সে মাকে দেখেনি। তনুর ঘর, ড্রইংরুম কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না সালমা বেগমকে। বারান্দা এবং বাইরের দরজা খোলা। অনু প্রথমে বারান্দায় গেল, সেখানে সালমা বেগম নেই। অবাক ব্যাপার হচ্ছে, পাশের বাড়ির দোতলার জানালাটা আবার বন্ধ। জানালাটার কথা সে এতদিন ভুলেই ছিল। সেই ভয়ংকর গা হিম হয়ে যাওয়া অনুভূতির কথাও। আসলে অয়নের মৃত্যুর চেয়ে বড় ভয় আর কী আছে তার জীবনে! আজকাল জীবনের আর সকল কিছুই কেমন তুচ্ছ লাগে তার কাছে। ওয়াসিমের মতো মানুষটাকে কী অবলীলায়ই না এতদিন ভুলে ছিল অনু! কিন্তু ওয়াসিমও তো এতদিনে আর একবারও তার সামনে এসে দাঁড়ায়নি! ঘরের জানালাটাও বন্ধ। ঘটনা কী?

অনু সালমা বেগমকে খুঁজতে বের হলো, কিন্তু সালমা বেগমকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। তিনি তখন মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার ছোট্ট বাস স্ট্যান্ডে বাস থেকে নামছেন। তার হাতে একটা জামা কাপড়ের পুঁটলি। সেই পুঁটলি তিনি বুকের কাছে শক্ত করে ধরে রেখেছেন। বিয়ের প্রায় চল্লিশ বছর পর এই প্রথম তিনি তার স্বামীর গ্রামে যাচ্ছেন। যদিও তিনি গ্রামের নাম জানেন না। তিনি জানেন জেলা আর উপজেলার নাম। কিন্তু কালকিনি উপজেলার এই পনেরোটি গ্রামের কোথায় তিনি তার ছেলের কবর খুঁজবেন?

সালমা বেগম বাস থেকে নামতে নামতে হেল্পারকে বললেন, বাস আর যাবে না?

না।

এইটাই লাস্ট স্টপেজ?

হ।

তিনি বাস থেকে নেমে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার হেল্পারের কাছে ফিরে এলেন। হেল্পারের নাম আক্কাছ মিয়া। আক্কাছ মিয়ার বয়স অল্প। সে সালমা বেগমের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনে যাইবেন কই?

সালমা বেগম কিছুক্ষণ হতবুদ্ধের মতোন মাথা চুলকে বললেন, অয়নের কাছে।

অয়ন কে?

আমার ছেলে।

সে কী করে?

সালমা বেগম অনেক ভেবেও বলতে পারলেন না সে কী করে! আক্কাছ মিয়া তার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। সালমা বেগম খানিক দাঁড়িয়ে থেকে আবার আক্কাছের কাছে গিয়ে বললেন, সে ঘুমায়।

আক্কাছ মিয়া মোটামুটি একটা ধাক্কা খেলো। সে অবাক দৃষ্টিতে সালমা বেগমের দিকে তাকালো। ভদ্র পোশাক আশাক পরা সুশ্রী এই নারীকে তার অসুস্থ মনে হচ্ছে না। সে হতাশ গলায় বলল, কই ঘুমায়?

কবরে।

আক্কাছ মিয়া কী বুঝলো কে জানে! সে সালমা বেগমকে নিয়ে বাস স্ট্যান্ডের ছাউনির নিচে বসালো। তারপর বলল, আপনে কই থেইকা আইছেন?

অয়নের কাছ থেকে।

কই যাইবেন?

অয়নের কাছে।

অয়ন থাকে কই?

কবরে।

কবর কই?

জানি না।

না জানলে যাইবেন কেমনে?

আমি ঘ্রাণ পাই।

কিসের ঘ্রাণ?

অয়নের। অয়নের গায়ের ঘ্রাণ আমি পাই। অয়ন আশেপাশে কোথাও আছে। সালমা বেগম চোখ বন্ধ করে অয়নের ঘ্রাণ নেয়ার চেষ্টা করছেন। আক্কাছ মিয়া বলল, খালা, আপনে এইখানে বহেন, আমি আইতাছি।

তার বাড়ি বাসস্ট্যান্ডের সাথেই। সে গিয়ে বাড়ি থেকে তার মাকে ডেকে আনলো। তার মা সব শুনে বলল, আপা, আপনে চিন্তা কইরেন না, আমরা আপনের অয়নের কবর খুঁইজা বাইর করব।

সালমা বেগম তার জীবদ্দশায় আর অয়নের কবর খুঁজে পেলেন না। তিনি অয়নের কবর খুঁজে পেলেন তার মৃত্যুর পর। সেই রাতেই তিনি ভয়াবহ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মাকে খুঁজে না পেয়ে অনুর যতটা বিচলিত হবার কথা ছিল, ততটা বিচলিত সে হলো না। বড় চাচা তোফাজ্জেল হোসেনকে ফোন করে সে বলল, আমার ধারণা মা কালকিনিতে গেছে।

সে কালকিনিতে যাবে কী করে?

আগেও সে অনেকবার বলেছিল, কালকিনিতে অয়নের কাছে গিয়ে থাকবে। শামীমের কাছ থেকে বারবার যাওয়ার উপায় জানতে চাইছিল।

তো শামীম কী গাধা না-কি যে সে বলবে?

একদিক থেকে ভালোই হয়েছে, খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। অন্য কোথাও গেলে সহজ হতো না।

তোফাজ্জল হোসেন কালকিনিতে খোঁজ পাঠালেন সেই রাতেই। কিন্তু রাতে সালমা বেগমের কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। তার খোঁজ পাওয়া গেল পরদিন সকাল নটায়, কালকিনি সদর হাসপাতালে। আক্কাছ মিয়া আর তার মা মিলে সালমা বেগমকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছে। কিন্তু তারা এখন ভয় পাচ্ছে, উপকার করতে গিয়ে না পাছে আবার কোনো বিপদে পড়ে যায়! সালমা বেগমকে তখন ঢাকা নেয়া সম্ভব না। দুপুর নাগাদ অনু আর তোফাজ্জল হোসেন আসলেন। মাদারীপুর থেকে আসলো বেনু। হাফসা অসুস্থ বলে তনু আসতে পারল না।

সালমা বেগম মারা গেলেন সন্ধ্যায়। তাকে দাফন করা হলো অয়নের কবরের পাশে। অনুর কেন যেন মনে হলো, সালমা বেগম আগেভাগেই তার মৃত্যুর কথা টের পেয়েছিলেন। আর টের পেয়েছিলেন বলেই তিনি ইচ্ছে করেই চলে এসেছিলেন এখানে। হয়তো তিনি চেয়েছিলেন, তার কবরটা যেন অয়নের কবরের পাশে হয়। তার ইচ্ছে পূরণ হয়েছে। তার কবর হয়েছে অয়নের কবরের একদম গা ঘেঁষে। অয়নের গায়ের গন্ধের জন্য তাকে আর হাহাকার করতে হবে না। তার বুক এখন থেকে ভরে রইবে অয়নের গায়ের গন্ধে।

৫

কেবল অনুর জন্যই যেন কোনো গন্ধ রইল না। না মায়ার, না মৃত্যুর। সে বাস করে সুবাসহীন এক জগতে। যেটুকুও আছে, তার পুরোটা জুড়ে জরা ও যন্ত্রণা, অন্ধকার আর একাকিত্ব।

অনেকগুলো দিন সে সেই জরা আর যন্ত্রণা, অন্ধকার আর একাকিত্বেই ডুবে রইল। তারপর আচমকা একদিন চাকরিটা ছেড়ে দিলো। তোহা অবশ্য বললেন, এটা কী ঠিক হচ্ছে?

হয়তো না।

তাহলে?

আমার জন্য কারো অশান্তি হলে আমার ভালো লাগে না ভাইয়া।

কিন্তু কিছু মানুষ অকারণেই আপনাকে অশান্তির কারণ ভাববে!

এটা অকারণ ছিল না।

কিন্তু কারণও তো ছিল না!

একটু হলেও হয়তো ছিল, এখন তাও রইল না।

কিন্তু একটা কিছু না পেয়ে ছেড়ে দিলে তো আপনি বিপদে পড়বেন।

অনু হাসলো, অভ্যেস হয়ে গেছে।

তোহা দুঃখী গলায় বললেন, আমি খুবই সরি অনু।

আমি কিছু মনে করিনি ভাইয়া।

আমি মনে করেছি। আমার প্রচণ্ড বাজে ফিলিং হচ্ছে। আসলে প্রথম যেদিন আপনি আমাকে ফোন করেছিলেন, আমি তা ভুলেই গিয়েছিলাম। কথাটা ওকে বলতেই অবাক হয়েছিল। বলেছিল, অনু কেন তোমাকে ফোন করবে? এরপর আপনার সাথে দেখা হওয়ার পর আমি ওকে জানালাম যে একটা জব খুব দরকার আপনার। সমস্যাটা এরপর থেকেই শুরু। কিন্তু এক্সট্রিম হয়েছে আপনাকে এপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠানোর পর।

আমি খুব সরি ভাইয়া, হয়তো আপনাদের সম্পর্কটাই নষ্ট করে দিলাম।

না, না। ইট উহল বি অলরাইট। কিন্তু অনু জব ছেড়ে দেয়াটাও কিন্তু সমাধান না। সে ভাবছে রেগুলার আমরা বাইরে দেখা করি, উই হ্যাভ এ সিক্রেট রিলেশন। তোহা বেশ

বিব্রত ভঙ্গিতে কথাটা বলেলো।

তাহলে সমাধানটা কী ভাইয়া?

আমি জানি না অনু। আমি খুবই লজ্জিত।

আমি কী একদিন অদিতির সাথে কথা বলব?

কাজ হবে বলে মনে হয় না।

অনু পরের মাসে চাকরি ছেড়ে দিলো। তার হাতে টাকা বলতে একটা ডিপিএস। সালমা বেগম জোর করে ডিপিএসটা করেছিলেন। সংসারের এই নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা থেকেও তিনি নিংড়ে নিংড়ে সেখানে মাস শেষে টাকা জমা দিতেন, সেই টাকা ক'টা অনুর হাতে আছে। তবে সমস্যা তাতে কমলো না। বরং নতুন যে সমস্যাগুলো অনুর সামনে এলো, অনু তা ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করেনি। সেদিন দুপুর বেলা তনু এসে বলল, বড়'পু, একটা কথা।

কী কথা?

আমরা যে চাল খাই, তা এত মোটা আর চালভর্তি কাঁকড়ও অনেক।

অনু অবাক হলেও কিছু বলল না। তনু বলল, আমি সামনের দোকানদারকে বলে দিয়েছি এই মাস থেকে ভালো চাল দিতে।

অনু তনুর দিকে না তাকিয়েই বলল, আচ্ছা।

তনু বলল, তুই টাকার কথা চিন্তা করিস না, শামীম দোকানে টাকা দিয়ে দিবে। শ্বশুরবাড়িতে তো আর সে মাসের পর মাস এমনি এমনি খেতে পারে না, তারও তো একটা মান ইজ্জতের ব্যাপার আছে।

অনু এবার তনুর দিকে তাকালো। তারপর শান্ত গলায় বলল, তোর কী হয়েছে?

কী আর হবে? ঘরটা কী স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে, দেখেছিস? বিছানায় রাজ্যের ছারপোকা। এই ঘরে কোনো মানুষ থাকতে পারে! এতদিন তো বুঝতে পারিনি। হাফসা সারা রাত কাঁদে কেন? সেদিন রাতে শামীম একটা ছারপোকা পেল। সেই থেকে শামীমও ঘুমাতে পারে না।

বিছানা রোদে শুকাতে দে।

রোদে যে শুকাতে দেব, এ বাড়ির ছাদ আছে যে ছাদে দেব?

ছারপোকার ওষুধ আছে তো।

ওসবে কিছু হয় না। এ বাসায় থাকা যাবে না আপু, বাসা ছেড়ে দিতে হবে।

অনু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, এই ভাড়ায় আর কোথাও এত বড় বাসা এখন পাওয়া যাবে না, গেলে আরো বহু আগেই ছেড়ে দিতাম। অনেকবার চেষ্টাও করেছি।

তনু কিছুটা দ্বিধামিশ্রিত গলায় বলল, ভাড়া সমস্যা না আপু। শামীম মাশাআল্লাহ এখন ভালো টাকা আয় করে, সমস্যা অন্য জায়গায়।

কী সমস্যা?

আমরা অন্য জায়গায় বাসা নিলে তুই থাকবি কোথায়? সেইখানে অবশ্য তোকেও নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু তখন শামীমদের পরিবার থেকে নানান কথা উঠবে। সেগুলো তোর ভালো লাগবে না। তাছাড়া শামীমের মাও এসে থাকবে। মাঝেমধ্যে ওর আত্মীয় স্বজনও।

কেন? আমি এখানেই থাকব, এটা নিয়ে তোর চিন্তা করতে হবে না।

তনু খানিক ইতস্তত করে বলল, একটা সমস্যা আছে আপু।

আবার কী সমস্যা?

আমি বাড়িওয়ালার সাথে কথা বলেছিলাম, উনি বলেছেন একা একটা মেয়ে মানুষকে তারা বাসা ভাড়া দিবেন না!

অনু ধাক্কা খাওয়া গলায় বলল, কে বলেছে এই কথা!

আজিজুল ভাই, বাড়িওয়ালার বড় ছেলে!

এই শহরে একা একটা মেয়ের বাসা ভাড়া পাওয়া কঠিন, অনু তা জানে। কিন্তু গত প্রায় কুড়ি বছরেরও বেশি সময় ধরে তারা এই বাসায় থাকে। এই বাসার মালিক আউয়াল মিয়ার সাথে অনুদের সম্পর্ক ছিল অনেকটা ঘরের মানুষের মতো। তিনি মারা যাওয়ার পর তার ছেলেদের সাথেও তাদের সম্পর্ক ভালো। তারা কেউ এমন কথা বলতে পারেন, অনুর সেটি বিশ্বাস হচ্ছে না।

সন্ধ্যায় সে বাড়িওয়ালার বাসায় গেল। আজিজুল মিয়া তখন খবরের কাগজ পড়ছিলেন। তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। এই বাড়ি ভাড়া ছাড়া তার উপার্জনের আর কোনো উৎস নেই। তিনি কাজ বলতে যা করেন, তা হচ্ছে। সারাদিন বারান্দায় বসে পত্রিকায় খেলার খবর পড়েন, আর রাত জেগে ড্রইংরুমের পুরনো শব্দহীন টেলিভিশনে খেলা দেখেন। দুই মেয়ে আর স্ত্রী যে তাকে অতি কষ্টে সহ্য করেন, তা তিনি জানেন। আজিজুল মিয়ার ধারণা, তিনি ছোটবেলায় তার মাকে যতটা ভয় পেতেন, এই বড়বেলায় এসে তার স্ত্রীকে তিনি তার চেয়েও বেশি ভয় পান।

অনুর কথা শুনে আজিজুল মিয়া বললেন, তুমি তো সবই জানো। ঢাকা শহরে গত দশ বছরে বাড়ি ভাড়া বেড়েছে কম করে হলেও দুই'শ গুণ। কিন্তু আব্বা বেঁচে থাকতে তোমাদের বাড়ি ভাড়া সেভাবে কখনো বাড়াননি। আব্বার মৃত্যুর পর যতটা সম্ভব আমরা চেষ্টা করেছি। এখন সমস্যা হয়েছে, আমার ছোট ভাই চাইছে, বাড়ি ডেভলপারদের দিয়ে দেয়া হোক। তো তখন তোমাকে বাড়ি এমনিতেই তো ছাড়তে হবে!

অনু বলল, কিন্তু ভাইয়া, এখন এই মুহূর্তে আমি এই বাসা ছেড়ে কোথায় যাব?

আশেপাশে দেখো, প্রচুর খালি বাসা আছে।

কিন্তু একা আমাকে কে বাসা ভাড়া দেবে?

এটাই আসল কথা অনু। শুনলাম তনুও তার স্বামীকে নিয়ে চলে যাবে, তখন একা তোমাকে আমরা কীভাবে রাখবো?

ভাইয়া, কুড়ি বছর ধরে আমরা এখানে আছি, এটা কোনো বিষয় না? ব্যাপারটা তো এমন না যে আমাকে আপনি চেনেন না, জানেন না!

চিনি বলেই তো এতদিন তোমরা এখানে ছিলে, নানা ঝুট ঝামেলার পরও কখনো বাসা ছাড়ার কথা বলিনি।

আপনাদের কাছে এই কারণে আমাদের অনেক কৃতজ্ঞতাও আছে ভাইয়া। কিন্তু আমি একা একটা মেয়ে এখন কোথায় যাব?

শোন অনু। এই জন্যই আমরা সবসময়ই তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, একটা বিয়ে করো। কত সম্বন্ধও আনলাম। কিন্তু তোমার সেই এক রা, তুমি এরকম বিয়ে করবে না। বাস্তবতাটা তুমি বুঝতেই চাইলে না। তোমার ভাবিও এইজন্য তোমার উপর কিছুটা বেজার। তখন বিয়েটা করে ফেললে, এই সমস্যাটা হতো? হতো না। মানুষ বিয়ে শাদি করে কী জন্য? বাচ্চা-কাচ্চা কেন জন্ম দেয়? এই যে, এই জন্যই। দিন শেষে সে একা হয়ে যাবে, তার আশে পাশে বন্ধু-বান্ধব, মা-বাবা, ভাই-বোন কেউ থাকবে না। তখন ওই নিজের স্বামী, সন্তানই তার সাথে থাকে, বুঝলে?

অনুর সাথে আজিজুল মিয়ার কথা আর এগুলো না। তবে পরদিন ভোর বেলা আজিজুল মিয়া বাসায় এলেন। তিনি অনুকে ডেকে বললেন, আসল সমস্যাটা অন্য।

কী সমস্যা?

আজিজুল মিয়া সামান্য ইতস্তত করে বললেন, আমরা চাইলেও এখানে তুমি একা থাকতে পারবে না অনু। তুমিও বিপদে পড়বে, আমরাও পড়বো।

কি বিপদ?

ওয়াসিমের কথাটা তুমি ভুলে গেছ?

অনু কথা বলল না, চুপ করে রইল। আজিজুল মিয়া বললেন, ওয়াসিম কেমন মানুষ তুমি জানো। আমার ঘরেও দুটো বড় মেয়ে আছে, এই অবস্থায় আমরাও ভয় পাচ্ছি।

অনু কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে রইল, এখানে দেয়ার মতো শক্ত কোনো যুক্তি তার কাছে নেই। আজিজুল মিয়া বললেন, তোমার সেই ঘটনাটা সবাইই কম বেশি জানে। তোমার মা নিজে ডেকে আমাকে বলেছিলেন। কিন্তু আমার কী সেই ক্ষমতা ছিল যে ওয়াসিমকে কিছু বলি?

অনু মাথা নাড়লো। আজিজুল মিয়া বললেন, যার ছিল সে বলেওছিল। ওয়াসিমকে এলাকা থেকে বেরও করে দিয়েছিল। কিন্তু সময় পাল্টাতেই ওয়াসিম আবার ফিরেও এসেছে। তুমি জানো, আগের চেয়ে তোমার প্রতি তার রাগটা এখন আরো বেশি। তাছাড়া এতদিন যার ভয়ে সে চুপচাপ ছিল, এখন। সেও তো আর নেই।

আজিজুল মিয়া সতর্ক ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে গলার স্বর নিচু করে বললেন, তুমি শুনেছ মনে হয়, জায়েদ মল্লিক খুন হয়েছে?

অনু মাথা নাড়লো, শুনেছি।

বুঝতে পারছ, জায়েদকে কে খুন করেছে?

অনু কথা বলল না। তার চোখে ভাসছে সেই রাতে কলাপসিবল গেটের সামনে ওয়াসিমের হাতের কাটা বীভৎস আঙুলগুলো।

রাতে দীর্ঘসময় অয়নের খাটটাতে একা বসে রইল অনু। এই ঘরে অয়ন নেই, মা নেই, অথচ ঘরটা দিব্যি রয়ে গেছে। সেই একইরকম ঘর, দরজা, জানালা, বিছানা, বিছানার চাদর। অয়নের টেবিল, টেবিলের ওপর থরে থরে সাজানো বই, সব অবিকল সেই আগের মতোই রয়ে গেছে। কেবল মানুষগুলোই নেই। কী অদ্ভুত, মানুষের জন্যই সব, অথচ মানুষই থাকে না, রয়ে যায় আর সবকিছু!

পরদিন তাকে হাসান ফোন করে বলল, আপনি একদম চুপচাপ হয়ে গেলেন।

বলার মতো কিছু না থাকলে মানুষ চুপচাপই হয়ে যায়।

আমার তো উল্টোটাই মনে হয়। মনে হয়, যাদের বলার থাকে না, তারাই বরং বেশি বলে, আর যাদের অনেক কিছু বলার থাকে, তারা থাকে চুপচাপ।

অনু কথা বলল না। হাসান বলল, আলতাফ ভাইয়ের ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে জানেন?

না তো!

উনি না-কি বছর কয়েক আগে এক মেয়েকে লুকিয়ে বিয়ে করে রেখেছিলেন, সেই খবর বের হয়েছে এখন। এই নিয়ে ঝামেলা। উনার স্ত্রী

অফিসে কমপ্লেইন করেছেন। সম্ভবত উনার জব নিয়েও ঝামেলা হবে।

অনু এই বিষয়ে কোনো আগ্রহ দেখালো না। সে বিরস কণ্ঠে বলল, আমার একা থাকার একটা বাসা দরকার। কিন্তু এ শহরে মেয়েদের একা বাসা পাওয়া না-কি নিষিদ্ধ। কী করি বলুন তো?

বিয়ে করে ফেলুন।

ঘর ভাড়া পেতে বিয়ে করতে হবে, কী বিশ্রি না বিষয়টা?

বিশ্রী কেন হবে? ঘর মানেই তো সংসার, পরিবার। আর পরিবারের জন্য বিয়েটা সবচেয়ে বেশি দরকার।

ঘর মানেই সংসার? সংসার বা পরিবার ছাড়া ঘর হয় না?

হয়, কিন্তু তা অনেকটা মেস বাসার মতো। সেখানে থাকা যায়, কিন্তু তাকে ঘর বলা যায় না। থাকার জায়গা অনেক হতে পারে। কিন্তু ঘর তো একটাই।

তার মানে একা মানুষের জন্য ঘর নেই?

দিন শেষে যেখানে মানুষের বারবার ফিরে আসতে ইচ্ছে হয়, সেটাই ঘর। এখন একটা দরজা, জানালা, দেয়াল কিংবা ছাদের জন্য তো আর মানুষের ফিরে আসতে ইচ্ছে হয় না। মানুষের ফিরে আসতে ইচ্ছে হয় মানুষের জন্য। ঘরে যদি মানুষই না থাকল, তাহলে সেখানে তো মানুষের ফিরে আসার ইচ্ছেটাই থাকে না। আর যেখানে ফিরে আসতে ইচ্ছে হয় না, সেটা ঘর হয় কী করে!

কথাটা খুব ভাবালো অনুকে। একটা ঘর! এই ঘর কী অদ্ভুত এক শব্দ। কোথায় যেন স্নিগ্ধ, মিহি একটা মায়া লেগে আছে। এই যে ঘর, এই ঘরটায় সেই মায়া লেগেছিল। ওখানে অয়ন থাকত, এখানে বিছানার পাশে মা। ওই। পাশের ঘরটায় তনু, হাফসা। অনু যেখানেই থাকত, জানতো, মা তার অপেক্ষায়। আছে। ওখানে দরজাটা খুলতেই অয়নের বিছানাটা, এখানে মায়ের। এখনো। তেমনই আছে সব, কেবল মা নেই, অয়ন নেই। বুকের ভেতরটা কেমন করে। অনু অবশ্য কেমন করে ওঠার আগেই চাপা দিয়ে রাখে। কিন্তু হাসান তো ভুল। কিছু বলেনি। এই যে ঘর, এই ঘরে তো তার আর ফিরে আসতে ইচ্ছে হয় না। এখনো ঘরের কথা ভাবলেই তার মাথায় ভাসে সেই আগের ঘরখানা। অথচ দুটো একই ঘর। সেই একই দরজা, দরজার খিল, বিছানা, বালিশ। কিন্তু এখানে তার আর ফিরে আসতে ইচ্ছে হয় না। এই ঘরখানা যেন ঘর নয়, এ যেন আসলেই কেবলই থাকার জায়গা।

অনু এতদিন চাকরি খোঁজা নিয়ে খুব তটস্থ ছিল। কিন্তু এখন একটা থাকার জায়গা হয়ে গেল তার আসল দুশ্চিন্তা। সে পরদিন আজিজুল মিয়ার কাছে গিয়ে বলল, আমাকে কী আরেকটা মাস সময় দেয়া যায়?

আজিজুল মিয়া চিন্তিত মুখে বললেন, তোমার ভাবিকে ম্যানেজ করতে হবে। সে ওয়াসিমের বিষয়টা নিয়ে খুব চিন্তিত। জায়েদকে খুনের সন্দেহে পুলিশ তাকে খুঁজছে, এই জন্য আপাতত কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে আছে সে। তোমার ভাবি চাইছিল, এই সময়টাতেই যদি বিষয়টা চুকে যেত!

রাতভর ঘুম হয় না অনুর। কী সব এলোমেলো ভাবনা সারাক্ষণ মাথার ভেতর ঘুরতে থাকে। সবচেয়ে বাজে যেটা হয় সেটা হলো প্রায়ই ঘুমের ঘোরে সে ডান হাত বাড়িয়ে মাকে ধরতে চায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তার খেয়াল হয়, মা নেই! একটা বিশ্রী কাঁপুনি দিয়ে ঘুমটা ভেঙে যায় তখন। তারপর বাকি রাত। আর ঘুম হয় না। মার সাথে খুব কথা বলতে ইচ্ছে হয় তখন। অয়নের সাথেও। আচ্ছা, অয়ন আর মায়ের কী এখন কথা হয়? অনুর মাঝেমধ্যে মরেও যেতে। ইচ্ছে হয়। ইচ্ছে হয় মা আর অয়নের পাশে শুয়ে থাকতে। সে কোনো কথা। বলবে না, কেবল শুনবে, দেখবে, মা আর অয়ন কী করে!

সেদিন মাঝরাতে ঘুম ভাঙতেই উঠে ধীর পায়ে অয়নের ঘরটাতে গেল সে। অনু আচমকা মনে হলো অয়ন খাটে শুয়ে আছে। প্রথম ভাবলো, সে ভুল ভাবছে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হলো, ঘটনা সত্যি। কিন্তু অয়নের খাটের কাছে যেতে সাহস হলো না অনুর। অয়ন আছে, এই অনুভূতিটা যদি তখন না থাকে!

অন্ধকারে দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে রইল অনু। বাইরে তারস্বরে কুকুর ডাকছে। আজকাল এই বিষয়টা খুব খেয়াল করছে অনু, রাতের একটা নির্দিষ্ট সময় পাড়ার সব কুকুরগুলো যেন একসাথে ডাকতে শুরু করে। এর কোনো কারণ আছে কি-না কে জানে। কিন্তু অনুর কারণগুলো জানতে খুব ইচ্ছে করে।

ভোরে আজিজুল মিয়া এলেন। তিনি এসে চুপিচুপি বললেন, শোন, তোমার ভাবির কাছে বলবে না যে তুমি এখনো অন্য কোথাও বাসা পাওনি। বলবে যে বাসা পেয়ে গেছ। কিন্তু উঠতে মাসখানেক সময় লাগবে। বুঝেছ?

অনু বলল, না, বুঝিনি।

আজিজুল মিয়া বললেন, বুঝতে হবে না। এই মাসের মধ্যে চাকরির ব্যবস্থা করো। চাকরির ব্যবস্থা না করলে সামনে মাসে কই যাবে, আমি জানি না।

অনুর অবশ্য সেই মাসেও চাকরি হলো না। মাসের শেষের দিকে আজিজুল মিয়া আবার এলনে, আর ছয়দিন আছে, সে খেয়াল আছে?

অনু বলল, আছে।

বাসা জুটেছে? চাকরির কী হলো?

অনু ম্লান হেসে বলল, কিছুই হলো না।

কিছু না হলে কেমনে হবে? এই মাসে বাসা না ছাড়লে কিন্তু তোমার ভাবি আমাকেসহ বের করে দিবে।

সমস্যা ছোট না বড় অনু জানে না, তবে বাসা ভাড়া পাওয়াটা তার জন্য বড় একটা সমস্যা হয়েই দেখা দিলো। আজিজুল মিয়া অবশ্য মাসের ঊনত্রিশ তারিখে আবার এলেন। বললেন, টেনশনের কিছু নেই। আমি আসলে তোমার ভাবিকে আরো দুইমাসের কথাই বলেছিলাম, জানি তো হুটহাট বাসাভাড়া যেমন পাওয়া যায় না, তেমনি চাকরিও পাওয়া যায় না। কিন্তু তোমাকে বলেছিলাম এক মাস, যাতে তুমি একটু সিরিয়াসলি খোঁজো। টেনশন নিয়ো না, ব্যবস্থা একটা হয়েই যাবে।

অনুর মনে হলো, সারাক্ষণ চোখের সামনে থেকেও একদম অলক্ষে রয়ে যাওয়া এই মানুষটার কোথায় যেন তার জন্য খানিকটা বিশুদ্ধ মায়া লেগে আছে। কিন্তু সেই মায়া বা মানুষ, কোনোটাকেই সে আগে কখনো খেয়াল করে দেখেনি।

বহুকাল পরে হাসানের সেই কথাটা মনে হলো অনুর। হাসান তাকে ঠিক এই কথাটিই একদিন বলেছিল। জীবন জুড়ে অনুর যে তিক্ত অভিজ্ঞতা, যে অজস্র দুঃসহ স্মৃতি, তা তাকে ধীরে ধীরে এমন একটা মানুষে পরিণত করেছে যে এখন আর সত্যিকারের ভালোবাসা পুষে রাখা মানুষটাকেও সে চিনতে পারে না।

*

অনেকদিন বাদে তোহার সাথে দেখা হয়ে গেল অনুর। সে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিল মহাখালি রেলগেট, এই সময়ে তোহা তার সামনে গাড়ি থামালেন। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, কোথায় যাবেন?

অনু বলল, বাসার দিকেই যাব।

যা ভিড়, বাস কখন পাবেন তার ঠিক নেই, আমার সাথে আসুন, আমি অনেকটা দূর এগিয়ে দিতে পারব।

অনু হেসে বলল, বাস পেয়ে যাব ভাইয়া, আপনি ভাববেন না।

আমি কম ভাবি অনু। ভাবলে কতকিছু করাই যে আটকে যেত, আপনি আসুন। কিছু কথাও ছিল।

অনু কী মনে করে গাড়িতে উঠল। তোহা বলল, চাকরির কিছু হলো?

হয়ে যাবে।

আমাকে বলতে ভয় পাচ্ছেন? ভয় পাবো কেন?

হয়তো ভাবছেন, জোর করে একটা চাকরি দিয়ে দেব। তোহা হাসলেন, এই যে অদিতির কারণে আপনি জবটা ছেড়ে দিলেন। এটা কিন্তু আপনার সাথে গেল না।

কেন?

কারণ, আপনি তো জানেনই যে মানুষ জীবনভরই আপনাকে নিয়ে নানাকিছু বলবে, নানান কিছু ভাববে। আপনি চাইলেও মানুষের সেই ভাবনা বদলাতে পারবেন না। পারবেন?

অনু জবাব দিলো না। তোহা বললেন, আপনি তো জানেনই তাদের ভাবনাটা ঠিক নয়। সো এত গুরুত্ব দেয়ার তো কিছু নেই!

অনু হাসলো, চাইলেই কি সবকিছু ইগনোর করা যায়?

তা যায় না, কিন্তু আমাদের নিজেদের ভালো-মন্দটা শেষ পর্যন্ত আমাদেরই দেখতে হয়, অন্য কেউ দেখে দেয় না।

হুম, তা ঠিক।

একটা কথা বলি?

জি, ভাইয়া।

আমি আপনাকে বলতে ঠিক কমফোর্ট ফিল করছিলাম না বলেই বলা হয়নি। আপনি চাইলে আমি আপনার জন্য অন্য কোনো একটা জবের ব্যবস্থা করতে পারি। অদিতি জানবে না।

অনু হাসলো, আমি চেষ্টা করছি, একদম নিরুপায় হলে বলব।

তোহা খানিকটা ইতস্তত করে বললেন, আপনাকে নিয়ে আমি এত কনসার্ন কেন, নিশ্চয়ই এটা ভাবছেন?

অনু কথা বলল না। তোহা বললেন, সেটাই স্বাভাবিক। আপনাকে বলতে চাইনি, আজ বলছি। আমার আর অদিতির বিয়ের পরপরই আপনার সাথে একবার আমাদের দেখা হয়েছিল, তো সেদিন বাসায় ফিরে অদিতি আপনার অনেক গল্প করলো আমার কাছে। আপনার স্ট্রাগলের গল্প, পরিবারের গল্প, নানান কিছু। সেদিন আমার মনে হচ্ছিল, আমি যদি আপনার জন্য কিছু করতে পারতাম, এমন হয় না আমাদের? অনেকের জন্য একটা চমৎকার অনুভূতি হয়। এটা আসলে এক ধরনের সমীহ থেকে। আপনার প্রতি সেই

সমীহটা আমার আছে অনু। কিন্তু তখন আমার সামর্থ্য ছিল না, এখন আমার সেই সামর্থ্যটা আছে, অথচ দেখেন...।

ইচ্ছেটা কিন্তু অনেক বড় ব্যাপার ভাইয়া। করার ইচ্ছেটাও এক ধরনের করাই। এমনিতেও আমি আপনার প্রতি নানাভাবে কৃতজ্ঞই।

এটা কৃতজ্ঞতা-অকৃতজ্ঞতার ব্যাপার নয় অনু, এটা এক ধরনের দায়।

অনু হাসলো, দায় হলে বিপদ, এমন কতজনের দায় আপনি কাঁধে নেবেন?

তোহা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, সব দায় কী আমাদের দায় মনে হয়, অনু? হয় না। কারো জন্য হয়তো অনুভূতিটা একটু আলাদা হয়। আপনার প্রতি সেটা আমার আছে। তবে এই অনুভূতিটা আপনার প্রতি এক ধরনেরও প্রবল শ্রদ্ধাবোধও।

.

অনু বাসার গেটের কাছে এসে থমকে গেলা, আজিজুল মিয়া ভয়ার্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। অনুকে দেখেই ছুটে এসে বললেন, এতক্ষণে এলে?

কেন, কী হয়েছে?

বাড়িতে পুলিশ এসেছে।

পুলিশ! পুলিশ কেন? অনু যেন আকাশ থেকে পড়লো।

তোমার সাথে কথা বলতে চায়!

অনু হতভম্ব গলায় বলল, আমার সাথে? আমার সাথে পুলিশের কী কথা!

মনে হয় জায়েদের খুনের বিষয়ে কথা বলতে চায়।

অনু সত্যি সত্যি ভড়কে গেছে। সে বলল, জায়েদের খুনের ব্যাপারে আমার সাথে কী কথা!

তা তো আমি জানি না, তোমার ভাবি আমার উপর রেগে আগুন। তার ধারণা আমার জন্যই এসব হচ্ছে, আমার কারণেই তোমাকে এখনো এখানে থাকতে দেয়া হচ্ছে।

অনু নিজেকে খানিকটা ধাতস্ত করে নিয়ে বলল, ওনারা এখন কোথায়?

আমার বাসায়।

অনুকে পুলিশের সাথে থানায় যেতে হলো। স্ত্রীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে হলেও আজিজুল মিয়া গেলেন অনুর সাথে। পুলিশ অফিসারের নাম ফোরকান আলী। ফোরকান আলীর

মাথার চুল ছোট করে ছাটা। চিমসানো মুখে হালকা দাড়ি। চেহারার সাথে বেমানান ভূরি। তবে সে পুলিশ অফিসার হিসেবে যথেষ্টই বিনয়ী ও হাসিখুশি। সে বলল, ওয়াসিমের সাথে আপনার সম্পর্ক কতদিনের?

অনু বলল, ওনার সাথে আমার সম্পর্ক থাকবে কেন?

সম্পর্ক মানেই বিশেষ কিছু না। চেনাজানাও তো একটা সম্পর্ক। সেই চেনাজানার সম্পর্ক কতদিনের?

বছর তিনেক।

কীভাবে হলো চেনাজানাটা?

অয়নের মাধ্যমে।

অয়ন কে?

অয়ন আমার ছোট ভাই।

সে কোথায়?

নেই, মারা গেছে।

কীভাবে?

ক্যান্সার হয়েছিল।

ফোরকান আলী কিছুক্ষণ আফসোসের ভঙ্গি করলেন। তারপর বললেন, তার সাথে ওয়াসিমের পরিচয় কীভাবে?

ওনার একটা কোচিং সেন্টার ছিল, সেখানে অয়ন পড়ত।

পড়তে গিয়ে পরিচয়, না পরিচয়ের সূত্র ধরে পড়তে যাওয়া?

অনুর ভয়ের চেয়ে বিরক্ত লাগছিল বেশি। সে বলল, দুটো একই সাথে।

একই সাথে মানে? ঘটনা কী খুলে বলা যাবে?

অনু বলল, যাবে। অয়ন তখন কেবল ক্লাস টেনে উঠেছে। তাকে তখন কোচিং বা প্রাইভেট টিউশন দেয়ার মতো অবস্থা আমাদের নেই। সেই সময়ে একদিন সন্ধ্যাবেলা বাসায় এসে অয়ন বলল, আমাদের পাশের বাসার ওয়াসিম ভাই নামে একজন তাকে তার কোচিংয়ে বিনা টাকায়ই ভর্তি করিয়ে নিয়েছে। কোচিংয়ের একটা ব্যাগও দিয়েছে ফ্রি, এই নিয়ে সে খুব এক্সাইটেড ছিল।

আপনি ছিলেন না?

আমি কেন থাকব?

না মানে, ওরকম অবস্থায় এমন একটা সুযোগ পাওয়া তো কম কিছু নয়!

নাহ্, আমি বরং কিছুটা সতর্কই ছিলাম।

কেন?

আমার বাবা নেই, বাবা নেই মেয়েদের সতর্ক থাকতে হয়।

তারপর কী হলো?

তারপর আর কী হবে?

দেখুন অনু, একদম এমনি এমনিই তো আর আপনাকে আমরা ডেকে আনিনি। কিছু খোঁজ খবর তো আমরাও নিয়েছি, তাই না? সমস্যা হচ্ছে, অনেক সময় এমন হয় না যে, যা শুনেছি তাতেও অনেক ফাঁক-ফোকড় থেকে যায়? আপনাকে এইজন্যই ডাকা, আপনার ইনফর্মেশনের সাথে আমাদের ইনফর্মেশনগুলো একটু মিলিয়ে দেখা।

ফোরকান আলী থামলেও অনু কথা বলল না। ফোরকান আলীই আবার বললেন, আপনি হয়তো শুনেছেন যে জায়েদ মল্লিক খুন হয়েছে। পুলিশ সন্দেহ করছে, এতে ওয়াসিমের ইনভলভমেন্ট আছে। কিন্তু পুলিশের কাছে শক্ত কোনো এভিডেন্স নেই। আর ওয়াসিমও লাপাত্তা। এখন আপনার সাথে এই দুইজনেরই একটা ভালো যোগাযোগ ছিল, তাই আপনাকে ডাকা। হয়তো আপনি কোনোভাবে আমাদের হেল্প করতে পারবেন। কারণ, আমরা যদুর জানি, এই দুজনের মধ্যে আপনাকে নিয়েই একটা বড় কনফ্লিক্ট তৈরি হয়েছিল!

অনু কী বলবে বুঝতে পারছে না। তবে এটা বুঝতে পারছে, সে বড় একটা ঝামেলার সাথে জড়িয়ে পড়েছে।

ফোরকান আলী বললেন, ওয়াসিমের মতো একটা মানুষ আপনার ভাইকে বিনা পয়সায় কোচিংয়ে ভর্তি করিয়ে নিলো। আর তার পরপরই আপনার সাথে তার একটা সম্পর্কও তৈরি হয়ে গেল। আপনি তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছু খোঁজ খবর নেবেন না? কিছু জানাশোনার চেষ্টা করবেন না?

আপনি বারবার একই কথা বলছেন।

কী?

আমার সাথে ওনার সম্পর্ক নিয়ে। আমি আগেই বলেছি, ওনার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না। ওই চেনাজানাটুকুই। অয়ন আমাকে বলেছিল যে উনি আমাদের পাশের বাসারই। তবে প্রায় বছর দশ বারো আগে মালয়েশিয়া চলে গিয়েছিলেন। দেশে ফিরে এসে কোচিং সেন্টার দিয়েছেন। সাথে নানান ধরনের বিজনেসও।

আপনাদের পাশের বাসার হওয়া সত্ত্বেও আপনি তাকে চিনতেন না?

না, চিনতাম না, হয়তো আগে কখনো খেয়াল করিনি। আমি আমার নিজের জীবন, নিজের ফ্যামিলি নিয়ে নানা ঝামেলায় থাকি। তাছাড়া শুনেছি উনি দীর্ঘদিন দেশের বাইরেও ছিলেন।

উনি যে আগে একাধিক বিয়ে করেছিলেন, একজন স্ত্রী মারাও গেছিলেন, সে বিষয়ে কিছু জানতেন? মানে লোকটা যে ভায়োলেন্ট, সেটা জানতেন কি না?

ওটা পরে শুনেছি। অয়নের সাথে পরিচয়ের পর থেকে উনি হুটহাট আমাদের বাসায় চলে আসতেন। বিষয়টা আমার পছন্দ ছিল না। মা, আমি তাকে নানাভাবে বারণও করেছিলাম, কিন্তু উনি শোনেননি।

শুনতেন না কেন?

আপনার তো জানার কথা যে, উনি খুবই প্রভাবশালী। এলাকায় ওনার ইনফ্লুয়েন্সও খুব। তো আমরা তাকে ভয়ও পেতাম। একদিন আমাদের নিচতলার ভাড়াটিয়া আপু আমাকে ডেকে সতর্ক করে দিলেন। তিনি বললেন, এই লোক কিন্তু ভয়ংকর খারাপ লোক। যতটা পারো এর থেকে দূরে থাকো। মেয়েদের দেখলেই ছোঁকছোঁক স্বভাব, আর এর আগে একাধিক বিয়েও করেছিলেন। প্রথম বউকে জোর করে তুলে এনে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু সে বউ শেষ অব্দি থাকেনি। আর দ্বিতীয় স্ত্রী আত্মহত্যা করেছিল।

কীভাবে আত্মহত্যা করেছিল?

শুনেছি ফ্যানের সাথে গলায় ফাঁস লাগিয়ে।

ফোরকান আলী পকেট থেকে ম্যাচের কাঠি বের করলেন। তারপর চোখ বন্ধ করে কান খোঁচাতে খোঁচাতে বললেন, এটা শোনেননি যে উনার স্ত্রীর মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল?

সেটা জানি না, তবে আপু বলেছিলেন যে পুলিশ সন্দেহ করেছিল ওটা সুইসাইড ছিল না, খুন ছিল।

হুম, তার বিরুদ্ধে খুনের মামলাও হয়েছিল। কিন্তু তার আগেই সে পালিয়ে মালয়েশিয়া চলে যায়।

জি।

ফোরকান আলী অনেকক্ষণ আর কোনো কথা বললেন না। চোখ বন্ধ করে আরাম করে কান খোঁচাতে থাকলেন তিনি। তারপর দীর্ঘসময় পর কান থেকে বের করা কাঠিটা নাকের সামনে নিয়ে ঘ্রাণ নিলেন। দৃশ্যটা দেখে বমি পেয়ে গেল অনুর। কিন্তু যতটা সম্ভব ভাবলেশহীন হয়ে বসে রইল সে।

ওয়াসিম আপনাকে রেপ করেছিল কেন? মানে কীভাবে, ঘটনাটা জানতে চাই?

মানে! ফোরকান আলী প্রশ্ন শুনে অনু রীতিমত চমকে উঠল।

মানে, আমরা যদুর জানি ওয়াসিম আপনাকে রেপ করেছিল। যদিও অনেকে বলেন, ঘটনাটা মিউঁচুয়াল ছিল। কিন্তু আপনি ওয়াসিমকে ফাঁসাতে এটা বলেছিলেন। ঘটনাটা শুনতে চাই।

অনু কিছু বলতে যাবে, এই মুহূর্তে ফোরকান আলীর টেবিলের কোণে রাখা টেলিফোনটা বেজে উঠল। তিনি হন্তদন্ত হয়ে টেলিফোনটা ধরলেন। কিছুক্ষণ নৈর্ব্যক্তিক কথাবার্তা হলো ওপারের মানুষটির সাথে। তারপর ফোন রেখেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আমাকে এখুনি জরুরি একটা কাজে বের হতে হবে। আমি আপনাকে আবার ডাকবো। আপনার কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা আশা করছি অনু।

*

অনু ভেবেছিল পরদিনই হয়তো আবার থানা থেকে তাকে ডাকা হবে। তবে পরের এক সপ্তাহে আর তেমন কিছু ঘটলো না। শামীম বা তনুর সাথে এই নিয়ে কোনো কথা না হলেও বিষয়টি নিয়ে সবাই-ই যে কম বেশি আতঙ্কগ্রস্ত তা বোঝা যাচ্ছিল। একদিন সন্ধ্যায় আজিজুল মিয়ার স্ত্রী এলেন বাসায়। অনু ভেবেছিল হয়তো খুব কড়া বা আজেবাজে কোনো কথা শোনাবেন তিনি। তবে তেমন কিছুই হলো না। অনুর হাতে কেবল গত মাসের ভাড়া আর ইলেক্ট্রিক বিলের কাগজটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, আমাদের দিকে একটু ভেবো অনু, বড় বিপদে আছি আমরা। তুমি বাসাটা ছেড়ে দিলে খুব উপকার হয়।

অনুর নতুন বাসা পাওয়ার অপেক্ষায় আছে তনু আর শামীমও। অনুর থাকার একটা ব্যবস্থা হলেই তারা চলে যবে। শামীমের সাথে আজকাল অনুর কথা হয় না, দেখাও হয় না। সেদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। অনু বসেছিল অয়নের খাটে। তার সামনের টেবিলে এখনো অয়নের বই খাতা সারিসারি সাজানো। শামীম ঘরে ঢুকেই অনুকে দেখে সালাম দিয়ে বলল, বাসা পেলেন আপু?

এখনো পাইনি।

তাহলে?

ভাবছি হোস্টেলে উঠে যাব।

হোস্টেল? কিসের হোস্টেল?

ঢাকায় প্রচুর মহিলা কর্মজীবী হোস্টেল আছে।

শামীম একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, হোস্টেলে কেন যাবে আপু? আপনি বরং আমাদের সাথেই চলুন। তনু অবশ্য বলছিল, আপনি ওখানে হয়তো কমফোর্ট ফিল করবেন না। এইজন্য আমিও কিছু বলতে সাহস পাইনি।

অনু হাসলো, সমস্যা নেই শামীম, একটা না একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে।

আপু আরেকটা কথা।

হ্যাঁ বলো?

হাফসার জন্মদিন তো সামনেই। ভাবছি এবার জন্মদিনটা একটু ভালোভাবে পালন করব। আগে তো কখনো সেভাবে করতে পারিনি।

আচ্ছা, তোমার বিজনেস ভালো যাচ্ছে?

আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপু, এতটা ভালো আশা করিনি।

তুমি কিন্তু আমাকে চমকে দিয়েছ শামীম। আমি একদম ভাবিনি, বরং ভয়েই ছিলাম।

শামীম হাসলো, পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই আপু। তাছাড়া আপনার দোয়াও তো আছে।

হাফসার জন্মদিন পালনের জন্য শামীম কতগুলো রেস্টুরেন্টের নাম বলল। অনু মৃদু হেসে বলল, আমি তো এইসব রেস্টুরেন্ট সম্পর্কে জানি না শামীম। তুমিই খোঁজ নাও। খোঁজ নিয়ে দেখো, কোথায় ভালো হয়।

শামীম বলল, আচ্ছা আপু।

.

অনুকে থানা থেকে ডাকা হলো তার পরদিন। ফোরকান আলী কোনো ভূমিকা না করে সরাসরি বললেন, রেপের ঘটনাটা বলুন, আপনি কেন পুলিশের কাছে না এসে অভিযোগটা জায়েদ মল্লিকের কাছে করলেন?

অনু জবাব দেয়ার আগে দীর্ঘক্ষণ চুপ করে রইল। ফোরকান আলী আবার বললেন, পুলিশের কাছে কিছু লুকাবেন না প্লিজ। আপনাকে একটা কথা বলি, জায়েদ মল্লিকের খুন খুবই বড় একটা ইস্যু। আমরা এতদিন ইনভেস্টিগেশন করেছি। এই ঘটনার সাথে অনেক কিছুই ইনভলভড, আপনিও। আমরা চাই না, এ নিয়ে আপনি কোনো বিপদে পড়েন। তবে আমরা আপনার কাছ থেকে সত্যিটা জানতে চাই।

রেপের ঘটনা সত্যি না।

সত্যি না?

না।

তাহলে আপনি জায়েদ মল্লিকের কাছে ওয়াসিমের বিরুদ্ধে রেপের অভিযোগ কেন করেছিলেন?

আমি রেপের অভিযোগ করিনি। কারণ এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

কিন্তু আমাদের কাছে তথ্য আছে, আর তাতে এমনটাই আছে। আপনাকে আপনার বাসায়ই একা পেয়ে ওয়াসিম রেপ করে। আর সেই অভিযোগ আপনি করেছিলেন জায়েদ মল্লিকের কাছে। জায়েদ মল্লিক তখন পাওয়ারফুল ছাত্র নেতা। দল ক্ষমতায়। তিনি আপনার অভিযোগের কারণেই ওয়াসিমের সাথে কনফ্লিক্টে যান?

রেপের ব্যাপারটা সত্যি না এবং আমি এমন অভিযোগও করিনি।

দেখুন অনু, পুলিশের কাছে এসে লজ্জায় কিছু লুকিয়ে রাখা, অনেকটা ডাক্তারের কাছে গিয়ে রোগ লুকিয়ে রাখার মতো ব্যাপার। এতে রোগ না সেরে বরং বাড়বে।

আমি কিছু লুকাচ্ছি না। তাছাড়া...।

তাছাড়া কী?

তাছাড়া কেউ রেপড হলে, সেটি তার জন্য লজ্জার কিছু হওয়ার কথা না, লজ্জার হওয়ার কথা রেপিস্টের জন্য।

ফোরকান আলী হাসলেন, ওসব তত্ত্বের কথা বাদ দিন। আপনিও জানেন, আমিও জানি, বাস্তবতা ভিন্ন। রেপিস্ট বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়, আর ভিকটিম লজ্জায় সুইসাইড করে বা মুখ দেখাতে পারে না, তাই না?

অনু কথা বলল না। ফোরকান আলী বললেন, আপনি যদি রেপডই না হবেন, তাহলে এমন কথা রটলো কেন? কিছু না কিছু নিশ্চয়ই ঘটেছিল, সেটা কী?

অনু বুঝতে পারছে, যতই অস্বস্তিকর হোক, তাকে পুরো ঘটনাই খুলে বলতে হবে। সে বলল, ওয়াসিমের কোচিং সেন্টার নিয়ে অনেক আজেবাজে কথা শোনা যেত, জানেন বোধহয়?

কী কথা?

এই যে তার কোচিং সেন্টারটা আসলে একটা আই ওয়াশ ছিল, এমনকি অন্যান্য বিজনেসও। উনি আসলে এসবের আড়ালে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিগুলোতে ইয়াবা সাপ্লাই দিতেন, নানান ড্রাগস বিক্রি করতেন?

আচ্ছা?

তাছাড়া নিচতলার আপুর কাছ থেকে ওনার সম্পর্কে ওসব শোনার পর থেকে আমার খুব ভয়ও হতে লাগল। আমি তখন হঠাৎ একদিন অয়নের কোচিংয়ে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। সমস্যাটা সেই থেকে তৈরি। উনি এরপর যখন তখন যেখানে সেখানে পথ আটকাতেন। জানতে চাইতেন অয়নের কোচিং কেন বন্ধ করে দিলাম। নিশ্চয়ই লোকজনের কাছ থেকে ওনার সম্পর্কে অনেক আজেবাজে কথা শুনেছি, সেসব আমাকে বিশ্বাস করতে নিষেধ করলেন।

আপনি কী বললেন?

আমি কিছু বলিনি। কিন্তু অয়নকে আর কোচিংয়ে দেইনি। এরমধ্যে একদিন সন্ধ্যায় উনি আমাকে বাসার সামনে পথ আটকালেন। বললেন, আমার নামেও উনি না-কি কীসব আজেবাজে কথা শুনেছেন। কিন্তু সে সব কথা তো উনি বিশ্বাস করেন না। তাহলে আমি কেন তার নামে শোনা কথা বিশ্বাস করি?

আপনার নামে কি আজেবাজে কথা শুনতেন?

অনু এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে সামান্য থমকালো। তারপর বলল, আমি যখন অনেক ছোট তখন আমার বাবা মারা যান। আমার ছোট আরো দুই বোন আর ভাই অয়ন। তো অনেক বছর থেকেই ওদের পড়াশোনা, পরিবারের সকল রেসপিন্সিবিলিটি সবকিছু আমাকেই দেখতে হয়। দিনরাত খাটতে হতে, সকাল সন্ধ্যা পরিশ্রম করতে হতো। এমনও হয়েছে সারাদিন অফিস শেষ করে রাতে এসে আবার টিউশন করিয়েছি। বাসায় ফিরতে ফিরতেও অনেক রাত হয়ে যেত। তো উনি খুব বাজে ইঙ্গিত করে বললেন, আমি কীভাবে কী করি, কী করে সংসার চালাই, কীভাবে টাকা উপার্জন করি, এসব উনি জানেন। চাইলে ওনার কাছ থেকেও আমি টাকা নিতে পারি!

আচ্ছা, তো সেদিন সন্ধ্যায় আসলে কী ঘটেছিল?

বলছি, তো এরপর থেকে ওনার যন্ত্রণা বাড়তেই থাকল। সেদিন সন্ধ্যায় আমি বাসায় একা। অয়ন আর মা মামার বাসায় গিয়েছিল বিকেলে। কলিংবেলের শব্দ শুনে আমি ভাবলাম ওরা বোধহয় চলে এসেছে। কিন্তু দরজা খুলতেই দেখি ওয়াসিম দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। আমাকে দেখেই বললেন, বাসায় তো কেউ নাই, আপনি একা, তাই সঙ্গ দিতে এলাম।

ওয়াসিম কী করে জানলো যে আপনি বাসায় একা?

অয়ন গলির মুখে সিএনজি আনতে গিয়েছিল, তখন তার কাছ থেকে শুনেছে যে ও আর মা মামার বাসায় যাবে, ফিরতে রাত হবে। অয়ন তখন কেবল ক্লাস টেন-এ পড়ে। অতকিছু বোঝেওনি। ওনাকে দেখে আমি খুবই ভয় পেয়ে গেলাম। দু'হাতে দরজা আগলে দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু উনি এক পা বাড়িয়ে দিয়ে দরজার পাল্লা আটকে দিলেন।

তারপর?

আমি বুঝতে পারছিলাম, আমাকে শান্ত থাকতে হবে। মা আসা অব্দি যতটা সম্ভব সময় কাটাতে হবে। আমি ওনাকে খুব স্বাভাবিকভাবেই ড্রইংরুমে বসিয়ে রান্না ঘরে চা বানাতে গেলাম। আমি চেষ্টা করছিলাম সময় নষ্ট করতে। কিন্তু এটা উনি আঁচ করতে পেরেছিলেন। আচমকা রান্না ঘরে গিয়ে আমাকে জাপটে ধরলেন। উনি ভেবেছিলেন আমি চিৎকার চেঁচামেচি কিছু করব। কিন্তু আমি তেমন কিছুই করলাম না।

কেন?

কারণ বাইরে তখন কোনো বাড়িতে প্রচণ্ড শব্দে মাইক বাজছিল। আর আমি জানতাম উনার সাথে শারীরিক শক্তিতে আমি পারব না। ফলে ধস্তাধস্তি করে লাভ নেই। অন্য কোনো উপায় খুঁজে বের করতে হবে। আমি যতটা সম্ভব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছিলাম। আমি ওনাকে খুব স্বাভাবিকভাবে বললাম, আপনি ড্রইংরুমে গিয়ে বসুন, আমি আসছি।

উনি শুনলেন?

নাহ্। উনি আমাকে টেনে হিঁচড়ে ড্রইংরুমে নিয়ে গেলেন। তবে আমার আচরণে উনি কিছুটা কনফিউজড হয়ে গিয়েছিলেন। উনি ভেবেছিলেন, আমি উনার সাথে শক্তি খাটাবো, ধস্তাধস্তি করব। কিন্তু আমি সেসব কিছু না করায় উনি বেশ কনফিউজড ছিলেন। আমাকে ধাক্কা দিয়ে ড্রইং রুমের বিছানাটায় ফেলে দিলেন। হঠাৎ টেবিলের কোণায় লেগে আমার কপাল অনেকটাই কেটে গেল। আমার মুখ, কপাল, সাদা বিছানার চাদর রক্তে মাখামাখি হয়ে যাওয়ায় উনি কিছুটা ভড়কে গেলেন।

তারপর?

আমি সেন্সলেসের মতো পড়ে রইলাম, উনি অনেকবার ডাকলেন। কিন্তু আমি সাড়া দিলাম না। আমি আসলে তখনো চাইছিলাম, যতটা সম্ভব সময় কাটিয়ে দিতে, যদি এর মধ্যে মার আর অয়ন ফিরে আসে। কিন্তু ততক্ষণে তিনি অধৈর্য আর হিংস্র হয়ে উঠতে শুরু করলেন। ওই অবস্থায়ই আমাকে তুলে বসালেন, তারপর মুখে আঘাত করতে করতে বললেন, ভান করে লাভ নেই, এইটুকুতে কিছু হয় না। কিন্তু আমার মুখের একপাশটা তখন রক্তে মাখামাখি হয়ে ঢেকে গেছে। দেখতে বীভৎস লাগছিল। উনি চাইছিলেন আগে পানি দিয়ে আমার মুখটা ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে। কিন্তু টেবিলের জগে পানি ছিল না বলে পানির জন্য উনাকে যেতে হলো রান্না ঘরে।

এই সুযোগে আপনি বের হয়ে গেলেন?

নাহ্, এটা ওনার মাথায়ও ছিল। উনি আমাকে একহাতে ধরে রান্নাঘরের দরজায় নিয়ে দাঁড় করালেন। আরেক হাতে কল থেকে জগে পানি ঢালতে লাগলেন। রান্না ঘরের দরজার সাথেই আমার ঘরের দরজা। উনি সম্ভবত ভাবছিলেন আমি সুযোগ পেলে দৌড়ে বাইরে চলে যাব, এইজন্য উনি এটা নিয়ে খুৰ সতর্ক ছিলেন, সুযোগটা আমি নিলাম। আমি আচমকা উনার হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে আমার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। শুধু যে ঘরের দরজা বন্ধু করলাম তা না, আমি এরপর বাথরুমে ঢুকে বাথরুমের দরজাটাও বন্ধ করে দিলাম। তারপর পানিভর্তি ড্রামটা টেনে এনে সেটা দিয়েও দরজা আটকে দিলাম। আমি জানতাম, উনি দুটো দরজা ভাঙার চেষ্টা করলেও ততক্ষণে আমার হাতে অনেক সময় থাকবে। এর মধ্যে মা আর অয়ন হয়তো চলে আসবে।

ফোরকান আলী যেন খানিকটা নড়েচড়ে বসলেন। সাধারণ চেহারার সাদাসিধে এই মেয়েটার কাছ থেকে তিনি সম্ভবত এমন একটা ঘটনা আশা করেননি। তিনি বললেন, ওয়াসিম দরজা ভাঙার চেষ্টা করেনি?

না করেনি। তবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নানান ভয় ভীতি দেখালেন। তারপর চলে গেলেন।

ফোরকান আলী পানির জগটা অনুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, চা খাবেন?

আমি চা খাই না।

আচ্ছা, অন্য কিছু?

অনু মাথা নেড়ে না বলল। ফোরকান আলী বললেন, কিন্তু জায়েদের কাছে আপনি তাহলে রেপের অভিযোগ কেন করলেন? আর পুলিশের কাছেই বা কেন এলেন না?

অনু প্রায় এক ঢোকে একগ্লাস পানি খেয়ে ফেলল। তারপর দম নিয়ে বলল, জায়েদের কাছে আমি রেপের অভিযোগ করিনি। ওকে আমি আগে থেকেই চিনতাম। বয়সে ছোট হলেও ওর তখন খুব একটা ভালো পলিটিক্যাল ইনভলভমেন্ট ছিল। দেখা হলে ভীষণ

ভদ্র ব্যবহার করত। মানে ওর প্রতি আমার একটা আস্থার জায়গা তৈরি হয়েছিল। মনে হয়েছিল, বিপদে পড়লে ওকে বললে হয়তো একটা হেল্প-টেল্প পাওয়া যাবে। আর সেই সন্ধ্যার ঘটনার পর ওয়াসিম রীতিমত হিংস্র হয়ে উঠল। সে যেখানে সেখানে ভয় ভীতি দেখানো শুরু করলো, নানান নম্বর থেকে ফোনে আজেবাজে মেসেজ দিত। হুমকি দিত। আরো অনেক বাজে বাজে ব্যাপার ছিল, অসহনীয়। থানা পুলিশের অভিজ্ঞতা আমার কখনো ছিল না। আমি জাস্ট ভাবলাম বিষয়টি জায়েদকে জানিয়ে রাখি। এতে হয়তো একটু হলেও এই যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবো। এইজন্যই তাকে বলা। আমি রেপের অভিযোগ করিনি। কিন্তু কথাটা পরে জায়েদই ছড়িয়েছে।

জায়েদই ছড়িয়েছে! কেন? সে তো আপনার উপকারই করেছিল?

অনু ম্লান গলায় বলল, ওটা উপকার ছিল না, বরং ওটা ছিল আমার জন্য একটা ট্র্যাপ। জায়েদ আমাকে বলল পার্টি ক্লাবে একটা অভিযোগ করতে, আমি করলাম। কিন্তু এটাকে সে তার নিজের স্বার্থে ব্যবহার করলো।

কীভাবে?

আমার ধারণা এগুলো আপনি জানেন।

তারপরও বলুন।

জায়েদ আগে থেকেই চাইছিল ওয়াসিম এলাকায় না থাকুক।

কেন?

আমি স্পষ্ট বলতে পারব না, তবে হতে পারে পলিটিক্যাল বা প্রফেশনাল কোনো বিষয়। শুনেছি বিজনেস রিলেটেড বিষয়-টিসয়ও ছিল।

হুম, নানান ধরনের ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আগে থেকেই দুজনের মধ্যে একটা ঝামেলা ছিল। কিন্তু তাতে আপনার ঘটনার সম্পর্ক কী? এমন তো না যে ওয়াসিমের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ আগে আর ছিল না!

হয়তো ছিল। কিন্তু অনেকদিন পর দেশের বাইরে থাকায় সেসব হয়তো চাপা পড়ে গিয়েছিল। জায়েদ চাইছিল আমার ঘটনাটা রংচং মাখিয়ে প্রচার করে ওয়াসিমকে পলিটিক্যালি কোণঠাসা করে ফেলতে।

ফোরকান আলী আরেকটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, আচ্ছা, গট ইট। তখন তো কিছুদিন পরই নির্বাচন ছিল, সো ইমেজটা দলের জন্য খুব ইম্পর্ট্যান্ট ছিল। হুম, বলুন।

তো এই নিয়ে তখন দুজনের দ্বন্দ্ব চরমে। ওয়াসিমের লোকজন একবার জায়েদের গায়ে হাত তুললো। বিষয়টা কেউই ভালোভাবে নেয়নি...।

আর এর পরপরই ওয়াসিম একদম গুম হয়ে গেল?

একদম হয়নি, কিছুদিনের জন্য হয়েছিল। পরের নির্বাচনে জায়েদের দল হেরে যাওয়ার পর পরই তো ওয়াসিম আবার ফিরে এলো।

সেদিন এই অব্দিই কথা হলো। আজিজুল মিয়াকে ডেকে ফোরকান আলী বললেন, আপনার স্ত্রী বলছিলেন ওনাকে আপনারা বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দিয়ে দিয়েছেন?

জি স্যার।

আপাতত কিছুদিনের জন্য নোটিশ তুলে নিন। আমরা না বলা পর্যন্ত উনি এখানেই থাকুন। ঠিক আছে?

আজিজুল মিয়া মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। অনু উঠে দাঁড়াতেই ফোরকান আলী বললেন, আপনি আরেকটু বসুন।

অনু আবার বসলো। আজিজুল মিয়া ঘর থেকে বের হয়ে যেতেই ফোরকান আলী বললেন, একটা কথা বলি অনু?

জি?

পুলিশের চাকরি করতে এসে আমরা অনেকটা জড় পদার্থের মতো হয়ে গেছি। পার্সোনাল কোনো অনুভূতি আর কাজ করে না। আপনার কথা শুনে একটা ঘটনার উল্টোপিঠটাও জানা হয়ে গেল। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আপনাকে নিয়ে আমরা সন্দেহমুক্ত না।

অনু অবাক গলায় বলল, কিসের সন্দেহ? আমি জায়েদকে খুন করেছি?

না, তেমন কিছু না। তবে বিষয়টা আরো জটিল। আর তাতেও কোনো না। কোনো ভাবে আপনার একটা ভূমিকা আছে।

অনু হতাশ ভঙ্গিতে বলল, আমি যা জানতাম সবই আপনাদের বলেছি।

হয়তো বলেছেন। কিন্তু দিন শেষে আমরা তো পুলিশ। ইনভেস্টিগেশনে সহজে কারো কথা বিশ্বাস হয় না। তাছাড়া আমাদেরও তো কিছু বোঝাবুঝির বিষয় আছে, আছে না?

তা আছে। কিন্তু আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না, এখানে আমার ইনভলভমেন্ট কোথায়?

সেটা আমরাও বুঝতে পারছি না। তবে এই পুরো ঘটনায় আপনার একটা কিছু ইনভলভমেন্ট যে আছে, সে তো আপনি নিজেই আমাদের বললেন, তাই না?

অনু জবাব দিলো না। সে ঘর থেকে বের হওয়ার আগে ফোরকান আলী বললেন, প্রত্যেকটা বড় অপরাধের পেছনে অসংখ্য ছোট অপরাধ লুকিয়ে থাকে। বড় গাছের মাটির

তলায় যেমন অসংখ্য শেকড় ছড়িয়ে থাকে তেমন। এই খুনটার পেছনেও তেমনি অনেক ছোট ঘটনা লুকিয়ে আছে।

অনু আর কথা বলল না। বাসায় ফিরে সেই সারাটা সন্ধ্যা, গভীর রাত অব্দি চুপচাপ বসে রইল সে। মাঝরাতে কী মনে করে মায়ের ট্রাঙ্কটা হঠাৎ খুললো। ট্রাঙ্ক খুলতেই ধক করে উঠল অনু বুকের ভেতর, একটা নোটবুক যত্ন করে রাখা। নোটবুকটা অয়নের! সে আলতো হাতে নোট বুকটা ছুঁয়ে দেখলো, অয়নের হাতের ছোঁয়া কী কোথাও লেগে আছে? অনু নোটবুকটা তুলে নিয়ে চুপচাপ বসে রইল। তার নোটবুকটা খুব খুলে দেখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হচ্ছে যদি সে খুলে দেখে এই নোটবুকটা জুড়ে কেবল সাদা ধবধবে পাতা, কোথাও কিছু লেখা নেই, তাহলে তার চেয়ে এমন বন্ধই থাকুক নোটবুকটার পাতা। সে অন্তত ভেবে নেবে অয়নের না বলা অনেক কথাই এখানে লেখা আছে। অয়ন তার সাথে আছে। কোনো একদিন না একদিন সেই কথাগুলো সে চাইলেই শুনতে পাবে। অয়ন থাকুক তার সাথে।

*

শামীম আর তনু বাসা বদলে ফেলল। পুরো বাড়িতে অনু একদম একা। দু মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি পড়েছে। অনু অবশ্য দুটো টিউশন জুটিয়ে নিয়েছে। তবে বেশিরভাগ সময়ই সে একাই থাকে। সেদিন ঠিক দুপুর বেলা আজিজুল মিয়া এলেন। তার হাতে একটা খাম। তিনি খামটা অনুর হাতে দিয়ে বললেন, তোমার ভাবি খুব খেপে আছে, আজই বাড়ি ভাড়াটা দিয়ে এসো।

অনু খামটা খুললো, খামের ভেতর অনেকগুলো টাকা। আজিজুল মিয়া বললেন, আমার কাছে তো তেমন টাকা-পয়সা থাকে না, এই টাকা কটাই ছিল। এই টাকায় এক মাসের পুরো বাড়ি ভাড়া হবে না, তাও কী আর করা?

আপাতত এইটুক দিয়ে একটা বুঝ দাও। পরেরটা পরে দেখা যাবে।

কিন্তু...।

অনুকে কথা শেষ করতে দিলেন না আজিজুল মিয়া, তিনি অনুর হাত চেপে ধরে বললেন, যখন চাকরি-বাকরি হবে, ফেরত দিয়ে দিও, সাথে চড়া সুদও দিও। হা হা হা।

অনু টাকার খামটা হাতে দাঁড়িয়ে রইল। আজিজুল মিয়া চোরের মতো লুকিয়ে সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন। অনুর বুকের ভেতর কেমন একটা ব্যথা হচ্ছে। সেই ব্যথাটা বুক থেকে দলা পাকিয়ে গলায় উঠে এসে আটকে রইল। সম্ভবত কান্না পাচ্ছিল অনুর। কিন্তু সে কাঁদলো না। চুপচাপ গিয়ে বিছানায় বসে রইল। তার বালিশের পাশে অয়নের নোটবুকটা। একবার হাত বাড়িয়ে নোট বুকটা ছুঁয়ে দেখলো সে। বুকটা কেমন ঠান্ডা হয়ে আসছে।

.

ফোরকান আলী অনুকে ডাকলেন আরো বেশ কিছুদিন পর। তিনি ডেকে বললেন, আমরা খুবই দুঃখিত আপনাকে বারবার বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে। কিন্তু জায়েদের খুনটা একটা পলিটিক্যাল ইস্যু হয়ে উঠছে। প্রশাসনও বিব্রত বোধ করছে। আচ্ছা, ওয়াসিমের সাথে আপনার লাস্ট দেখা হয়েছিল কবে?

অনু সেই রাতে কলাপসিবল গেটের সামনে ওয়াসিমের সাথে তার দেখা হওয়ার ঘটনা খুলে বলল। ফোরকান আলী বললেন, তার মানে সরকার চেঞ্জ হবার পর সে ফিরে এসেও অনেক দিন আপনার সামনে আসেনি?

না। তবে ওই যে বললাম, জানালাটা সবসময় খোলা থাকত।

আচ্ছা। ফোরকান আলী উঠে দাঁড়িয়ে খানিক পায়চারি করে আবার বসে পড়লেন। তারপর বললেন, একটা বিষয়, জায়েদ আপনার এত বড় উপকার করার পরও, তার সাথে আপনার সম্পর্কটা খারাপ হবার কারণ কী? ওয়াসিম হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়ার পরতো আপনার তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়ার কথা, তাই না?

অনু ম্লান হাসলো, আসলে আমার ভাগ্যে নিশ্চিন্ত হওয়া বলতে কিছু নেই। আমার অবস্থা হচ্ছে, ডাঙায় বাঘ দেখে বাঁচার জন্য পানিতে লাফিয়ে পড়ার মতো। যেখানে পড়ে দেখি সেখানে হাঁ করে আছে কুমির।

মানে কী?

জায়েদ। ওই যে বললেন উপকার, তার ধারণা সে আমার উপকার করেছে, এখন তাকে আমার উপকারের প্রতিদান দিতে হবে। ওয়াসিমের মতো না হলেও পরের ছ-সাতটা মাস আমার জীবনটা প্রায় অতিষ্ঠ করে দিলো জায়েদ।

আচ্ছা। তারপর?

ততদিনে নির্বাচন চলে এসেছে। এসব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো সে। আর নির্বাচনে তো তার দলের ভড়াডুবি হলো। সাথে সাথে গা ঢাকা দিতে হলো তাকেও।

আর তারপরই আবার ফিরে এলো ওয়াসিম এবং সে এসেও আপনাকে কিছু বলেনি, যতদিন না জায়েদ খুন হলো!

জি।

ফোরকান আলী দীর্ঘসময় চুপ করে থেকে কী ভাবলেন। তারপর ধীর এবং শান্ত কণ্ঠে বললেন, এই পর্যন্ত হলে ঘটনা ঠিকই ছিল। কিন্তু ঘটনা এরপরও আছে অনু।

অনু অবাক গলায় বলল, এরপর কী ঘটনা?

এরপরের ঘটনা হচ্ছে, শামীম।

শামীম! কোন শামীম?

আপনার মেজো বোন তনুর হাজবেন্ড।

শামীম!

জি।

এখানে শামীম আবার কোথা থেকে এলো?

ফোরকান আলী হাসলেন, দ্যাটস দ্য কোয়েশ্চেন, সে এর মধ্যে এলো কী। করে! আপনি এতক্ষণ যা বললেন, তার কম বেশি আমরা আগেই জানি। ওই পর্যন্ত আমাদেরও খুব একটা সমস্যা ছিল না। সমস্যা হলো এর পর থেকে। যখন দৃশ্যপটে শামীম হাজির হলো।

অনু কিছুই বুঝতে পারছে না। এর সাথে শামীমের সম্পর্ক কোথায়! এমনকি এইসব ঘটনা শামীম জানেও না। সে বলল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমরাও না।

তাহলে?

তাহলে আর কী! যখন আমরা কিছুই বুঝতে পারি না, তখন ধারণা করে নেই।

কী ধারণা?

ঘটনার পূর্বাপর কী ছিল?

কী ছিল?

শামীম আপনাদের বাসায়ই থাকে, রাইট?

ছিল, কিছুদিন হলো আলাদা থাকে।

দীর্ঘদিন থেকেই তো একসাথে ছিলেন?

জি।

কিন্তু শামীম যে একটা বইয়ের দোকান দিয়েছে সেটি কী আপনি জানেন না?

জানবো না কেন? জানি।

সেই বইয়ের দোকান করতে আপনিই তাকে টাকা দিয়েছেন?

আমি টাকা দেবো কেন? আর অত টাকা আমি পাবোই বা কোথায়?

কিন্তু শামীম তো জানিয়েছে, ওই টাকা আপনি দিয়েছেন।

ইম্পসিবল। অত টাকা আমি কী করে দেব?

সেটাই, আপনার ভাষ্যমতে আপনাকে খুব কষ্ট করেই সংসার চালাতে হতো, সেক্ষেত্রে শামীমকে এত টাকা আপনি কোত্থেকে দিবেন, তাই তো?

জি।

কিন্তু অনু, আপনি কী জানেন যে শামীম যেই স্কুলের সামনে বইয়ের দোকান দিয়েছে, ওটার পাশে একটা কলেজও আছে?

জি।

আরো একটু পাশেই একটা বড় প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিও আছে?

জি।

তো অমন ব্যস্ত একটা জায়গায়, অত বড় দোকান নেয়ার জন্য যে টাকা লাগে, সেই টাকা সে পেল কোথায়?

সে বলেছিল, তার বন্ধুরা মিলে দিয়েছিল।

আর সেটি আপনি বিশ্বাস করেছেন?

অনু এবার আর কথা বলল না। ফোরকান আলী বললেন, এবং বন্ধুদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে সে বইয়ের বিজনেস শুরু করলো, আর দিন না ফুরাতেই সেই বইয়ের দোকান থেকে সে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রফিট করতে থাকল? কী সহজ বিষয়টা, তাই না? আর এটি আপনি বিশ্বাসও করছেন?

অনু বুঝতে পারছে না কী হচ্ছে। তবে কোথাও যে একটা বড় ধরনের ঝামেলা রয়ে গেছে, সেটি স্পষ্ট। নিজেকে হতবিহ্বল লাগছে অনুর। সে বলল, আমি সত্যি বুঝতে পারছি না। আপনি কী শামীমের বিষয়টা আমাকে একটু খুলে বলবেন?

নিশ্চয়ই বলব। আপনি যদি বলেন যে একই ঘরে, একই ছাদের নিচে থেকেও আপনি আপনার আপন মেজো বোনের হাজবেন্ড সম্পর্কে কিছু জানেন না, তাহলে তো এটা আমাদের ইমানি দায়িত্ব যে তা আপনাকে জানানো।

ফোরকান আলীর কণ্ঠে বিদ্রুপাত্মক সুর। তিনি বললেন, কোচিংয়ে বিজনেসের আড়ালে ওয়াসিমের যে ইয়াবার বিজনেস ছিল, সেটি আপনি জানতেন?

শুনেছিলাম, আর সেটি আপনাকে বলেছিও।

ফোরকান আলী হাসলেন, দেখেন, সেটি পর্যন্ত আপনি জানতেন, আর আপনি এটি জানতেন না যে আপনার ব্রাদার ইন ল' শামীম ওয়াসিমের এই বিজনেসের সাথে যুক্ত? সে তার একজন নতুন স্ট্রং হ্যান্ড?

ওয়াসিমের? শামীম! অনুর নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস হচ্ছে না, কী বলছেন আপনি?

ফোরকান আলী আবারো হাসলেন, আমি আরো অনেক কিছুই বলব, আপনি হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবেন না। কিংবা আপনি যে আগে থেকেই জানতেন, সেটি স্বীকার করতে চাইবেন না।

কী?

শামীমের ওই বইয়ের দোকানটা আসলে বইয়ের দোকান নয়। ওটা বইয়ের আড়ালে ওখানকার স্টুডেন্টদের জন্য ড্রাগস সাপ্লাইয়ের একটা সেফ জোন। কেউ কিছু বুঝছে না, জানছে না। স্কুল কলেজের সামনে নরমাল একটা বইয়ের দোকান। নানারকম বই খাতা কলম পাওয়া যাচ্ছে, ফটোকপি মেশিন আছে, প্রিন্টিং মেশিন আছে। মোবাইল ফোনে টাকা লোড করা যাচ্ছে। সবকিছুই খুব সহজ, স্বাভাবিক। বাট আসলে তো ওটা একটা ইয়াবা স্পট!

অনু হা করে তাকিয়ে আছে। ফোরকান আলী বললেন, আপনি নিশ্চয়ই বলবেন যে এই ঘটনা আপনি জানতেন না?

না বললে আপনি বিশ্বাস করবেন?

প্রশ্নটা আমার ছিল।

আমি আসলেই জানতাম না, ঘুণাক্ষরেও না। হ্যাঁ, শামীমের রাতারাতি এত টাকা ইনকামের ব্যাপারটা আমার কাছেও খানিকটা অস্বাভাবিকই লেগেছে। কিন্তু সেটা যে এভাবে হতে পারে, আনবিলিভেবল!

আমাদের কাছেও আনবিলিভেবলই ছিল।

কী?

এই পুরো বিষয়টিতে আপনার সম্পৃক্ততা।

আমার?

হুম।

কীভাবে?

ধরুন, ওয়াসিমের সাথে আপনার এত বড় একটা ঝামেলা হলো, সেই ঝামেলার কারণে আপনি জায়েদকে দিয়ে ওয়াসিমকে শায়েস্তা করালেন। আবার এরপর ঠিক একইভাবে জায়েদও আপনার সাথে ঝামেলা শুরু করলো, আর আপনি ঠিক আগের মতোই এবার আবার ওয়াসিমকে দিয়ে জায়েদকে শায়েস্তা করালেন। আই মিন যেটা আসলে ঘটনাচক্রে খুন পর্যন্ত গড়িয়েছে!

অনু কী বলবে ভেবে পেল না, তার নিজেকে পুরোপুরি দিশেহারা লাগছে। সে বলল, আপনি কী বলছেন এসব? আমি এর কিছুই জানতাম না!

নিশ্চয়ই আপনি কিছুই জানতেন না। আপনার বোনের হাজবেন্ড ওয়াসিমের অবর্তমানে তার ড্রাগস বিজনেস দেখাশোনা করছে, সেটাও আপনি জানতেন না। আবার ওয়াসিম যে আপনার সাথে সেই সন্ধ্যায় কী অঘটন ঘটিয়েছিল, দিনের পর দিন আপনার সাথে কী আচরণ করেছিল, তার কিছুই আপনার বোনের হাজবেন্ড শামীম জানতো না! অথচ, আর সবকিছুই ঠিকঠাক জানাশোনা, বোঝাঁপড়া চলছে, একে অন্যের সম্পর্ক, বিজনেস, লক্ষ লক্ষ টাকা, সবকিছুই। কী ইন্টারেস্টিং না বিষয়টা?

ফোরকান আলী থামলেও অনু কথা বলতে পারল না। ফোরকান আলীই আবার বললেন, অনু, কিন্তু পুলিশের ধারণা আপনি অনেক কিছুই জানতেন। শামীম আপনার কনসার্ন ছাড়া কিছুই করেনি। ইনফ্যাক্ট সেটি সম্ভবও না। ওয়াসিমের সাথে তার ইনভলভমেন্টও আপনার নির্দেশেই। আমরা ধারণা করছি, পুরো বিষয়টিই আপনি জানতেন। এমনকি জায়েদের খুনের বিষয়টাও। হ্যাঁ, হতে পারে আপনি চাননি, জায়েদ খুন হয়ে যাক। কিন্তু আপনি তো এটাও চাননি যে জায়েদ করাতকলের করাতে ওয়াসিমের আঙুল কেটে ফেলুক। কিন্তু সেটাও তো ঘটেছে! মানে আপনি কিছু একটা চেয়েছিলেন, সেখানে অন্য কিছু একটা ঘটেছে। তা এখানেও কী তেমন কিছু একটা ছিল?

অনু কথা বলল না। সে কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। তার চিন্তা শক্তি কাজ করছে না। ফোরকান আলী বললেন, জায়েদের খুনটাও তাই যতটা সহজে দেখা যায়, বিষয়টা ততটা সহজ না।

অনু বাসায় ফিরে তার করণীয় নিয়ে ভাবতে বসলো। জীবনভর কত কত কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি যে সে হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তারপরও আজ এই মুহূর্তে এসে তার মনে হচ্ছে এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে তার মুক্তি নেই। নিজের অজান্তেই একটা দুর্ভেদ্য মাকড়সার জালে সে আটকে গেছে। এই জাল কেটে বের হবার পথ তার জানা নেই। তবে এখন নিজেকে নিয়ে অনু। যতটা না চিন্তিত, তার চেয়েও বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছে তনু আর হাফসাকে নিয়ে। সেই প্রথম থেকেই শামীমকে নিয়ে একটা

অস্বস্তি, একটা সন্দেহ কাজ করলেও নিঃসংশয় হতে পারছিল না অনু। কিন্তু যখন নিঃসংশয় হয়ে সে সব জানলো, তখন সেখান থেকে বের হবার আর কোনো পথ কী খোলা আছে শামীমের? সম্ভবত নেই, কিংবা থাকলেও শামীম সেখান থেকে বের হতে চাইবে কি-না সেটিও একটা প্রশ্ন। সমস্যা হচ্ছে শামীম নিজে নিজে যে বিপদে পড়েছে, সেই বিপদ এখন একে একে গ্রাস করবে তাদের সবাইকে।

সাদা চোখে দেখলে হয়তো বিষয়টিকে এতটা জটিল মনে হবে না। কিন্তু ফোরকান আলীর পুলিশি তদন্তের চোখ বিষয়টিকে যেভাবে মিলিয়েছে, তাতে তাকে মিথ্যে প্রমাণ করাও সহজ নয়। অনুর নিজেরও এখন মনে হচ্ছে, শামীমের সাথে ওয়াসিমের সম্পর্কটা যদি সত্যিই এমন হয়ে থাকে, তবে পুরো ঘটনায় অনুর ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে দেখা পুলিশের জন্য সবচেয়ে সহজ এবং স্বাভাবিক ব্যাপার। তাছাড়া শামীম দীর্ঘদিন তার সাথে একই বাসায়, একই ছাদের নিচে থাকছে। সে সম্পর্কে তার বোনের স্বামীও। চাইলেই যে কেউ যে কোনোভাবে হিসেবটা মিলিয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু অনু তার নিজের হিসেবটা মেলাতে পারছে না। এই বিপদ থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় তার জানা নেই। সে একবার ভাবলো শামীমের সাথে কথা বলবে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হলো, এই মুহূর্তে সেটি ঠিক হবে না। বহু ভেবেচিন্তে পরদিন ভোরে সে ফোন করলো তনুকে। তনু ফোন ধরেই বলল, বাসা পেয়েছিস?

অনু বলল, না।

বাড়িওয়ালার বউ কিছু বলেনি?

এখনো বলেনি। আচ্ছা, হাফসা কেমন আছে? অনু প্রসঙ্গ পাল্টালো।

রাতের কান্নাটা কমেছে। আর এখানে ওর দাদি আছে, ফুপিরা আছে, সবাই খুব আদর করে। কোল থেকে নামাতেই চায় না, জানিস?

আচ্ছা। তুই কেমন আছিস?

শোকর আলহামদুলিল্লাহ। বিয়ের এতদিন পর এসে মনে হচ্ছে নিজের একটা সংসার হলো। আমার শাশুড়ি তো এতদিন আমাকে দুই চক্ষে দেখতে পারত না। কিন্তু এখন পারলে মাথায় তুলে রাখে। সবই টাকা বুঝলি, সবই টাকা। জানিস, শামীম কী বলেছে?

কী?

আমাকে একটা আড়াই ভরি সোনার হার কিনে দিবে। বিয়ের পর তো এখন পর্যন্ত কিছু দিতে পারেনি।

সোনার তো অনেক দাম এখন।

তাতে কী হয়েছে, ওর এখন আয় রোজগার মাশাল্লাহ ভালো।

কেমন ভালো?

অত কী আর আমাকে বলে? তবে ভালোই, কত কিছু করার যে প্ল্যান পরিকল্পনা করছে! বলেছে নেক্সট ইয়ারে আমাদের নিয়ে বাইরে কোথাও ঘুরতে যাবে। তনুর গলা আনন্দে ঝলমল করছে।

অনু বলল, কেমন কী আয়, তা তোকে বলে না?

এত জেনে কী হবে বল? পুরুষ মানুষের সবকিছু ঘরের বউকে বলার দরকারও নেই। বউ যখন যা চাইবে, তা দিতে পারলেই তো হলো, তাই না?

হুম, কিন্তু তুই কখনো জানতে চাসনি যে হঠাৎ করেই এত অল্প সময়ে সে। এত টাকা কোথায় পেল?

কেন, তুই ওর বিজনেসের কথা ভুলে গেছিস?

আমি ভুলে যাইনি, তুই ভুলে গেছিস।

আমি আবার কী ভুলে গেলাম?

তুই ভুলে গেছিস যে, ওই বইয়ের বিজনেস থেকে কেন, কোনো স্বাভাবিক বিজনেস থেকেই এই এত অল্পসময়ে এই পরিমাণ টাকা আসা সম্ভব না।

এতক্ষণে যেন অনুর অভিপ্রায় বুঝতে পারল তনু। সে গম্ভীর ভঙ্গিতে বলল, তুই কী বলতে চাচ্ছিস বড়পু, স্পষ্ট করে বলবি?

অনু স্থির গলায় বলল, স্ত্রীর দায়িত্ব শুধু স্বামীর টাকা খরচ করাই না। স্বামীর ভালো-মন্দ দেখাও। সে কীভাবে কোথা থেকে টাকা আয় করছে সেটাও দেখা।

তনু শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে বলল, তোর কাছ থেকে নিশ্চয়ই স্ত্রীর দায়িত্ব শিখতে হবে না আমাকে! আজ সাত বছরেরও বেশি আমার বিয়ে হয়েছে বড়পু, তোর চেয়ে স্ত্রীর দায়িত্ব আমার কম জানার কথা না।

অনু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তনু তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, শোন বড়'পা, সেই বিয়ের পর থেকেই তো আর কম কথা শুনিনি। কম কষ্টও করিনি। খেয়ে না খেয়ে থেকেছি, কারো সামনে গলা উঁচু করে কথা পর্যন্ত বলতে পারিনি। সবসময় মাথা নিচু করে থেকেছি। এখন শামীম ভালো করছে দেখে কারো সহ্য হচ্ছে না, সেটা বুঝি। টাকা-পয়সা হাতে না থাকলে শামীমের মাথার ঠিক থাকে না। হাফসা হবার সময় এইজন্যই

তার মাথা ঠিক ছিল না। আমার সাথে অনেক আজেবাজে ব্যবহারও করেছে। তাই বলে ভাবিস না, সে ওরকমই।

তনু থামলেও অনু কথা বলল না। ফোন কানে চেপে ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তনু আবার বলল, তোদের কাছ থেকেও তো কম অপমান অপবাদ সে। সহ্য করেনি। নিজের বড় বোনের মতো সে ভাবতো তোকে। কিন্তু তার বদলে কী করেছিস তোরা, কিছুই ভোলেনি সে। শোন বড়পু, হাফসা হওয়ার সময় থেকে এই পর্যন্ত তুই আমাদের পেছনে কত কী খরচ করেছিস, তার একটা হিসাব দিস, শামীম টাকাটা দিয়ে দিবে।

অনু শান্ত গলায় বলল, আচ্ছা।

আর কিছু বলবি আপু?

হুম।

বল?

মা'র একটা ডিপিএস ছিল, সেখানে অল্প কিছু টাকা জমেছে। টাকাটা আমি তোকে দেবো। তুই যত দ্রুত সম্ভব হাফসাকে নিয়ে শামীমদের গ্রামে বাড়ি চলে যাবি, আর ঢাকায় ফিরবি না।

তোর কী মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

অনু তনুর কথা গ্রাহ্য করলো না। সে আগের মতোই শান্ত ভঙ্গিতে বলল, আর যদি সম্ভব হয়, শামীমকেও বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে যাবি। ওই টাকায় গ্রামে ছোট খাটো কিছু একটা হলেও সে করে খেতে পারবে। যদিও আমার মনে হয় না সে যাবে, তবে সেই চেষ্টাও করতে হবে। আরেকটা কথা, ছোট বেলায় যতটা গর্দভ ছিলি, ভেবেছিলাম বড় হলে সেটা কমবে। কিন্তু মানুষ যে বড় হতে হতে দিন দিন আরো বড় গর্দভ হয়, সেটার উৎকৃষ্ট প্রমাণ তুই।

অনু ফোন রেখে দিয়ে চুপচাপ বসে রইল। তার কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু কি করা দরকার তা সে ভেবে পাচ্ছে না।

সে পরদিন ভোরবেলা তনুকে দেখে অবাক হলো না। জিজ্ঞেস করলো, কী সিদ্ধান্ত নিলি?

তনু বিচলিত গলায় বলল, কী হয়েছে আমাকে খুলে বলবি প্লিজ?

শামীমের সাথে কোনো কথা হয়েছে?

হ্যাঁ।

কী কথা হয়েছে?

কাল রাতে বাসায় ফিরলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

সে কী বলল?

হঠাৎ রেগে গেল।

আমার কথা কিছু বলেছিলি?

নাহ্।

অনু যতটা সম্ভব ঘটনা খুলে বলল। তনু ঘটনা শুনে হতবুদ্ধের মতো বসে রইল। সে বলল, এখন আমি কী করব বড়'পু?

তোর আর এখন কিছু করার নেই। শামীম এখন কারো কথা শুনবে না।

শামীমকে সবকিছু খুলে বলব?

বুঝতে পারছি না, আমার ধারণা সে কিছুই শুনবে না।

শুনবে বড়পু।

অনু বেশ কিছু সময় চুপ করে বসে রইল। তারপর বলল, শামীম খুব বোকা একটা মানুষ। কিন্তু বোকা হওয়াটা কোনো সমস্যা না। সমস্যা হচ্ছে। বোকা মানুষ যখন নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভাবা শুরু করে তখন। এদের কারণে তাদের নিজেদের যতটা না ক্ষতি হয়, তারচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় তার আশেপাশের মানুষের।

আমার হাত-পা কাঁপছে বড়পু।

অনু হাত বাড়িয়ে তনুর হাত ধরলো। তারপর বলল, ভয় পাস না, বিপদ আপদ মানুষের জীবনেই আসে।

কিন্তু তোর কী হবে?

আমাকে নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। তুই তোর নিজেকে আর হাফসাকে নিয়ে ভাব।

তনু দীর্ঘসময় অনুর হাত ধরে চুপচাপ বসে রইল। সে নিঃশব্দে কাঁদছে। তার দুই গাল বেয়ে কান্না ঝরেছে। অনু যেন অভয় দিতেই তনুর হাতটা আরো শক্ত করে চেপে ধরলো। তনু আচমকা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। তারপর কান্নাজড়ানো গলায় বলল, আরো একজনকে নিয়ে যে ভাবতে হবে বড়পু?

অনু অবাক গলায় বলল, আরো একজনটা আবার কে?

তনু হঠাৎ অনুর হাতখানা টেনে নিয়ে তার তলপেটে চেপে ধরে বলল, আরো একজন এইখানে আছে বড়'পু। ভাবছিলাম সে আমার সৌভাগ্য নিয়ে এসেছে, কিন্তু...।

তনু তার কথা শেষ করতে পারল না। বাঁধ ভাঙা জলোচ্ছ্বাসের মতো কান্নায় তার গলা বুজে এলো। অনু কী বলবে ভেবে পেল না। সে শূন্য এবং অসহায় চোখে তনুর দিকে তাকিয়ে রইল।

*

শামীম বসে আছে ওয়াসিমের সামনে। জায়গাটা টেকনাফে মায়ানমার বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি। ছোট টিলার উপর কাঠের বাংলোর মতো ঘর। প্রচণ্ড শীত পড়েছে বলে ওয়াসিম হাতে পায়ে মোজা পরে বসে আছে। ঘন কুয়াশার কারণে বাইরে হাত দেড়েক দূরের জিনিসও দেখা যায় না। সেই দুর্ভেদ্য কুয়াশা দেখতেই খোলা বারান্দায় বসে আছে সে। শামীম অবশ্য শীতে কাঁপছে, এত শীত হবে ধারণা ছিল না তার। ওয়াসিম বলল, খুব ঝামেলা হচ্ছে?

মোটামুটি।

কী ঝামেলা?

নানারকম ঝামেলা।

পুলিশের?

তা আছে কিছু, তবে অন্য ঝামেলা বেশি?

অন্য ঝামেলা কী?

আপনি স্বশরীরে নেই, এটা অনেকের জন্যই সুযোগ। তাছাড়া অনেকেই আছে বহুদিন থেকে আপনার হয়ে কাজ করছে। হঠাৎ করে আমার সিদ্ধান্ত, মতামত তারা মানতে চায় না। আমি তো তাদের তুলনায় নতুন।

কেন? আজম তো আছেই। আজমকে তো আমি বলেই এসেছি সে যেন বিষয়গুলো হ্যাঁন্ডেল করে।

শামীম কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, আজম ভাই নিজেও খুব একটা হিসাব নিকাশ দেয় না!

ওয়াসিম চেয়ারে হেলান দিয়ে বসা ছিল। শামীমের কথা শুনে সে খানিক সোজা হয়ে বসলো। শামীম বলল, গত দুই মাসে আজম ভাইয়ের স্পটের কোনো সেল রিপোর্ট পাইনি। কত কী বিক্রি হয়েছে কিছু জানিও না।

টাকাও জমা দেয়নি?

শামীম আমতা আমতা করে বলল, না।

তুমি আমাকে জানাওনি কেন?

আপনার এখানে ফোনে নেটওয়ার্ক থাকে না বেশিরভাগ সময়। চাইলেও পাওয়া যায় না।

এরকম আর কে কে আছে?

সব স্পটেই কম বেশি আছে। আসলে সঠিক হিসাবটা তো আমার কাছে নাই। কী পরিমাণে মাল কার কাছে যায়, সেই হিসাব তো থাকে আজম ভাইয়ের কাছে। আমি শুধু সবার কাছ থেকে টাকা পেয়ে আপনার একাউন্টে জমা দেই, আর আমার স্পটের বিক্রিটা দেখি।

ওয়াসিম কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, এখন থেকে মাল দেয়ার আগে টাকা নিয়ে নিবে। মাল হিসেব করে একহাতে দিবে, আরেক হাতে টাকা নিবে। প্রিপেইড সিস্টেম। এই ইয়াবা জিনিসটা ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছানো সহজ কথা না। মায়ানমার থেকে আসে এই টেকনাফ সীমান্ত হয়ে। তারপর যে কত সিস্টেম করতে হয়, কতজনকে পয়সা দিতে হয় ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছাতে। তা শুধু আমি জানি। বিক্রি করে টাকা দিবে, আগের সিস্টেম এখন থেকে বাদ।

শামীম বলল, আচ্ছা।

আর পুলিশ কী ঝামেলা করে? এইগুলা নিয়ে তো পুলিশের ঝামেলা করার কথা না।

স্কুল-কলেজের সামনের স্পট নিয়ে সমস্যা, অন্য জায়গা নিয়ে সমস্যা নেই।

কী সমস্যা? তুমি তো আর দোকানের তাকভর্তি বয়ামে বয়ামে ইয়াবা সাজিয়ে নিয়ে বিজনেস করতে বসো নাই। তুমি তাকভর্তি বই সাজিয়ে নিয়ে বসেছ!

সেটা তো আমি জানি না। আজকাল পুলিশের আচার-আচরণ একটু পাল্টে গেছে। মাঝে মধ্যে দোকানে এসেও চোটপাট দেখায়।

ওয়াসিম গম্ভীর গলায় বলল, আচ্ছা, বিষয়টা আমি দেখছি। তুমি পাশের ঘরে রেস্ট নাও, বাকি কথা পরে হবে।

সন্ধ্যায় ওয়াসিমের সাথে শামীমের আবার কথা হলো। ওয়াসিম বলল, আমি গ্রিন সিগন্যালের অপেক্ষায় আছি। আশা করছি, যে-কোনো মুহূর্তেই গ্রিন সিগন্যাল পেয়ে যাব। আর সাথে সাথেই ঢাকা চলে আসবো। তখন আর এইসব সমস্যা থাকবে না।

একটু চেষ্টা করেন, যত দ্রুত সম্ভব।

তুমি এত টেনশন করছ কেন শামীম? এসব লাইনে এত অল্পতেই অস্থির হলে চলে না।

শামীম কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, কোথাও একটা ঝামেলা হচ্ছে।

ওয়াসিম হাসতে হাসতে বলল, কী ঝামেলা হবে? কোনো ঝামেলা নেই। আর একটু আধটু ঝামেলা না হলে মজাটাও পাওয়া যায় না।

শামীম কথা বলল না। দূরের পাহাড় থেকে নাম না জানা প্রাণীর চিৎকার ভেসে আসছে। কেমন একটা গা ছমছমে ব্যাপার চারপাশে। ওয়াসিম হঠাৎ শামীমের কাঁধে হাত রেখে বলল, তোমার বউ কেমন আছে?

জি ভালো।

একা এলে কেন? বউকেও সাথে নিয়ে আসতে। সুন্দর জায়গা, একটা টুরও হয়ে যেত।

ওর শরীরটা একটু খারাপ।

আরে ধুর, মেয়ে মানুষের তো ওই এক... শরীর খারাপ। এছাড়া আর কী! এরা হচ্ছে ঘোড়ার মতো, যখনই ঝিমাবে, পাছায় বাড়ি মারলেই দেখবে আবার দৌড়ানো শুরু করেছে।

ওয়াসিমের এই কথাটা শামীমের পছন্দ হলো না। তনুকে নিয়ে কথার মাঝখানে ওয়াসিমের কাছ থেকে এমন শব্দ সে আশা করেনি। ওয়াসিম বলল, তোমার বউকে কিন্তু আমি চিনি। ছোটবেলায় দেখেছি। তখন নেংটি পরে ঘুরে বেড়াতো। হা হা হা। একটা বয়সের পর মেয়েদের চেহারা ছবি হঠাৎ ভালো হয়ে যায়। তোমার বউকেও তো দেখলাম দেখতে টেখতে এখন বেশ হয়েছে। তুমি কিন্তু নিয়ে আসতে পারতে। কী সুন্দর নিরিবিলি জায়গা দেখেছ? এই শীতে গরম হওয়ার জন্য এমন জায়গার তুলনা হয়, বলো?

শামীম জবাব দিলো না। ওয়াসিম হাসতে হাসতে বলল, পুরুষ মানুষের অবশ্য মৌজ মাস্তিতে নিজের বউ ভালো লাগে না। ভালো লাগে অন্যের বউ। শোনন নাই, বাঙালি না-কি পরস্ত্রী আর পরশ্রীকাতর, হা হা হা। তা, তোমার বড় আপার খবর কী?

কোন বড় আপা?

অনু ছাড়া আরো বড় আপা আছে না-কি তোমার?

নাহ্, তা নেই। হঠাৎ যেন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মনে পড়েছে, এমন ভঙ্গিতে শামীম বলল, উনাকে যে পুলিশ থানায় নিয়ে গিয়েছিল জানেন?

ওয়াসিম ভারি অবাক হলো, থানায় নিয়ে গিয়েছিল!

হুম। একবার না, একাধিকবার।

কী বলো! ঘটনা কী?

তা তো জানি না।

তোমার বউকে জিজ্ঞেস করোনি?

আমি ওর সাথে বাইরের বিষয় নিয়ে কথা বলি না। তাছাড়া থানা পুলিশ বিষয়টাকে আমি এড়িয়েই চলতে চাই।

ওয়াসিম শামীমের কাঁধে হাত রেখে বারান্দার ডান প্রান্তের খোলা রেলিং দেয়া জায়াগাটাতে এলো। তারপর বলল, সবকিছু এড়িয়ে যেতে নেই। কিছু জিনিস জানা থাকা দরকার। ধরো তুমি সাপ ভয় পাও, তাই বলে যে পথে যাচ্ছ, সে পথে সাপ আছে কি-না সেটা দেখে নেবে না?

শামীম মাথা নাড়লো। ওয়াসিম বলল, অনুর সাথে এই বিষয়ে কথা বলার দরকার নেই। তুমি বরং তোমার স্ত্রীর সাথে বিষয়টা নিয়ে কথা বলো। যতটা সম্ভব ঘটনাটা জানো। আমার এখন মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক। ঢাকায় কোনো একটা বড়সড় ঝামেলা পাকছে।

অনুর কাছ থেকে ফেরার পর থেকে তনু একদম চুপচাপ হয়ে গেছে। সে প্রবল সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। কখনো কখনো অনুর কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না। আবার কখনো কখনো মনে হচ্ছে শামীমকে ছেড়ে-ছুঁড়ে হাফসাকে নিয়ে কোথাও চলে যাবে। এই সময়টা তার জন্য খুবই সংবেদনশীল সময়। পাঁচ মাস হলো সে আবার গর্ভধারণ করেছে। অথচ এখন তাকে ভাবতে হচ্ছে অপেক্ষমান এক মহাপ্রলয় নিয়ে। শামীম টেকনাফ থেকে ফিরল দু'দিন বাদে। রাতে তনু তাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি যশোর গিয়েছিলে?

একবার তো বললাম।

যশোর কেন গিয়েছিলে?

কেন গিয়েছিলাম, সেটা তোমার না জানলেও চলবে।

কিছু জিনিস জেনে রাখা ভালো। বলা তো যায় না কখন কোন বিপদ চলে আসে।

আমার বিপদ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

তাহলে কার বিপদ নিয়ে ভাবতে হবে?

নিজের বিপদ নিয়ে।

আমার আবার কী বিপদ?

এই যে সারাক্ষণ আমি কী করছি, কোথায় যাচ্ছি, এই নিয়ে গোয়েন্দাদের মতো লেগে থাকো, এটাই তোমার বিপদ।

তুমি মিথ্যে না বললেই তো হয়।

আমি কী মিথ্যে বলছি?

তুমি তো যশোর যাওনি। গিয়েছিলে কক্সবাজার।

আমি কক্সবাজার গিয়েছিলাম তোমাকে কে বলল?

তোমার প্যান্টের পকেটে কক্সবাজার টু ঢাকা বাস টিকেট আছে। তোমার নামে, আজকের ডেটেই কাটা।

আমাকে না জানিয়ে আমার প্যান্টের পকেট ঘেটেছ কেন?

ঘাটিনি। হুট করে কাউকে কিছু না জানিয়ে এক কাপড়ে চলে গেলে। জামা কাপড়ের অবস্থা দেখেছ? ধুতে গিয়ে দেখলাম।

দেখেছ ভালো করেছ। এই নিয়ে আর কথা বাড়িয়ো না।

কিছু কথা বাড়ানো দরকার শামীম।

কোনটা দরকার আর দরকার না, সেটা আমি বুঝব, তুমি না।

কেন? তুমি উপার্জন করো বলে?

শামীম কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, হ্যাঁ, পয়সা উপার্জন ঘরে বসে দুই বেলা ভাত রান্নার মতো কোনো বিষয় না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিনরাত পরিশ্রম করার বিষয়।

এত পরিশ্রম কার জন্য করছ?

শামীম আবার চুপ করে গেল। তারপর বলল, তোমার কী হয়েছে বলে তো? ইদানীং মনে হয় তোমার গলার স্বর আর সাহসটা খুব বেড়েছে!

ভীতু মানুষের সাহস কখন বাড়ে জানো? যখন তার সামনে আর কোনো পথ থাকে না। আমার সামনেও এখন তোমার মুখোমুখি হওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

শামীম শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে বলল, তুমি তাকিয়ে আছ ওইদিকে মুখ করে, আর বলছ মুখোমুখি হওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই!

তনু শামীমের দিকে ঘুরে কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, তুমি যে এই কিছুদিন আগেও রোজ আমার গায়ে হাত তুলতে, আমি কিছু বলতাম? বলতাম না। কেন বলতাম না

জানো? কারণ তখন তোমার হাতে টাকা-পয়সা ছিল না। আর টাকা না থাকলে তুমি অন্য মানুষ হয়ে যাও। সেটা আমি জানতাম। কিন্তু শামীম টাকা-পয়সা কিসের জন্য? আমাদের জন্যই তো? এই যে হাফসা, আমি, আমরা সবাই। আর এই যে নতুন একজন আসছে, এদের জন্যই, তাই না?

শামীম কোনো কথা বলল না। তনুই বলল, আমাদের সবার জন্যই তুমি এত পরিশ্রম করছ, কষ্ট করছ। কিন্তু তোমার সেই পরিশ্রমের কারণেই যদি তুমি বড় কোনো বিপদে পড়? আর তুমি বিপদে পড়া মানে কিন্তু আমরা সবাই-ই বিপদে পড়া শামীম।

শামীম ঝট করে তনুর মুখের দিকে তাকালো, কী বিপদে পড়বো?

তুমি ভালো করেই জানো শামীম কী বিপদ পড়বে?

না আমি জানি না। তুমি বলো কী বিপদ? শামীমের কণ্ঠ হঠাৎ খানিকটা উত্তপ্ত হয়ে উঠল।

তুমি কিসের বিজনেস করছ?

কিসের বিজনেস করছি মানে? তুমি নিজ চোখে গিয়ে দেখে আসোনি?

দেখে এসেছি শামীম। কিন্তু সবকিছু কি খালি চোখে দেখা যায়? যায় না। তুমিও যেমন খালি চোখে দেখতে পাচ্ছ না কী ভয়াবহ বিপদে তুমি পড়তে যাচ্ছ। কী ভয়ংকর ট্র্যাপে তুমি পা দিয়ে বসে আছ!

শামীম হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল, এত ভনিতা না করে কী হয়েছে বলো, কার কাছে তুমি কী শুনেছ!

তনু খানিক সময় নিলো, তারপর বলল, তুমি যে বইয়ের দোকানের আড়ালে স্কুল কলেজগুলোতে ড্রাগস সাপ্লাই করো, এটা পুলিশ জানে।

তনুর কথা শুনে শামীম ছোটোখাটো একটা ধাক্কার মতো খেলো। পুলিশ জানে বলে নয়, ঘটনাটা তনু জানে বলে সে অবাক হয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছে পুলিশের জানাশোনা সংক্রান্ত বিষয়ে তনুর কথা শুনে। তনু সাধারণত ঘর থেকে বের হয় না। বাইরের মানুষের সাথেও মেশে না। ফলে এই ঘটনা তনুর জানার কথা নয়, বিশেষ করে পুলিশ সংক্রান্ত ঘটনা। সে শান্ত ভাবেই জিজ্ঞেস করলো, এসব কথা তোমাকে কে বলেছে?

কে বলেছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ না। আমি যেটা বলেছি সেটা সত্য কি-না, তা গুরুত্বপূর্ণ।

শামীম হঠাৎ কাতর কণ্ঠে বলল, তনু, আমাকে রাগিয়ে দিও না... প্লিজ।

শামীমের বলার ভঙ্গি শুনে তনু স্থির হয়ে গেল। শামীম তাকিয়ে আছে সাপের মতো ঠান্ডা চোখে। তার কপালের কাছের শিরাটা শুধু সামান্য নড়ছে। বহুদিন সে এই শামীমকে দেখেনি। এই শামীম করতে পারে না, এমন কোনো কাজ নেই। আপাতদৃষ্টিতে আপাদমস্তক সহজ সরল, বিনয়ী শামীম এই সময়টাতে অন্য মানুষ হয়ে যায়, সেই মানুষটা ভয়ংকর! শামীম একই গলায় বলল, বলো?

তনু জানে অনুর নাম সে লুকিয়ে রাখতে পারবে না। সে কাঁপা গলায় বলল, বড়'পু।

সে জানলে কী করে?

বড়'পুকে পুলিশ থানায় নিয়ে গিয়েছিল।

থানায় নিয়েছিল কেন?

জায়েদ মল্লিকের খুনের বিষয়ে তথ্য জানতে।

শামীম যেন আকাশ থেকে পড়লো, কী? জায়েদ মল্লিকের খুনের সাথে তার কী সম্পর্ক?

পুলিশ সন্দেহ করছে খুনটা করেছে ওয়াসিম।

কিন্তু তার সাথে ওনার কী সম্পর্ক?

তনু যতটা পারল সংক্ষেপে ঘটনা খুলে বলল। শেষে বলল, জায়েদ মল্লিককে ওয়াসিম খুন করেছে, এই বিষয়ে পুলিশ নিঃসন্দেহ। কিন্তু তারা সন্দেহ করছে এর সাথে কোনো না কোনোভাবে বড়পুরও ভূমিকা আছে, এমনকি তোমারও।

আমি!

হুম।

কীভাবে?

তনু ঘটনা ব্যাখ্যা করলো। শামীম অবশ্য তারপরও মরিয়া হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু এখানে আমি কোথা থেকে এলাম?

পুলিশের ধারণা, বড়পুর সাথে যে ঘটনা ঘটানোর কারণে ওয়াসিমকে মেরে জায়েদ এলাকা থেকে বের করে দিয়েছিল, তার বিজনেস টিজনেস বন্ধ করে দিয়েছিল, এর প্রতিশোধ নিতেই জায়েদকে ওয়াসিম খুন করে ফেলেছে।

এই কারণে কেউ কাউকে মেরে ফেলবে?

সেটাই। পুলিশ এখন সেই পেছনের আরো কারণ খুঁজছে। খুঁজতে গিয়েই তাদের মনে হয়েছে, ওয়াসিমের সাথে জায়েদের আরো নানান বিষয়ে আগে থেকেই ঝামেলা ছিল।

যার একটা হলো ড্রাগসের বিজনেসটা পুরোপুরি নিজের একার কন্ট্রোল নেয়া। আর জায়েদ মল্লিক খুন হওয়ার ঠিক কয়েক মাস আগেই। তুমি হঠাৎ ওয়াসিমের সাথে এই বিজনেসে ইনভলভড হয়েছ। পুলিশ বিষয়টি ভালোভাবে নেয়নি। তাদের ধারণা...।

কী?

তারা নিশ্চিত করে কিছু বলছে না। কিন্তু সন্দেহ করছে যে বড়পুর সাথে ওয়াসিমের এতকিছু হয়ে যাওয়ার পরও তুমি তার ছোট বোনের হাজবেন্ড হয়ে, বছরের পর বছর একই বাসায় একই ছাদের নিচে থেকেও কীভাবে আবার সেই ওয়াসিমের সাথেই যুক্ত হলে! শুধু তাই-ই না, ওয়াসিমের অবর্তমানে তার এতবড় ড্রাগসের বিজনেসেটাও দেখছ তুমি! খুব স্বাভাবিকভাবেই তারা সন্দেহ। করছে, বিষয়টা বড়'পু জানতো কি-না? মানে তাদের কাছে বিষয়টা ক্লিয়ার না, বরং যষ্টেই সন্দেহজনক। কিন্তু তারা এখনো ফাইনাল কোনো ডিসিশনে আসতে পারছে না।

শামীম রীতিমত হতবাক হয়ে গেছে। সে দীর্ঘসময় স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। একটা সাধারণ ঘটনা যে এতটা জটিল হতে পারে তা তার দূরতম কল্পনাতেও ছিল না। সেই সারাটা রাত একটা অদ্ভুত অস্থিরতা নিয়ে কাটলো শামীমের। মানুষ হিসেবে সে কেমন, তা শামীম নিজেও জানে না। নিজেকে তার নিজের কাছেই অনিশ্চিত, অনির্দেশ্য মনে হয়। কিন্তু আজ এই প্রথম তার মনে হলো সে তার পরিবার নিয়ে সবসময়ই চেতনে-অবচেতনে উদ্বিগ্ন ছিল। প্রায়শই তনুর প্রতি তার যে নির্দয় কঠিন আচরণ, তা বরং কোনো না কোনোভাবে পরিবারের প্রতি নিজের দায়িত্ব ঠিকঠাকভাবে পালন করতে না পারার হতাশা থেকেই উদ্ভূত। অন্ধকারেই হাত বাড়িয়ে ঘুমন্ত হাফসার মাথা আলতো করে ছুঁয়ে দিলো শামীম। তার খুব ইচ্ছে করছে তনুর পেটের উপর হাত রেখে পেটের ভেতরের নতুন অস্তিত্বটাকে অনুভব করতে। কিন্তু তনু যদি জেগে যায়, সে যদি টের পেয়ে যায়, তবে এর থেকে বড় লজ্জার আর কিছু হবে না।

শামীমের আচমকা মনে হলো, প্রতিটি মেয়ে যতটা সরবে, যতটা সচেতনভাবে নিজের ভেতর একজন মা পুষে রাখে, প্রতিটি ছেলে ঠিক ততটাই নীরবে, অবচেতনে তার ভেতর একজন বাবা পুষে রাখে। মেয়েরা আগেভাগেই তার এই মাতৃসত্তা টের পেলেও ছেলেরা তার এই পিতৃসত্তার টের পায় বহু পরে। ফলে সত্যিকারের বাবা হয়ে উঠবার আগ অব্দি সে তার এই অনাবিষ্কৃত সত্তা সম্পর্কে থাকে আশ্চর্যরকম নির্লিপ্ত। কিন্তু বাবা হয়ে উঠবার পর থেকে তার এই নির্লিপ্ততা ক্রমশই উধাও হয়ে যেতে থাকে। সে হয়ে উঠতে থাকে প্রচণ্ড স্নেহশীল, সর্বপ্লবী এক পিতা।

শেষ রাতের দিকে শামীম বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। জানালার বাইরে দিনের আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে। একেকটা দিনের শুরু যেন একেকটা সদ্যোজাত শিশুর মতোই নিষ্কলুষ, নিষ্পাপ। সেই সদ্যোজাত নিষ্কলুষ ভোরের আলোয় শামীমের আচমকা হাফসার জন্য, অনাগত সন্তানের জন্য খুব ভয় হতে লাগল।

৬

অনু আজও থানায় এসেছে। তবে আজ তাকে ফোরকান আলী খবর দিয়ে আনেননি, সে এসেছে নিজে থেকেই। ফোরকান আলী তাকে দেখে অবাক হলেও কিছু বললেন না। অনুই বলল, আমি বাসাটা ছেড়ে দিতে চাই।

বাসা তো এখন ছাড়া যাবে না। একটা ইনভেস্টিগেশন চলছে আর আপনি জানেন, আপনাকে সেখানে দরকার।

সেটা জানি বলেই তো আপনার কাছে অনুমতি নিতে এসেছি।

বাসা ছাড়তে হবে কেন?

এই মুহূর্তে এত বড় বাসা এফোর্ড করার মতো অবস্থা আমার নেই।

কেন আগে তো করতেন?

তখন আমার জব ছিল।

এখন নেই?

না।

নেই কেন?

ছেড়ে দিয়েছি।

কেন ছেড়ে দিয়েছেন? না মানে এই মুহূর্তে জবটা যেহেতু আপনার খুব দরকার, তো অন্য একটা না পেয়েই ছেড়ে দিলেন কেন?

পার্সোনাল কিছু প্রবলেম ছিল।

কী প্রবলেম?

অনু জবাব দিলো না। চুপ করে রইল। ফোরকান আলীই বললেন, আচ্ছা, বলতে চাইলে থাক। এনিওয়ে, কোথায় জব করতেন?

অনু বুঝে ফেলল সে নিজে সেধে সেধে আরো একটা নতুন ঝামেলা তৈরি করেছে। তাকে এখন তার চাকরি জীবনের বিশদ ফিরিস্তি দিতে হবে। সে যতটা পারল সংক্ষেপে ঘটনা বলল। ফোরকান আলী বললেন, আপনার জীবনে দেখি গল্পের অভাব নেই।

কারো জীবনেই গল্পের অভাব থাকে না।

না, মানে আপনার গল্পগুলো একটু অন্যরকম। ফোরকান আলী থেমে সিগারেট ধরালেন, তারপর বললেন, আচ্ছা, এর আগে আপনি একটি এনজিওতে চাকুরি করতেন?

জি।

সেটাও কী ছেড়ে দিয়েছিলেন?

জি।

কেন?

কারণটা বলতে ইচ্ছে করছে না।

ফোরকান আলী হাসলেন, মানুষ খুব ইন্টারেস্টিং প্রাণী বুঝলেন? সে বেশিরভাগ সময়েই জানে না সে কি করছে! করার পর মনে হয়, কাজটা কেন করলাম? ধরেন, বেশিরভাগ খুনিই খুন করার সময় বুঝতে পারে না যে সে খুন করছে। খুনটা করে ফেলার পর তার মনে হয়, আরে, এ কী করলাম!

অনু কথা বলল না। ফোরকান আলী হাসতে হাসতেই আবার বললেন, আপনি যে অফিসের বড় স্যারদের সাথে এখানে সেখানে লম্বা ট্যুরে যেতেন, এই ঘটনা কি সত্যি?

অনু চমকালো না, যেন এই প্রশ্নটা শোনার জন্যই সে প্রস্তুত ছিল। তবে জবাবও দিলো না সে। ফোরকান আলী চোখ সরু করে তাকালেন, আপনি এসেছেন, ভালোই হয়েছে, দুয়েকদিনের মধ্যে আমিই আপনাকে ডাকতাম। আপনি আলতাফ হোসেন নামে কাউকে চেনেন?

জি চিনি।

উনার সাথে আপনার সম্পর্ক কী ছিল?

উনি আমার বস ছিলেন।

এটুকুই?

জি।

উনার সাথে আপনার বিষয়ে আমাদের কথা হয়েছে।

অনু অধৈর্য হয়ে উঠল, সে বলল, একটা কথা বলি ফোরকান সাহেব?

জি বলুন।

আপনার কী সত্যি মনে হচ্ছে যে জায়েদের খুনের সাথে বা এই আর কী কী সব বিজনেস টিজনেসের কথা বলছিলেন, এগুলোর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক আছে?

আমার মনে হওয়ায় কী যায় আসে? ঘটনা সত্যি কি-না, সেটা হলো আসল।

যদি এটাই সত্যি মনে হয়, তাহলে আপনি আমাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে পুলিশ কাস্টোডিতে এনে রাখতে পারেন। বিষয়টা আমি আর নিতে পারছি না, প্লিজ। আমার ধারণা সেটা বরং আমার জন্য একটা ফেভার হবে। কিছুদিন অন্তত। নিশ্চিন্তে থাকতে পারব।

ফোরকান আলী হেসে প্রসঙ্গ পাল্টালেন, বাসা ছেড়ে দিয়ে উঠবেন কোথায়?

কোনো হোস্টেলে।

কেন? ঢাকায় আর কোনো রিলেটিভ নেই?

নাহ্।

আপনার বড় চাচা, মামা?

ওনাদের সাথে থাকার মতো সম্পর্ক নেই।

ও আচ্ছা। আপনি বরং এক কাজ করুন, এই মাসের পর হোস্টেলেই উঠে যান। তবে ওঠার আগে ঠিকানাটা মনে করে দিয়ে যাবেন প্লিজ।

পরের মাসের শুরুতেই অনু বাসা ছেড়ে দিলো। সে উঠল ফার্মগেটের কাছে মণিপুরি পাড়ার এক কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে। বাসার জিনিসপত্র বেশিরভাই বিক্রি করে দেয়াতে হাতে বেশ কিছু নগদ টাকাও এলো। কিন্তু ওই শূন্য বাড়িটাতেই সবকিছু রেখে নিজেই যেন পুরোপুরি শূন্য হয়েই এসেছে সে। প্রথম ক'টা দিন কী তীব্র হাহাকার যে ভেসে বেড়ালো বুকের ভেতর! হোস্টেল ভর্তি এত এত মেয়ে, এত এত গল্প, কলরোল। কিন্তু তার কিছুই তাকে মুহূর্তের জন্যও স্পর্শ করলো না। যেন অজস্র পাখির তুমুল কলকাকলির ভিড়েও একা এক নিঃসঙ্গ, নিঃশব্দ ডানা ভাঙা পাখি সে। সারাক্ষণ চুপচাপ জানালার পাশে বসে থাকে। এই একটা দিক অবশ্য ভালো, এখানে চার তলার উপরের এই জানালাটা সারাক্ষণ খুলে রাখতে পারে সে। এখান থেকে আকাশ দেখা যায়। চাইলেই একা একা কথাও বলা যায় আকাশের সাথে।

এখানে প্রতি রুমে দুজন করে থাকার ব্যবস্থা। তবে দিনভর একা একাই থাকে অনু। হোস্টেলের বেশিরভাগ মেয়েরাই কাকভোরে কাজে বের হয়ে যায়। সেদিন দুপুরে একা বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ করেই অয়নের নোটবুকটার কথা মনে পড়লো অনুর। উঠে গিয়ে ব্যাগ থেকে নোটবুকটা নিয়ে এলো সে। আজ এতদিন পর এই নির্জন একলা দুপুরে অয়নের সাথে কথা বলতে কী যে ইচ্ছে করলো অনুর!

অনুর হাতের আঙুলগুলো যেন তিরতির কাঁপছে। সে দমবন্ধ অনুভূতি নিয়ে প্রথম পাতাটা ওল্টালো, তারপর দ্বিতীয় পাতা, তারপর তৃতীয় পাতা। কিন্তু কোথাও কিছু লেখা নেই। অনু একের পর এক পাতা ওল্টাতে থাকল। তার বুকের ভেতর হঠাৎ করেই কেমন ফাঁকা হয়ে যেতে থাকল। এই এতটা দিন যেন অয়ন তার সাথেই ছিল। সে ভেবেছিল, সে চাইলেই হয়তো যখন তখন অয়নের সাথে কথা বলতে পারবে, অয়নের কথা শুনতে পারবে। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে তার মনে হলো, অয়ন কোথাও নেই। কোথাও না।

অয়ন অবশ্য ফিরে এলো নোটবুকটার শেষের দিকে গিয়ে। আগস্ট মাসের তেরো তারিখের পৃষ্ঠায় অয়নের লেখা খুঁজে পেল অনু। একটা পৃষ্ঠার প্রায় পুরোটা জুড়ে কাটাকুটি। অনেক কিছু লিখতে গিয়েও শেষ অব্দি যেন কী লিখবে, তা-ই মনস্থির করতে পারছিল না অয়ন। পরের পৃষ্ঠায় সে গোটা গোটা অক্ষরে লিখেছে, আচ্ছা, কেউ যদি আচমকা জেনে যায়, তার মৃত্যু আর কয়েকদিন পরই, তাহলে কেমন লাগবে তার? সবার প্রথম সে কী ভাববে?

এই কয়েকটা মাত্র শব্দ, কিন্তু অনু যেন তার ভার বহন করতে পারছিল না। তার সারা শরীর কাঁপছিল, অয়ন তাহলে আগেভাগেই জেনে গিয়েছিল? অথচ কাউকে সে ঘুণাক্ষরেও তা বুঝতে দেয়নি! আসলেই তো, কেমন লাগবে তার?

অনু নিষ্পলক তাকিয়েই রইল। যেন কত কত কালের কত কত ব্যথা সেই শব্দগুলোর বুকের ভেতর জমে ভার হয়ে আছে। অনু হাত বাড়িয়ে আলতো করে শব্দগুলো ছুঁয়ে দিলো। তারপর পাতা ওল্টালো, আবার কাটাকুটি। কাটাকুটি শেষে আবার লেখা,

রাতটা যে কী বিশ্রী! একটুও ঘুম হয় না, অথচ সারাটা রাত ঘুমের ভান ধরে পড়ে থাকতে হয়। সন্ধ্যা নামতেই অপেক্ষায় থাকে, কখন আমি ঘুমাবো! ঘুমালেই পা টিপে টিপে এসে মাথার কাছে বসে থাকে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো আমি তখন মায়ের বুকের শব্দ টের পাই। মা কি টের পায় যে আমি ঘুমের ভান ধরে জেগে আছি? মনে হয়, পায় না।

মার ধারণা, শেষ অব্দি কোনো একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটে যাবে। সেদিন মাঝরাতে শুনি মা বেনুকে ডেকে ফিসফিস করে কী বলছে! অনেক কষ্টে কান পেতে শুধু বাবর শব্দটা শুনলাম, কিন্তু বাবর কে? সেই বাকিটা রাত আমি বাবর কে ভাবতে ভাবতে ভাবতে কাটিয়ে দিলাম। আমাদের চেনা পরিচিত কারো মধ্যে তো বাবর নামের কেউ নেই, তাহলে? একটা সুবিধা অবশ্য হয়েছে, রাতটা কাটিয়ে দেয়ার এটা একটা ভালো উপায়। বাবরের কথা চিন্তা করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে গেলাম আমি!

মা প্রায় রাতেই বিছানার পাশে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত জায়গাজুড়ে অসংখ্যবার পায়চারি করতে থাকে। আমি কিছুক্ষণ গুনতেও চেষ্টা করি, মা কতবার হাঁটলো! কিন্তু শেষে সব এলোমেলো হয়ে যায়। আমার ধারণা ছিল, এভাবে গুনতে গুনতে একসময় আমার ঘুম এসে যাবে, কিন্তু আসে না। শেষ রাতের দিকে মা জায়নামাজে বসে গুঙিয়ে

গুঙিয়ে কাঁদে। আমার প্রায়ই ইচ্ছে হয়, মাকে ডেকে বলি, মা, তুমি এমন কাঁদলে আমার কষ্ট হয়। খুব কষ্ট।

তারপর আবার মনে হয়, থাক। মা হয়তো ওই কান্নার মধ্যেই একটা কোনো আশা খুঁজে পায়। ভাবে তার কান্না শুনে আল্লাহ যদি সবকিছু ঠিক করে দেয়! মানুষ তো আশা নিয়েই বাঁচে। আমারও মাঝেমধ্যে ভাবতে ইচ্ছে হয়, কোনো একটা অলৌকিক ঘটনা যদি ঘটে, আর আমার অসুখটা যদি ঠিক হয়ে যায়।

বাবরের রহস্যটা আজ উদ্ধার হলো। মা সম্ভবত মোগল সম্রাট বাবর আর তার পুত্র হুমায়ুনের ঘটনাটা সেদিন বেনুকে বলছিল। গল্পটা ছোটবেলায় পড়েছিলাম বলে মনে করতে পারছিলাম না। পুত্র হুমায়ুনের অসুখ নিজের শরীরে নিয়ে পিতা মারা গেলেন। বেঁচে রইল পুত্র। মার ধারণা ঠিকঠাক চাইতে পারলে আল্লাহ হয়তো বাবরের মতো মার জীবনের বিনিময়েও আমাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে!

অনু আচমকা নোটবুকটা বন্ধ করে ফেলল। সে তাকিয়ে আছে জানালা দিয়ে বাইরে। ঝা ঝা দুপুর রোদে একটা মানুষ হেঁটে যাচ্ছে। তার হাতে ঝকঝকে একটা টিনের মগ বা কিছু। সেই মগে রোদ পড়ে চকচক করছে। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যাচ্ছে না। চোখ জ্বালা করছে।

অনুর রুমমেট মেয়েটার নাম নাবিলা। নাবিলার ফিরতে বেশ দেরি হয়। প্রথম দু'তিন দিন দুজনের পরিচয়। আগে কী করতো, এখন কী করবে, এইসব নিয়ে অল্পবিস্তর কিছু গল্প হয়েছিল। কিন্তু তারপর মেয়েটা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ায় আর কথা হয়নি। আজ সে ফিরেই বলল, সারাদিন একা একা কী করেন আপু?

রিকশা গুনি।

কতগুলো গুনলেন?

গুনে মনে রাখতে পারি না। মাঝখানে এসে এলোমেলো হয়ে যায়।

আপনি তো হিসেবে কাঁচা আপু। মেয়েদের হিসেবে কাঁচা হলে হয় না।

অনু হাসলো, পাকা হলেও কিছু হয় না।

কেন?

কারণ মেয়েদের হিসাবেরও হিসাব থাকতে হয়।

মেয়েটা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আপনার কথাটা পছন্দ হয়েছে আপু।

আপনি কোথায় জব করেন?

একটা প্রাইভেট ফার্মে।

কী করে ওরা?

মূলত: প্রিন্ট আর প্রিন্টিং ম্যাটেরিয়ালসের কাজ, সাথে প্রিন্টিং মেশিনও করছে নতুন করে। আগে বাইরে থেকে মেশিন হায়ার করে কাজ চলত। কিন্তু এখন নিজেরাই দুটো মেশিন কিনেছে।

অফিস কোথায়?

ফকিরাপুল।

এত দূর থেকে কীভাবে যান?

হেঁটে খামার বাড়ি চলে যাই, ওখান থেকে বাস। একটু ঝামেলা হয়, বাট ম্যানেজ হয়ে যায়।

অনু সরাসরিই বলল, কোনো কাজের সুযোগ থাকলে আমাকে জানিয়েন তো!

আমি আপু ওখানে প্রায় চার বছর ধরে আছি, এইজন্য বেতন যা পাই, মোটামুটি চলে যায়। কিন্তু এমনিতে বেতন খুব কম, আর যে ধরনের কাজ, আপনার হয়তো পছন্দ হবে না।

কী ধরনের কাজ?

এই প্যাকেজিং ট্যাকেজিং, এছাড়া ক্লায়েন্ট সার্ভিস আছে, ডিজাইনিং আছে।

এর আগে একটা এজেন্সিতে কিছুদিন ক্লায়েন্ট সার্ভিসের কাজ আমি করেছি।

আচ্ছা আপু, আমি দেখি, কিছু করা যায় কি-না!

রাতে অনু জেগে রইল দীর্ঘসময়। সকালে উঠতে হয় বলে নাবিলা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে। অনুকেও তাই লাইট নিভিয়ে অন্ধকারে বসে থাকতে হয়। নাবিলা অবশ্য বলেছিল, আলোতে ঘুমাতে তার সমস্যা হয় না। মশারির উপর একটা কিছু দিয়ে আড়াল করে নিলেই হয়। কিন্তু অনু তাও লাইট জ্বালায় না। বরং অন্ধকারই তার ভালো লাগে। আর পড়বে না, পড়বে না করেও অনু বালিশের তলা থেকে নোটবুকটা বের করলো। সামান্য খোলা জানালায় বাইরে থেকে আবছা আলো আসছে, তারপরও মোবাইল ফোনের আলোটা খানিক আড়াল করে জ্বেলে নিলো সে। তারপর পাতা ওল্টালো। অয়ন লিখেছে

আজকাল ঘুমের ভান ধরে থাকতেও ভীষণ ভয় হয়, মনে হয় চোখ বুজলে যে ঘুটঘুঁটে অন্ধকার, সেই অন্ধকার থেকে যদি আর কখনো ফিরে আসতে না পারি! এই ভয়টা খুব খারাপ। সারাক্ষণ তাড়িয়ে বেড়ায়, কিন্তু তারপরও মা'র জন্য সন্ধ্যার পরই ঘুমের ভান

ধরে পড়ে থাকতে হয়। মা সারাটা দিন অপেক্ষায় থাকে, কখন আমি ঘুমাবো, আর সে আমার পাশে এসে মোনাজাতে বসবে। কী অদ্ভুত এক লুকোচুরি খেলা যে আমরা সবাই মিলে খেলছি! আমার কাছ থেকে সবাই যেটি লুকিয়ে রাখছে, সেটি আমি জানি। অথচ আমি যে জানি, সেটিও আমি সবার থেকে লুকিয়ে রাখছি!

আচ্ছা, মরে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে কী আমি বুঝতে পারব, যে আমি মারা যাচ্ছি? অনেক কষ্ট হবে তখন? মাঝেমধ্যে ভাবি, দূর, সবাইকেই তো একদিন না একদিন মরে যেতে হবে। এত ভয়ের কী আছে! কিন্তু পরক্ষণেই কী তীব্র এক ভয়, সবকিছু মুহূর্তেই শূন্য হয়ে যায়। অথচ এটা কাউকে বলতে পারছি না। এর চেয়ে কষ্টকর কিছু কী আর পৃথিবীতে আছে? ছোটবেলা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেলে মা দোয়া পড়ে ফুঁ দিয়ে দিতো, আর সাথে সাথেই ভয়টা কোথায় উধাও হয়ে যেত! মাকে তখন কেমন অন্যরকম মনে হতো, মনে হতো মায়ের বুঝি অলৌকিক কোনো ক্ষমতা আছে, জাদুটাদু কিছু জানে! এখনো খুব ইচ্ছে করে, মাকে যদি বলতে পারতাম, মা আমার মরে যেতে খুব ভয় হয়, তোমাদের ছেড়ে একা একা আমি থাকতে পারব না মা। আমার প্রচণ্ড ভয় হয়। আমাকে জড়িয়ে ধরে দোয়া পড়ে একটা ফুঁ দিয়ে দাও মা। আমার খুব নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে একটু ঘুমাতে ইচ্ছে করে। ঠিক ছোটবেলার দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে কেঁদে-কেটে জড়সড় হয়ে যাওয়া সেই ছেলেটার মতো আমাকে একটু ফুঁ দিয়ে ঘুম পারিয়ে দাও। প্লিজ মা, আমার ভয়টা একটু দূর করে দাও।

কী আশ্চর্য! এসব কেবল ভাবি-ই। অথচ, কাউকে কিছু বলতে পারি না। কাউকে কিছু বলতে পারব না!

ভয় পেলে মানুষ তার প্রিয় মানুষ, আপন মানুষ, সবচেয়ে নির্ভরতার মানুষলোকে খোঁজে। তাদের জড়িয়ে ধরে আশ্রয়, সাহস পেতে চায়। অথচ কী এক অদ্ভুত হিসাব, এই প্রচণ্ড ভয় নিয়েও আমি কাউকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে পারছি না, সাহস খুঁজতে পারছি না। কাউকে বলতেও পারছি না, এর চেয়ে বেশি কষ্ট কী আর কিছুতে হয়? আমি জানি না। আমার যে কী ভীষণ কান্না পায়, কী ভীষণ! কিন্তু আমি কার কাছে গিয়ে কাঁদবো?

আমার চারপাশজুড়ে সবাই আমার প্রিয়তম মানুষ, তারা সারাক্ষণ আমার চারপাশে ঘুরছে, অথচ এই সবার মাঝে থেকেও কী প্রচণ্ড একা একটা মানুষ আমি, কী অবর্ণনীয় আতঙ্ক বুকে পুষে কাটিয়ে দিচ্ছি দীর্ঘতম একেকটি মুহূর্ত..।

আগেভাগে মৃত্যুর কথা জেনে যাওয়ার মতো এমন ভয়ংকর কিছু কী আর পৃথিবীতে আছে!

আজ নুহার কথা খুব মনে পড়ছে। সেদিন নুহা যখন আদিল ভাইয়ের কথা বলল, আমার অমন কেন লাগল? নুহা ঠিকই বলে, আমি একটা গাধা। গাধা না হলে এমন কখনো হয়? এই এতটা দিন, এতগুলো বছরেও ওকে আমি একটুও বুঝতে পারিনি, নুহাও আমাকে

না। অথচ আমি ভাবতাম, আমরা আমাদের সবটুকু বুঝি! অবশ্য আমি নিজেকেই তো কত দেরি করে বুঝলাম, নুহার আর দোষ কী! আচ্ছা, আমি মরে যাওয়ার পর নুহা কী করবে? আমার খুব ইচ্ছে করছে, নুহাকে ভালোবাসি বলে যেতে। এমন করে কাউকে ভালোবাসলে তাকে জানিয়ে কী মরে যাওয়া উচিত? তাহলে ভালোবাসাটা আর থাকল কই?

একটা খুব বিদঘুঁটে ইচ্ছে হচ্ছে, যদি মরে যাওয়ার পরও ঠিক ঠিক দেখা যেত, সবাই কেমন করছে? আচ্ছা, নুহা কি করবে তখন? কাঁদবে? নিশ্চয়ই কাঁদবে। একটু হলেও তো আমায় ভালোবাসে ও। অন্যরকম ভালোবাসা না। হোক, বন্ধুর মতো তো ভালোবাসে। ও যেখানেই যাক, আমাকে ভুলে থাকবে কী করে! যখন রোজ কোচিংয়ে যাবে, যখন বৃষ্টি নামবে, যখন রিকশায় উঠতে গিয়ে পানির তেষ্টা পাবে, তখন ভুল করে একবারও কী বলে বসবে না, অয়ন, একটা কনকনে ঠান্ডা দেখে পানির বোতল এনে দে না! অবশ্য আদিল ভাইয়ের সাথে বিয়ে হয়ে গেলে ও তো আর রিকশাতেই চড়বে না। তখন নিশ্চয়ই ওদের দামি গাড়ি হয়ে যাবে। আর ও তো তখন দেশেই থাকবে না। তাই বলে আমাকে একদম ভুলে যাবে? এইজন্যই আমার মরে যেতে ইচ্ছে হয় না, মরে গেলে সত্যি সত্যি আর কিছু দেখা যায় না?

আচ্ছা, আমার কবরটা কোথায় হবে? ঢাকায়? আজিমপুর গোরস্থানে কবর হলে না-কি সেই কবর কিছুদিন পর আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কবরের ওপর কবর হতে থাকে। মা, আপুরা কেউ আর তখন আমার কবরের কাছে যাবে না? মৃত্যু জিনিসটা কেমন যেন, কিছুই স্পষ্ট না। কেউ যদি আমার কবরের কাছে যায়, আমি কী তা বুঝতে পারব?

নুহাকে মাথা থেকে তাড়ানো দরকার। কী বিশী একটা ব্যাপার, মরে যেতে থাকা একটা মানুষও সারাক্ষণ অন্য একটা মানুষকে মাথা থেকে তাড়াতে পারে না। মানুষ এমন কেন? না-কি আমি একাই এমন? গতরাতে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলাম, আমার কবর হয়েছে কোনো এক গ্রামে। চারপাশে জঙ্গল, বিশ্রী গন্ধ। বৃষ্টি হয়েছে বলে নিচের মাটি জল কাদায় মাখামাখি। অবাক ব্যাপার হচ্ছে, সেই অবস্থায়ও আমি নুহাকে দেখতে পাচ্ছি। সে ঝকমকে এক রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। বারবার আমার নাম ধরে ডাকছে। কিন্তু আমাকে দেখতে পাচ্ছে না। রাস্তার দু'ধারে গাছ, গাছে রংবেঙের পাতা। দেখতে কী যে ভালো লাগছে! নুহা আমাকে খুঁজছে বলে আমার হঠাৎ অভিমান হতে লাগল। আমি ভাবলাম, নুহার ডাকে আমি সাড়া দেব না। আমি চুপচাপ অভিমান নিয়ে রয়ে যাব। কিন্তু আমার হঠাৎ খুব কষ্ট হতে লাগল। নুহা একবারও আমার দিকে তাকাচ্ছে না। সে হঠাৎ গুনগুন করে গান গাইতে শুরু করলো। আমি এবার তাকে ডাকলাম, সে শুনতে পেল না। তার কানে হেডফোন। আমি গলার স্বর উঁচু করে ডাকলাম, নুহা! সে তাও শুনতে পেল না। আমার কী যে কষ্ট হচ্ছিল, কী যে কষ্ট! আমি চেষ্টা করছিলাম নুহার দিকে কিছু একটা ছুঁড়ে মারতে, নুহা যাতে আমাকে দেখতে পায়। আমার সামনেই একটা মাটির ঢেলা। কিন্তু হাত তুলতে গিয়ে দেখলাম, আমি হাত তুলতে পারছি না, হাত দুটো কেমন যেন

অসাড় হয়ে আছে। শরীর নাড়াতে গিয়ে দেখলাম শরীরও নাড়াতে পারছি না। আমার কষ্ট হতে থাকল, অবর্ণনীয় কষ্ট। আমি নুহাকে চিৎকার করে ডাকতে থাকলাম, উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করতে থাকলাম। কিন্তু কিছুতেই শরীরের সামান্য একটা অংশও নাড়াতে পারছিলাম না। এই মুহূর্তে আমি আদিল ভাইকে দেখলাম। আদিল ভাই নুহার জন্য ফুল নিয়ে এসেছে, নুহা আদিল ভাইকে দেখে দৌড়ে ছুটে গেল। সে আসলে এতক্ষণ আদিল ভাইয়ের অপেক্ষায় ছিল! আমার আচমকা কান্না পেল। কিন্তু কান্না আটকে আমি নুহাকে চিৎকার করে ডাকতে থাকলাম। আমার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের হচ্ছে না। আমার মনে হচ্ছিল আমি দম আটকে মারা যাব। সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো, আমি তো মৃতই! মৃত মানুষের আবার দুঃখ-কষ্টের অনুভূতি কী? আমার কবরের মেঝেতে বৃষ্টির কাদাজলে আমার পিঠ ভিজে গেছে। আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখি মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ঘামে আমার শার্ট, পিঠ, বিছানা ভিজে জবজব করছে। মা আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, অয়ন, দুঃস্বপ্ন দেখেছিস বাবা? আমি কোনো জবাব দিলাম না। আমার সেই মুহূর্তে কেন যেন মনে হলো, আমার সত্যি মত্যিই মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

অনু নোটবুকটা বন্ধ করে নিঃসাড় শুয়ে রইল। দূরে কোথাও সাইরেন বাজছে, অনু জানে না, সাইরেনটা কিসের। কিন্তু রাতের নিস্তব্ধতাকে সূক্ষ্ম সুতোয় মিহি করে কাটার মতো তীক্ষ্ণতায় চিড়ে দিচ্ছে সেই বিষণ্ন শব্দ। অনুর মনে হলো, তার বুকের কোথাও সেই বিষণ্ন শব্দ যেন মিহি সুতোর মাথায় গাঁথা সুইয়ের মতো বিধে বিধে যাচ্ছে।

*

শামীম চুপচাপ বসে আছে। তার সামনে অনেকগুলো টাকার বান্ডিল হাতে বসে। আছে আজম। আজম বলল, শামীম ভাই, প্রথম যেদিন আপনার সাথে দেখা হইছিল, সেদিনের কথা মনে আছে?

শামীম বলল, আছে।

আপনে সন্ধ্যার পরপর আপনের শ্বশুরবাড়িরতন বাইর হইয়া মোড়ের চায়ের দোকানের ওইখানে আসলেন। আমি গিয়া আপনেরে ফোন দিলাম, আপনে পকেট থেইকা ফোন বাইর করতেই আমি গিয়া জিগাইলাম, শামীম ভাই? আপনে বললেন, হ্যাঁ। আমি হ্যান্ডশেক করতে করতে বললাম, আমি আজম। মনে আছে?

থাকবে না, কেন?

থাকবে না। কারণ, এই লাইনটা অবিশ্বাসের। এইখানে কেউ কাউরে বিশ্বাস করতে চায় না। আপনার হাত যখন আমি ধরলাম, আমি কিন্তু তখনই টের পাইছিলাম, আপনের হাত থরথর কইরা কাঁপতেছিল। আপনি ভয়ে পুরা রিকশায় কোনো কথা বলেন নাই।

ভয়তো পাবারই কথা।

হুম। তো মাঝখানে দেড় বছর না দুই বছর? এর মধ্যেই আপনে চাইতেছেন, এখন আপনের ভয়ে আমি তেমনে থরথর কইরা কাঁপবো?

আজম ভাই, তা তো বলি নাই। আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। ওয়াসিম ভাই আমাকে ডাকছিলেন। উনি নাই, এই মুহূর্তে সব হিসাব-নিকাশ, মার্কেটের অবস্থা, পুলিশি হয়রানি এমন আরো নানান বিষয়াদি নিয়া উনি চিন্তিত। ঠিকঠাক মতো অনেক হিসাব-নিকাশও পাইতেছেন না। এই জন্য একটু নাখোশ দেখলাম। এখন যেভাবেই হোক, বিষয়টা উনি আমাকে দেখতে দিছেন, এটা তো আমার দায়িত্ব তাই না?

আজম কোনো কথা বলল না। শামীম বলল, একসাথে যখন কাজ করছি, মিলেমিশেই তো করতে হবে। এখন এই দায়িত্বটা যেহেতু আমারই বুঝিয়ে দিতে হয়, এইজন্যই তো আপনাদের সাথে আমার ঠোকাঠুকি হচ্ছে। এর আগে কখনো হয়েছে?

আজম গম্ভীর গলায় বলল, আমরা চাই নাই বইলা, হয় নাই। চাইলেও হওনের মতো অনেক ব্যাপারই আছিল। এতবছর ধইরা বসের সাথে কাজ করি, আর আপনে শুকুরে শুকুরে আষ্ট দিন হয় আইসাই আমাগো সবাইর উপরে তাবেদারি শুরু করছেন। বিষয়টা এত সহজে মাইনা নেওনের বিষয় না শামীম ভাই। যাউকগা, এইখানে গত দুই মাসের টাকা আছে। আর বাকি দুইমাসের টাকাও দিয়ে দিবো।

শামীম কোনো কথা বলল না। সে টাকাগুলো গুনে ব্যাগে ভরে নিলো।

.

রাতে বাসায় ফিরে কিছু খেলোনা শামীম। তনু বলল, খাবে না?

উঁহু।

কেন?

এমনি।

এমনি কেন?

শামীম হঠাৎ রেগে গেল। তোমার কাছে সবকিছুর জবাবদিহি করতে হবে, হা? তোমার কাছে আমার সবকিছুর কৈফিয়ত দিতে হবে?

তনু কথা বলল না। শামীমের বাইরে থেকে এসে খুলে রাখা পোশাক ভাঁজ করে সে আলনায় রাখলো। তারপর গোসলের গরম পানি দিলো। শামীম রাগী গলায় বলল, আমি গোসল করব না।

তুমি তো কখনো বাইরে থেকে এসে গোসল না করে থাকো না।

এখন থেকে থাকব।

কী হয়েছে আমাকে বলবে?

শামীম এবার কোনো জবাব দিলো না। গভীর রাতে তনু হঠাৎ শামীমের একটা হাত টেনে এনে তার নিজের পেটের ওপর রাখলো। শামীম প্রথমে হাতটা সরিয়ে নিতে চাইলেও তনুর কারণে পারল না। তনু তার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে রাখলো পেটের ওপর। শামীম চুপচাপ শুয়ে রইল। কিন্তু দীর্ঘসময় ধরেও সে বুঝতে পারল না তনুর পেটের ভেতর কিছু নড়ছে কি-না, কোনো শব্দ হচ্ছে কি-না।

তনু হঠাৎ নরম গলায় বলল, তুমি রোজ রাতে জেগে থাকো?

শামীম জবাব দিলো না। তনু বলল, একটা রাতও ঠিকঠাক ঘুমাও না তুমি?

তোমাকে কে বলল?

আমি টের পাই।

কী টের পাও?

তুমি যে সারারাত জেগে থাকো। আর খুব অস্থির হয়ে থাকো।

শামীম জবাব দিলো না। তনু বলল, আরো একটা জিনিস টের পাই।

কী?

তুমি যে রাতে চুপি চুপি চোরের মতো আমার পেটে হাত দাও!

শামীম এবারও কথা বলল না। তনুই বলল, হাফসার সময়ও তুমি এই কাজটাই করতে। কিন্তু হাফসা হওয়ার আগে আগে যখন আমাকে মা'র বাসায় চলে যেতে হলো, তারপর থেকেই তুমি কেমন হয়ে গেলে! সেই তোমাকে আমার চেনা মনে হতো না। আমি জানি, তুমি ওই সিচুয়েশনটা মেনে নিতে পারো না। অনেক ভয় পাও।

শামীম চুপ করেই রইল। তনু পাশ ফিরে শামীমের দিকে সামান্য ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল, কিন্তু তোমার সন্তানদের ভালো রাখতে গিয়ে তুমি যদি ভয়ংকর কোনো বিপদে পড়ে যাও তাহলে সেই বিপদে তো আমরা সবাই-ই পড়বো, তাই না? তোমার কোনো ক্ষতি হয়ে গেলে, আমরা তখন কই যাব বলো?

তনু একটু থামলো। তারপর আবার বলল, বড়'পু একটা কথা বলেছিল, তোমাকে বলতে ভয় হচ্ছে, তাও বলি। বড়পু বলছিল, মার একটা ডিপিএসের কিছু টাকা জমেছিল। বড়পু টাকাটা আমাদের দিয়ে দিতে চায়। ও বলেছে, আমরা যেন তোমাদের গ্রামের দিকে চলে যাই। ওখানে ওই টাকায় কিছু একটা করা যাবে। বড়'পু আমাদের নিয়ে খুব ভয় পাচ্ছে।

শামীম তনুর পেটের ওপর থেকে ধীরে হাতটা সরিয়ে নিয়ে পাশ ফিরে শুলো। তনু বলল, আমার খুব ভয় হচ্ছে শামীম। ওয়াসিম খুব খারাপ মানুষ, আমার মনে খুব কু ডাক ডাকছে। মনে হচ্ছে, তুমি খুব বড় ধরনের কোনো একটা ঝামেলায় জড়িয়ে যাবে।

কিসের ঝামেলা?

কিসের ঝামেলা আমি জানি না। কিন্তু এইসব কাজ যারা করে, তাদের সবসময় বিপদের মুখেই থাকতে হয়। পুলিশের বিপদ, নিজেদের মধ্যে বিপদ। তারপর আবার জায়েদের খুনের ঘটনা নিয়ে পুলিশের এইসব সন্দেহ। তুমি বুঝতে পারছ না শামীম।

শামীম হঠাৎ শক্ত গলায় বলল, আমার টাকা দরকার, টাকা ছাড়া ওই সময়টাতে আমি আর ফিরে যেতে পারব না। টাকার জন্য বিপদ হলেও ওই অবস্থাটার চেয়ে অন্তত ভালো থাকব। তুমি দয়া করে এই মাঝরাত্রিতে আর ফ্যাচফ্যাচ করো না।

তনু হাত বাড়িয়ে শামীমকে নিজের দিকে ঘোরাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু শামীম শক্ত হয়ে পাশ ফিরেই শুয়ে রইল। তনু বলল, তুমি সত্যি করে বলো তো, তুমি নিজে বিষয়টা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছ না?

না।

আমার কাছে মিথ্যে বলো না শামীম। তোমার চেহারা আমি চিনি, তুমি ভয় পাচ্ছ। কিন্তু তুমি টাকার লোভটা ছাড়তে পারছ না।

শামীম ঝটকা মেরে তনুর হাতটা তার শরীর থেকে সরিয়ে দিলো। সেই সারাটা রাতও শামীম ঘুমাতে পারল না। শেষ রাতের দিকে তার খুব ভয় হতে লাগল। সে চায় না, তার এই সন্তানটিও পৃথিবীতে এসে হাফসার মতো কষ্ট করুক। সে হাফসাকেও আর কষ্ট করতে দেখতে চায় না। সে জানে, পিতা হয়ে। সন্তানের প্রয়োজন কিংবা চাহিদাগুলো নিজ হাতে পূরণ করতে না পারাটা কী ভীষণ কষ্টের। নিজের এই অক্ষমতাটা সে বিন্দুমাত্র মেনে নিতে পারে না। কিন্তু তার ভেতর ক্রমশই একটা ভয়ও জাঁকিয়ে বসছে। যদি তার কিছু হয়ে যায়, সে যদি কোনো বিপদে পড়ে যায়, তাহলে হাফসা, তনু আর তার অনাগত সন্তানের। কী হবে!

.

শামীম দোকানে বসেছিল, এই মুহূর্তে একটা পুলিশের ভ্যান এসে তার দোকানের সামনে থামলো। গাড়ি থেকে ফোরকান আলী একা নেমে এলেন। তার হাতে একটা ওয়াকিটকি। তিনি ওয়াকিটকিতে কারো সাথে কথা বলছিলেন। ফোরকান আলীকে দেখে শামীম উঠে দাঁড়ালো। পুলিশের অন্য কিছু অফিসার কিংবা কনস্টেবলদের সাথে কথাবার্তা হলেও এই লোকের সাথে শামীমের আগে কোনো কথা হয়নি। ফোরকান আলী দোকানের সামনের টুলটাতে বসে চোখ থেকে রোদ চশমাটা খুলে শামীমের সামনের টেবিলে

রাখতে রাখতে বললেন, কফি আনান, বড় এক মগ, আগুন গরম। সাথে ডাল পুরি, বড় সাইজের দুইটা।

শামীম অবাক হয়ে ফোরকান আলীর দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ ডালপুরির সাথে কফির অর্ডার দিতে পারে, এটা তার ধারণা ছিল না। ফোরকান আলী ওয়াকিটকিতে জরুরি কী সাংকেতিক কথাবার্তা বলছিলেন। তিনি কথা বলতে বলতেই শামীমকে আবার চোখের ইশারায় খাবার আনাতে বললেন।

ফোরকান আলী কফির মগে ডালপুরি ডুবিয়ে কামড় দিতে দিতে বললেন, ব্যবসাপাতি না-কি খুব ভালো যাচ্ছে আজকাল?

শামীম বুঝতে পারছিল না সে কী বলবে! ব্যবসাপাতি বলতে ফোরকান আলী কোন ব্যবসার কথা বলছেন, এটা নিয়ে শামীম কিঞ্চিৎ দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লো। সে একগাল হেসে বলল, এই তো স্যার, চলে যাচ্ছে কোনো মতে।

কোনো মতে চললে হবে? তাহলে আমাদের কী হবে?

শামীম যেন ফোরকান আলীর কথা বুঝতে পারল না। সে বলল, জি স্যার?

আরে বুঝলেন না? পুলিশের চাকরি, যা দু'পয়সা বেতন পাই, তাতে কী ঘর সংসার, ছেলেপুলে নিয়ে চলে? চলে না। টুপাইস যা আসে, তা তো। আপনাদের কাছ থেকেই। তা আপনাদের ব্যবসাপাতি ভালো না চললে হবে?

কী যে বলেন না স্যার? শামীম লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল। ঠিকই বলি। ছেলে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, মেয়ে কলেজে। এতকিছু কেমনে সামলাই পুলিশের চাকরি করে? সম্ভব না। এইজন্য আপনারাই হলেন শেষ ভরসা। হা হা হা।

শামীমও বিনীত ভঙ্গিতে ফোরকান আলীর হাসিতে যোগ দিলো। ফোরকান আলী বললেন, তা আপনাদের বড় ভাইর খবর কী?

তার খবর তো স্যার আপনাদের কাছে। আমরা চুনোপুঁটি মানুষ, তাদের খবর আমরা কী জানবো?

কেন? টেকনাফ যে গেলেন? দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই? না-কি এখন থেকে। আপনি নিজে নিজেই টেকনাফ থেকে মাল আনার কাজ করেন?

শামীম থতমত খেয়ে গেল। সে যে টেকনাফ গিয়েছিল ওয়াসিমের সাথে দেখা করতে, এবং এই ঘটনা যে পুলিশ অব্দি জানে, এটা সে ভাবতে পারেনি। ফোরকান আলী বললেন, বড় ভাই আসবেন না?

সেটা তো স্যার আমি বলতে পারব না।

ফোরকান আলী খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর শামীমের কাঁধে মৃদু চাপড় মারতে মারতে বললেন, ইউ আর আ গুড চয়েস ফর হিম। এই বিজনেসে আপনার মতো বিশ্বাসযোগ্য লোক খুব দরকার, বুঝলেন? বড় ভাই মানুষ চিনতে ভুল করেন নাই।

.

সেই রাতেও শামীম ঘুমাতে পারল না। একটা মানসিক ট্রমার মতো যেন হয়ে যাচ্ছে তার। সারারাত মাথায় এলোমেলো অসংখ্য চিন্তা ঘুরে বেড়ায়। সহজে ঘুম আসে না। আর খানিক ঘুমালেও বারবার দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠে। সেদিন স্বপ্ন দেখেছে পুলিশ তাকে রায়ের বাজার বদ্ধভূমির পেছনে নিয়ে দিন দুপুরে গুলি করে ফেলে রেখেছে। সে তখনো মারা যায়নি। তবে যে-কোনো সময় মারা যাবে। তার পাশে বসে তনু কাঁদছে। তনুর পাশে ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়ে কাঁদছে ছোট হাফসাও। তবে অবাক ব্যাপার হলো, তনুর কোলে ছোট্ট ফুটফুটে এক শিশু। শিশুটা ছেলে না মেয়ে চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে না। সে হঠাৎ শামীমের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে দিলো। ফোকলা মুখের সেই হাসি। দেখে শামীমের কী যে ভালো লাগল! সে শিশুটার দিকে এগুতে চেষ্টা করলো। কিন্তু পারল না। শরীরে যেন একরত্তি শক্তি নেই তার। ক্লান্তিতে চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল। এই মুহূর্তে শিশুটি তাকে ডাকলো, বাবা! শামীমের বুকের ভেতরটা কেমন কেঁপে উঠল! সে তাকিয়ে শিশুটিকে দেখতে চেষ্টা করলো। কিন্তু পারল না। বারবার সে চেষ্টা করছে, লাভ হচ্ছে না। কোনোভাবেই চোখ খুলে তাকাতে পারল না সে।

সেই থেকে ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে ছিল শামীম। আজকের ঘটনায় তার অস্থিরতা আরো বাড়লো। ফোরকান আলীর সাথে কথা বলার পর থেকে সে আর একটুও স্বস্তি পাচ্ছে না। শামীম এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছে, তাকে চব্বিশ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। সে কখন কোথায় যাচ্ছে, কী করছে, সব কিছুই আড়াল থেকে নজর রাখা হচ্ছে। তনু যা বলেছে, তা একটুও বাড়াবাড়ি নয়। বিষয়টা জানার পর থেকে শামীম অসুস্থ অনুভব করছে। তার মনে হচ্ছে কেউ একজন সবসময় তার কণ্ঠনালী চেপে ধরে রেখেছে।

ভোর রাতে সে তনুকে ঘুম থেকে ডেকে চিন্তিত গলায় বলল, আমি তো ওর কোনো নড়াচড়া টের পাই না।

তনু আচমকা ঘুম ভাঙা গলায় বলল, কার নড়াচড়া?

শামীম তনুর পেটের দিকে আঙুল তুলে ইঙ্গিত করে বলল, ওর।

তনু হাসলো, আরো কিছুদিন যাক, তখন স্পষ্ট পাবে।

শামীম আর কথা বলল না। সে বারান্দায় চলে গেল। ভোরের আলো না ফোঁটা অব্দি সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। তনু শুয়ে শুয়ে এই অদ্ভুত মানুষটাকে দেখতে লাগল। মানুষ চেনা মানুষের পক্ষে কখনোই সম্ভব না। এক ছাদের নিচে, এক বিছানায়, একটা জীবন

কাটিয়ে দিয়েও না। আসলে মানুষ তার নিজের কাছেই তো জীবনভর রয়ে যায় অচেনা, সে অন্য মানুষ চিনবে কী করে!

*

দুপুরবেলা ওয়াসিমের ফোন দেখে শামীম অবাক হলো। ওয়াসিম বলল, কী অবস্থা শামীম? সব ঠিকঠাক তো?

শামীম বলল, জি-না ভাই, একটু সমস্যা মনে হচ্ছে।

কী সমস্যা, আবারো দলের কেউ ঝামেলা করছে? আমি তো সবাইকে বলেই দিয়েছি, তোমাকে যেন কো-অপারেট করে।

না ভাই, দলের কোনো সমস্যা না। তাহলে?

পুলিশের সমস্যা। গতকাল ফোরকান আলী নামের এক অফিসার এসেছিল দোকানে, লোকটার কথাবার্তা একটু কেমন লাগল।

তোমাকে তো একবার বলেছিই যে পুলিশ নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না। ওটা আমি দেখবো। তুমি বিজনেস নিয়ে চিন্তা করবে শুধু। আর শোনো?

জি ভাই।

আমি এখন কক্সবাজারে, এখানে ঢাকা থেকে আমাদের কমিশনার সাহেব এসেছেন। ওনার সাথে আজ কথা বলে দেখবো, ঢাকার কী অবস্থা, কবে নাগাদ ফিরতে পারব। উনি আমার ফেরার সব ব্যবস্থা করে রাখবেন। পুলিশ কিছু করতে পারবে না, তুমি এত টেনশন করো না।

জি ভাই।

তোমার বড় আপার ঘটনা কী জানতে পেরেছ? কাহিনি কী?

জায়েদ মল্লিকের খুনের ব্যাপারে বড় আপাকে পুলিশ থানায় নিয়েছিল।

কী! ওয়াসিম ভীষণ অবাক হলো এই কথায়, তাকে কেন?

পুলিশের ধারণা এখানে কোনোভাবে তারও কোনো যোগসূত্রতা থাকতে পারে। মানে আপনার সাথে তার আগের কোনো ঘটনা ছিল। সেই ঘটনার সাথে সম্ভবত জায়েদ মল্লিকের ইনভলভমেন্টও পুলিশ খুঁজে বের করেছে।

শামীম কৌশলে তার নিজের বিষয়টি এড়িয়ে গেল। তাকে নিয়ে পুলিশ অফিসার যে কথাগুলো অনুকে বলেছিলেন, তার কিছুই সে ওয়াসিমের কাছে বলল না। পুলিশ

পুরোপুরি নিশ্চিত যে, খুনটা আপনিই করেছেন। কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে তো কোনো স্ট্রং এভিডেন্স তাদের কাছে নেই। এইজন্য তারা চাইছে কোনো একটা সূত্র বের করতে। আর সেই সূত্র খুঁজতে গিয়েই এত কিছু!

ওয়াসিম ভারি চিন্তিত হয়ে পড়লো। অনুকে পুলিশ ডেকে নিয়েছে, বা অনু সেখানে কী বলেছে, সেটি নিয়ে ওয়াসিম খুব একটা চিন্তিত না। সে চিন্তিত পুরো ঘটনাটা নিয়েই। পুলিশ কেন এই বিষয়টা নিয়ে এত সিরিয়াস হয়ে উঠল, সেটিই সে বুঝলো না। এই বিষয় নিয়ে পুলিশ বা প্রশাসনের কোনো উচ্চবাচ্য করার কথা ছিল না। তাকে কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে বলা হয়েছিল। সে গা ঢাকা দিয়েই আছে।

মিনিট ত্রিশেকের মাথায় তার সাথে কথা হলো কমিশনার আব্দুল ওয়াহাবের সাথে। তিনি ঢাকা থেকে এসেছেন। এই হোটেলে তার নিয়মিত আসা-যাওয়া। রাজনৈতিক নানান ঝুট-ঝামেলায় ক্লান্ত হয়ে গেলেই তিনি এখানে আসেন। কিছুদিন থেকে আনন্দ বিনোদন নিয়ে ঝরঝরে হয়ে আবার ফিরে যান। ওয়াসিম খবর পেয়ে টেকনাফের দুর্গম এলাকা থেকে ছুটে এসেছে। আব্দুল ওয়াহাব বললেন, কী খবর ওয়াসিম?

খবর তো আপনার কাছে ওয়াহাব ভাই। আমি ঢাকায় কবে ফিরতে পারব?

একটু ধৈর্য ধরো মিয়া। এত অস্থির হলে হয়!

ধৈর্য তো কম ধরলাম না ভাই। দিন তো কম হলো না। এদিকে ঢাকায় আমার ব্যবসাপাতির অবস্থাও ভালো না। নানান সমস্যা হচ্ছে।

একটা মার্ডার তো আর ডাল ভাত না ওয়াসিম। তাও আবার যে সে মানুষ না। জায়েদ মল্লিককে আর দশজন মানুষ চেনে।

কিন্তু এটা তো কথা ছিল না ভাই। কথা ছিল কাজটা জাস্ট করে ফেললেই হলো। তারপর আর কোনো ঝামেলা হবে না। আর কাজ যে আমি করেছি, তার তো কোনো প্রমাণও নেই। তাহলে আমাকে কেন এভাবে লুকিয়ে থাকতে হবে?

একটু ঝামেলা হয়ে গেছে ওয়াসিম। আমি নিজেও তো বুঝিনি যে এটা এমন জটিল হয়ে যাবে। সমস্যা হচ্ছে বিরোধী দল এটাকে একটা ইস্যু করে ফেলছে। এখন আমাদের দলের কেউ চায় না এই মুহূর্তে এটা নিয়ে সরকার কোনো ঝামেলায় পড়ক। এই জন্য সবাই চাইছে এর একটা সুষ্ঠু তদন্ত হোক, বিচার হোক। কারণ এরসাথে সরকারি দলের বড় কোনো প্রফিট নাই। তো তারা এই ব্লেমটা কেন নেবে? বুঝেছ?

আপনি কি সরকারি দলের বাইরে ভাই?

তা না, কিন্তু দলের মধ্যেই তো আমার শত্রু আছে। তারা এই কাজটাকে দলের স্বার্থে কেন দেখবে? এটা আমার পারসোনাল ডিল ছিল।

এই প্রথম ওয়াসিম বিপদটা পুরোপুরি আঁচ করতে পারল। কিন্তু ভাই, আপনি বলছেন বলেই কাজটা আমি করেছি। না হলে এত বড় ঝুঁকি আমি কিন্তু নিতাম না।

ভুল কথা ওয়াসিম। এটা তুমি করতেই। মাঝখান থেকে জায়েদ না থাকলে আমার কিছু পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট ছিল। সেই সুবিধাটাও তুমি নিয়েছ।

ওয়াসিম কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নরম গলায় বলল, কিন্তু ভাই ঘটনা তো ঘটছে। আপনারও লাভ হয়েছে, আমরও জেদ মিটছে। এই হাতটা তো আপনাকে আমি দেখিয়েছি। সেই ঘটনা আমি ভুলতে পারি নাই। সে করাতকলের করাতে আমার আঙুলগুলো কাটছে, আপনি একবার চিন্তা করেন।

তখন তার দল ক্ষমতায়, তুমি কোন সাহসে তার গায়ে হাত তুলছিলে?

কোথাকার কোন এক মেয়ে, তার কথা শুনে সে এসে আমাকে শাসিয়ে গেল। আমি কী সেই মেয়েকে রেপ করেছিলাম? সে আমার ব্যবসাপাতি পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে চাইছিল। আপনিই বলেন, এটা তার বাড়াবাড়ি ছিল না?

ক্ষমতায় থাকলে মানুষ একটু বাড়াবাড়ি করেই। আর তুমি তো দুই দল থেকেই সুবিধা নিয়েছ। জায়েদের দল ক্ষমতা থাকা অবস্থায়ও তুমি বিজনেস করছ, করো নাই? কারণ তোমার সবদলেই আমার মতো বড় ভাই আছে। কিন্তু কখনো কখনো তো কম্প্রোমাইজ করতে হয়, তাই না? সেটা তো তুমি করোনি।

জানেনই তো বড় ভাই, আমার মাথাটা যে একটু গরম। তার ওপর এই ঘটনার পর একটা বছর এলাকায় ঢুকতে পারিনি। এখন ভাই, আপনি যা বলবেন তাই।

তুমি একটু শান্ত থাকো। অস্থির হয়ো না। আগেও তুমি আমার কাজে লেগেছ, ভবিষ্যতেও লাগবে। সুতরাং তোমাকে এই বিপদে আমি একা ছেড়ে যাব না, এটা নিশ্চিন্ত থাকো। তবে সিচুয়েশন ঠান্ডা হতে একটু সময় লাগবে। আর শোনো, এই ঘটনা যদি তুমি নাও ঘটাতে, তারপরও পুলিশ সবার আগে তোমাকেই সাসপেক্ট করত। আর এখনো তাই-ই করছে। তোমার বিরুদ্ধে কোনো তথ্য প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও প্রথমেই কোপটা তোমার উপরই পড়ত। এই জন্যই আমি তোমাকে গা ঢাকা দিতে বলছি। ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার অপেক্ষা করো। তারপরে দেখা যাক কী হয়!

আব্দুল ওয়াহাব সামান্য থেমে আবার বললেন, আর তোমার জন্য আমি কিছুই করছি না, এটা ভেবো না। তুমি কোথায় আছ, এসব তো পুলিশের অজানায় নয়। সবকিছু জেনেবুঝে, এত প্রেসারের পরও যে পুলিশ কিছু করছে না, তা কার জন্য? এটুকু তো অন্তত বোঝো? বোঝো না?

ওয়াসিম মৃদু কণ্ঠে বলল, জি ভাই বুঝি, বুঝব না কেন! তারপরও ভাই, একটু অস্থির তো লাগেই। এমন হবে তা তো ভাবি নাই।

আব্দুল ওয়াহাব ওয়াসিমের কাঁধে হাত রেখে বললেন, সব ঠিক হয়ে যাবে, চিন্তা করো না। আরেকটা কোনো গরম ইস্যু তৈরি হতে দাও, ব্যস। দেখবে এটা দুম করে চাপা পড়ে যাবে। বুঝেছ?

ওয়াসিম মাথা নাড়লো। সে হোটেল থেকে বের হয়ে শামীমকে ফোন দিয়ে বলল, শোনো, আমার মনে হয় সহজে ঢাকা ফেরা হবে না। একটু ঝামেলা হচ্ছে, ঝামেলাটা ঠিক হতে সময় লাগবে।

শামীম উদ্বিগ্ন গলায় বলল, কোনো সমস্যা ভাইয়া?

নাহ, তেমন কিছু না। একটু সাবধানে কাজ করো।

আজমের সাথে গভীর রাত অব্দি নানা পরামর্শ চলল শামীমের। পরদিন দুপুরে ফোরকান আলী আবার আসলেন। এবার আর তিনি বসলেন না, দাঁড়িয়ে থেকেই বললেন, বড় ভাইয়ের আপডেট কী?

জি স্যার, উনি ভালো আছেন।

কথা হয়েছে?

জি স্যার।

কী কথা হলো? এই তো উনি কিছু দিনের মধ্যেই চলে আসবেন।

আবারো মিথ্যা কথা বললেন শামীম সাহেব? বসেন বইয়ের দোকানে, বেচেন ইয়াবা, বলেন মিথ্যা কথা। এভাবে করলে হবে?

জি না স্যার।

তাহলে কী করতে হবে?

সত্যি কথা বলতে হবে।

তা বলেন, সত্যি কথাটা, শুনি?

শামীম খানিক চুপ করে থেকে বলল, স্যার, উনি খারাপ থাকলেও সেটা কী আমাকে বলার কথা?

ফোরকান আলী চোখ বন্ধ করে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, না, তা বলার কথা না।

জি স্যার।

শোনেন শামীম সাহেব, আপনার বড় ভাই ভালো নেই। তিনি বিপদে আছেন, কঠিন বিপদে। পাশার দান উল্টে গেছে। সে বিপদে পড়া মানে আপনাদেরও বিপদে পড়া। কথা বুঝেছেন?

শামীম শুকনো গলায় বলল, জি স্যার।

আপনি আমার সাথে একটু থানায় চলেন। আজ তো কফি, পুরি কিছু খাওয়ালেন না, আমার সাথে চলেন, ফার্স্টক্লাস কফি পুরি খাওয়াবো। চেখে আসবেন, কফি পুরির আসল টেস্ট।

শামীমের গলা শুকিয়ে এলো। সে এই থানা পুলিশ বিষয়টিতে খুব একটা স্বচ্ছন্দ না। সে বলল, থানায় কেন স্যার?

কেন আবার? নাস্তা পানি খেতে। এ ছাড়া থানায় আর কাজ কী?

ফোরকান আলী হাসলেন। তার হাসি দেখে শামীমের গলা শুকিয়ে এলো।

.

থানায় ঢুকে শামীম চমকে গেল। টেবিলের পাশে অনু বসে আছে। সে অনুকে দেখে সালাম দিলো। ফোরকান আলী বললেন, এনাকে চেনেন না-কি শামীম?

জি স্যার।

কীভাবে চেনেন?

উনি আমার স্ত্রীর বড় বোন।

আচ্ছা, তা ওনার সাথে আপনার বড় ভাই ওয়াসিমের যে একটা বড় ধরনের বাজে ঘটনা ঘটেছিল, সেটি কী আপনি জানতেন?

শামীম এই প্রশ্নের কী উত্তর দিবে জানে না। সে বুঝতে পারছে না, কোন উত্তর দিলে সে বিপদে পড়ে যাবে। কিন্তু এখানে উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে যাওয়ারও কোনো সুযোগ নেই। ফোরকান আলী বললেন, কী, জানতেন? না জানতেন না?

জি না জানতাম না।

আপনারা একই বাসায় দিনের পর দিন থেকেছেন, উনি আপনার স্ত্রীর বড় বোন। তাদের ঘরে সেই অর্থে কোনো পুরুষ মানুষ ছিল না। সেক্ষেত্রে দায়িত্বটা অনেকাংশে আপনার উপরও বর্তায়। আর আপনি এই ঘটনার কিছুই জানতেন না?

শামীম কাঁচুমাচু মুখে বলল, সত্যিই জানতাম না।

আপনার স্ত্রী এই ঘটনা কখনো আপনাকে বলেননি?

জি না স্যার।

ফোরকান আলী গলা বাড়িয়ে কাউকে ডাকলেন। অনু আর শামীম অবাক চোখে দেখলো একজন নারী কনস্টেবল দরজায় দাঁড়ানো। তার সাথে হাফসাকে কোলে নিয়ে তনু দাঁড়িয়ে আছে। তনুর চোখেমুখে তীব্র ভয়ের ছাপ।

ফোরকান আলী তাকে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন। তনু সন্ত্রস্ত পায়ে বসতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার হাজবেন্ডকে আপনি কখনো বলেননি যে আপনার বড় বোনের সাথে ওয়াসিম কী করেছিল?

তনু মাথা নাড়লো। ফোরকান আলী বললেন, কেন?

তনু ভয়ার্ত গলায় বলল, কারণ এই ঘটনা আমিই জানতাম না।

ফোরকান আলী বিস্মিত গলায় বললেন, কেন? আপনি জানতেন না কেন? এই ধরনের ঘটনা ঘটলে বোনদের জানাটা তো খুবই স্বাভাবিক। না-কি আপনাদের মধ্যে কোনো কারণে সিরিয়াস কোনো সমস্যা ছিল?

এই ঘটনা যখন ঘটে, তখন আমি এখানে ছিলাম না। শ্বশুরবাড়িতে ছিলাম।

আপনার মা, বা অন্য কেউ আপনাকে জানাননি? বা আপনি আসার পরও না?

তখন আমার সাথে কারো কোনো কথা হতো না। আসা যাওয়াও ছিল না।

কেন?

তনু কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, আমি পালিয়ে বিয়ে করেছিলাম। এই নিয়ে ঝামেলা ছিল।

বড় বোন আপনাদের জন্য এত কষ্ট করলেন, আর আপনি তাকে রেখে পালিয়ে বিয়ে করলেন, তার বিয়ে ভবিষ্যতের কথা ভাবলেন না?

তনু জবাব দিলো না। চুপ করে রইল। ফোরকান আলী সাথেসাথেই আবার বললেন, এনিওয়ে এটা আপনাদের পার্সোনাল ইস্যু। যদিও পার্সোনাল বহু কিছুই খুঁড়ে দেখতে গেলে দেখা যায়। তা আর পার্সোনাল থাকে না। তার মানে আপনার হাজবেন্ড অনুর ঘটনা কিছুই জানতো না?

না।

আপনি হাজবেন্ডকে এই বিজনেসে ঢুকতে আপনি বাঁধা দেননি?

আমি জানতাম না।

কী জানতেন না?

সে যে ওয়াসিমের সাথে ড্রাগসের বিজনেস করে।

এখন জানলেন কী করে? আমি তো আপনাকে কিছু বলিনি!

বড়'পু বলেছে।

আচ্ছা, কিন্তু আপনি তার আগে বুঝতে পারেননি?

নাহ্।

এই যে হঠাৎ এত টাকা আসতে শুরু করলো, তারপরও না?

ও বলতো ওর বইয়ের বিজনেস থেকে টাকা আসছে।

আর আপনি তা বিশ্বাস করতেন?

তনু এই প্রশ্নের কোনো জবাব দিলো না। সে চুপচাপ বসে রইল। ফোরকান আলী অনুকে বললেন, আপনি নতুন চাকরির ব্যবস্থা করে ফেলেছেন?

হুম।

প্রিন্টিং কোম্পানি?

জি।

ওখানে আপনার কাজ কী?

আপাতত তেমন কিছু না। তবে ভাবছি ডিজাইনিং টিজাইনিং কিছু একটা শিখবো।

আচ্ছা। আর সব কিছু ঠিকঠাক? ওয়াসিমের সাথে যোগাযোগ হয়েছিল?

নাহ।

ফোরকান আলী সেদিনের মতো তিনজনকেই বিদায় দিলেন। তবে বিদায়ের আগে বলে দিলেন, প্রয়োজনে যে-কোনো সময়ে আবার তাদের ডাকতে পারেন। সুতরাং কেউ যদি দুয়েকদিনের বেশি সময়ের জন্য কোথাও যায়, তবে অবশ্যই তাকে জানিয়ে, তার অনুমতি নিয়েই যেতে হবে।

*

অনু শেষ অব্দি নাবিলার প্রিন্টিংয়ের অফিসটাতেই ছোট একটা কাজে জয়েন করেছে। বেতন খুব বেশি না হলেও সময়টা কেটে যাচ্ছে। তার কাজটা ঠিক মাস ভিত্তিতেও না।

দশ বা পনেরো দিনের একেকটা প্রজেক্টের ভিত্তিতে। সে যে ক'দিনের কাজ করবে, সে কদিনের বেতন পাবে। এর মধ্যে একদিন হাসানের সাথে দেখা। হাসান বলল, আপনাকে ফোন দিলে ধরেন না কেন?

ইচ্ছে করে না।

এভাবে কেউ বলে?

তাহলে কীভাবে বলে?

কী মুশকিল, আপনি তো দেখি দিনদিন আরো কঠিন হয়ে উঠছেন।

আমি কী আগে কঠিন ছিলাম না-কি?

অবশ্যই ছিলেন। আর শোনেন, ফোন ধরতে ইচ্ছে না করলেও সৌজন্যতা দেখিয়ে বলতে হয়, ফোন দিয়েছিলেন? কবে? দেখিনি তো। খেয়াল করিনি হয়তো। বা, ইশ, হাসান ভাই সরি। দু'বারই ব্যস্ত ছিলাম, পরে আর ব্যাক করা হয়নি, ভুলে গিয়েছিলাম। সরি।

আজকাল ক্লান্ত লাগে এসব করতে।

আপনাকে দেখে অবশ্য ক্লান্তই মনে হচ্ছে।

অনু ম্লান হাসলো, আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন...।

হাসান বলল, একটা কথা বলি?

হুম।

এভাবে কী জীবন চলে?

জীবন সবভাবেই চলে। মানে চলে যায় আর কী! জীবনকে বরং কোনোভাবেই আটকে রাখা যায় না।

আপনার হতাশ লাগে না?

লাগে।

তাহলে?

ভেবে নেই, ভালো লাগা, মন্দ লাগার মতো হতাশ লাগাটাও একটা অনুভূতি।

আপনার বিষয়ে অফিসে পুলিশ খোঁজখবর নিতে এসেছিল বেশ আগে, তখনই আপনাকে ফোন দিয়েছিলাম, ঘটনা কী জানার জন্য।

জানতে পেরেছিলেন?

যা পেরেছিলাম, সে সব তো আর জানা নয়।

কেন?

আজেবাজে সব কথা। আপনি তো জানেনই, মানুষের মেন্টালিটি কী জঘন্য।

মানুষ ঠিকই আছে, ঘটনাগুলো জঘন্য।

কী হয়েছে, বলবেন?

উঁহু।

কেন?

বলতে ইচ্ছে করছে না দেখে। আচ্ছা হাসান ভাই, এই যে বললেন, আমার সম্পর্কে পুলিশ তথ্য চাইছে বলে মানুষ আমাকে নিয়ে জঘন্য, আজেবাজে সব জিনিস ভাবছে, এই ভাবাভাবিটা কিন্তু অস্বাভাবিক না। হয়তো তাদের জায়গায় থাকলে আমিও তাদের মতো করেই ভাবতাম। কারণ এমন একটা মেয়ে, এভাবে অফিস ছেড়ে চলে গেল, একটা রিউমার তো ছিলই। তারপর আচমকা তার সম্পর্কে পুলিশ খোঁজখবর নেয়া শুরু করলো। বিষয়টা নিয়ে আজেবাজে কিছু ভাবা কী অস্বাভাবিক?

অবশ্যই অস্বাভাবিক না।

তাহলে আপনিও নিশ্চয়ই ভেবেছেন। কিন্তু সামনে বলে ফেলতে পারছেন না, তাই না?

একদমই না।

আপনি ভাবেননি? নাহ্।

কেন?

কারণ সম্ভবত আপনাকে আমি ভালোবাসি। হাসান কথাটা বলে নিজে নিজেই থতমত খেয়ে গেল। অনু অবশ্য কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালো না। সে নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, ভালোবাসলে জঘন্য ভাবার জিনিস জঘন্য ভাববেন না?

অনু এমন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলবে হাসান ভাবেনি। সে বলল, ভালোবাসা তো একটা অনুভূতি তাই না?

হুম।

তো এই অনুভূতিগুলো কেমন জানেন? এগুলো হলো ধরুন বিভিন্ন রঙের কাঁচের পাত্রের মতো। একটা লাল রঙের কাঁচের পাত্রে যদি আপনি পানি রাখেন, দেখবেন পানিটাকে লাল মনে হচ্ছে। হলুদ রঙের কাঁচের পাত্রে পানি রাখলে পানিটাকে লাগবে হলুদ। অনুভূতিটাও এমন, আপনি যদি কাউকে ঘৃণা করেন, অপছন্দ করেন, সে যা-ই করবে, আপনার কাছে তাই অপছন্দ লাগবে। সে ভালো কিছু করলেও আপনি সেখানেও তার খুঁত বা উদ্দেশ্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন। আবার কাউকে সত্যি সত্যি ভালোবেসে ফেললে, সে যা-ই। করুক, আপনার তা-ই ভালো লেগে যাবে। এমনকি সে বড় ধরনের কোনো অপরাধ করে ফেললেও আপনি সহসা তাকে ঘৃণা করতে পারবেন না। বরং নানা যুক্তিতর্ক দিয়ে তার সেই অপরাধটিকেও বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করবেন।

তার মানে আপনি আমাকে সত্যি সত্যিই ভালোবাসেন?

হাসান এবার আর জবাব দিলো না। সে মাথা নিচু করে বসে রইল। অনু বলল, তার মানে আপনি জানেন যে আমি কোনো অপরাধ করেছি। কিন্তু আপনি আমাকে সত্যি সত্যি ভালোবাসেন বলেই আমার সেই অপরাধের স্বপক্ষে নানান ধরনের যুক্তি দিয়ে আমাকে আপনার নিজের কাছে নিরপরাধ প্রমাণ করেছেন?

হাসান তড়িঘড়ি করে বলল, না না। তা না। আমি জানি আপনি কোনো অপরাধ করেননি।

কী করে জানেন?

হাসান হঠাৎ কেমন নরম হয়ে গেল। সে ভেজা, গাঢ় গলায় বলল, আমি জানি না, কীভাবে জানি। কিন্তু আমি জানি, এবং এই জানায় কোনো মিথ্যে নেই।

অনু মুহূর্তকাল থমকালো, হাসানের এইটুকু কথায় কিছু একটা ছিল, যা সে আগে কখনো দেখেনি।

.

থানার ঘটনার পর থেকেই তনু ভীষণ জড়সড় হয়ে আছে। ভয়টা সে কোনোভাবেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না। দিন তিনেক বাদে হঠাৎ শামীমের সামনে গিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল সে। শামীম অবাক গলায় বলল, কী হয়েছে?

আমি আর এই বাসায় থাকব না। তুমি আমাকে প্রয়োজনে রাস্তায় রেখে আসো, কিন্তু আমি আর এখানে থাকব না।

কেন?

আমার ভয় হয়, সারাক্ষণ ভয় হয়। মনে হয়, এই বুঝি পুলিশ এলো।

পুলিশ আসবে কেন?

তনু হঠাৎ রুদ্রমূর্তি ধারন করলো, তুমি জানো না পুলিশ আসবে কেন? তুমি জানো না? পুলিশ আসবে তোমার জন্য। তোমার জন্য পুলিশ আসবে, তারপর তোমাকে না পেয়ে তোমার বউ বাচ্চাকে ধরে নিয়ে যাবে। তোমার বাচ্চার জন্ম হবে জেলখানায়। তোমার বাচ্চা বড় হবে জেলখানায়। তুমি জানো না পুলিশ কেন আসবে? তুমি কিছু জানো না?

শামীম তনুর চেহারা দেখে ভড়কে গেছে। এই সময়ে তার যতটা সম্ভব। শান্ত থাকা দরকার। কিন্তু সে হয়ে আছে অস্থির, অসহিষ্ণু। মানসিকভাবে প্রচণ্ড চাপ অনুভব করছে সে। শামীম কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই তনু আবারো কাঁদতে কাঁদতে ভেঙে পড়ল। সে আচমকা শামীমের পা জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি চলো, কালই তুমি আমাদের নিয়ে গ্রামে চলো। এখানে আমি আর থাকব না। আমি বড়পুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিবো। তারপর চুপচাপ গ্রামে চলে যাব। আর কোনোদিন ঢাকায় আসবো না। আমার ভয় করছে শামীম। আমার খুব ভয় করছে।

শামীম তার পা থেকে তনুর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বলল, চাইলেই তো আমি চলে যেতে পারি না তনু। তুমি এটা বুঝতে পারছ না কেন? এখানে ঢোকা সহজ, যাওয়া এত সহজ না। তাছাড়া থানা থেকে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে, তাদের না জানিয়ে কোথাও যাওয়া যাবে না, তুমি শোননি?

তনু আবারো খেপে গেল, আমি আগেই বলেছিলাম, আগেই। তুমি তখন শোনো নাই। এখন কেন বলছ? এখন কেন বলছ? আমি কিছু শুনতে চাই না, তুমি আমাদের নিয়ে চলো। আজ, এক্ষুণি চলো।

শেষের কথাগুলো বলতে গিয়ে কান্নায় তনুর গলা জড়িয়ে এলো। শামীম কী বলবে বুঝতে পারছে না। কী করবে তাও না। আরো একটি নিঘুম রাত কাটলো তার।

.

হাসানের সাথে আরো কয়েকবার দেখা হলো অনুর। সেদিন রাতে রুমে ফিরে অনু হঠাৎ ভাবতে লাগল, হাসানের সাথে এই যে তার প্রায়ই দেখা হচ্ছে, এর কারণ কী? সেকি হাসানের সঙ্গ উপভোগ করে? কিন্তু কোনো পুরুষ সঙ্গ উপভোগের এই ব্যাপারটা দীর্ঘদিন তার ভেতর ছিল না। বরং পুরুষ মানেই তার কাছে ছিল ভয়ংকর আতংকের কোনো অভিজ্ঞতা। কিন্তু হঠাৎ করে কী এমন হলো যে হাসানের সাথে কথা বলতে, তার সাথে ঘুরতে কিছুটা হলেও তার ভালো লাগে! এই ভাবনাটা অনুকে কয়েকদিন খুব তাড়িয়ে বেড়ালো। সেদিন শেষরাতের দিকে তার আচমকা মনে হলো, হাসানকে সে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। দীর্ঘদিন সে কোনো পুরুষকেই বিশ্বাস করতে পারেনি। না

পারার নানান যথাযথ কারণও ছিল। আর এই কারণেই গত তিন বা চারটা বছর হাসান যে নীরবে কিংবা সরবে তাকে ভালোবেসে গেছে, সেটা সে আলাদা করে কখনোই খেয়াল করেনি। বা খেয়াল করলেও এড়িয়ে গেছে, গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু এখন আচমকা কী এমন হলো যে সে হাসানের প্রতি এভাবে খানিকটা হলেও হেলে পড়ছে? কেন তার মনে হচ্ছে, হাসান আর দশটা পুরুষের মতো সুযোগসন্ধানী নয়, সে তার পরিস্থিতির সুযোগ নিতে চাইছে না! অথচ তার জন্য এটা আরো বেশি স্বাভাবিক।

হাসান হয়তো বয়সে অনুর চেয়ে খানিক ছোটই হবে, হয়তো বছর খানেকের বা তার চেয়ে কিছু কম বেশি। তারপরও কেন এমন হচ্ছে? তাহলে কী এই যে দীর্ঘসময় ধরে হাসান বিরামহীনভাবে নীরবে তার জন্য অপেক্ষা করে গেছে, এই ব্যাপারটি অনুকে অবচেতনভাবেই স্পর্শ করেছে, একটা আস্থার জায়গা তৈরি করেছে? তার এই নীরব অপেক্ষা আর নিরবিচ্ছিন্ন চাওয়াই কী তাহলে এই অবচেতন অনুভূতির অবাক উৎস!

তবে চিরকালীন সতর্ক অনু জানে, হাসান আর সে চাইলেও তাদের বিশেষ কোনো সম্পর্কের পারিবারিক পরিণতি সহজ নয়। এমনিতেই তাকে মেনে নেয়াটা যে-কোনো পরিবারের জন্য খানিকটা হলেও কঠিন। যদিও মা আর অয়ন নেই বলে আগের মতো এখন আর অতিরিক্ত আরেকটা পরিবার বয়ে বেড়ানোর দায়িত্ব নিয়ে কাউকে ভাবতে হবে না। কিন্তু তারপরও এমন একটি মেয়ে যদি ছেলের চেয়ে বয়সে বড় হয়ে যায়, তবে তা নিশ্চিত করেই আবার একটি নতুন জটিলতা তৈরি করবে, অনু তা জানে।

.

শুক্রবার বিকেলে হাসান এলো। অনু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটু সাজলোও যেন। এই একটু ঠোঁটে লিপস্টিক, একটু পাউডারের পাফ বুলিয়ে নিলো মুখে। একটা ছোট টিপ, আর খোলা চুল। আয়নার সামনে নিজেকে আরেকবার দেখে চলে আসতে গিয়ে আচমকা থমকে গেল সে। তারপর নিজের দিকে দীর্ঘসময় তাকিয়ে রইল। কেমন অচেনা লাগছে নিজেকে। আচ্ছা, এই মেয়েটাকে কী সে চেনে? দেখেছে আগে কখনো? অনুর হঠাৎ মনে হলো, এই মেয়েটা তার অচেনা নয়। সে এই মেয়েটাকে চেনে, খুব ভালোভাবেই চেনে। কিন্তু এই মেয়েটাকে সে বহুবহু বছর ভুলে ছিল। কিংবা জোর করে লুকিয়ে রেখেছিল বুকের ভেতর। আজকাল আস্তে আস্তে করে সেই মেয়েটাই যেন একটু একটু করে জেগে উঠছে। কিন্তু সেই জেগে ওঠা মেয়েটার কোথায় যেন কিছু একটা অন্যরকম, সে ধরতে পারছে না।

অনু আয়নার সামনে থেকে সরে এসে ঘরের দরজার কাছটায় আসতেই তার অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল ধরতে না পারা সেই বিষয়টা। তার আসলে মাহফুজের কথা মনে পড়ছিল। কত কত বছর, কত কত দিন রাত্রি, ঘটনা, অথচ আজ এই মুহূর্তে মাহফুজ যেন ঠিক সেই আগের অনুভূতিটা নিয়ে ফিরে এসেছে। সে যেন অনুর কানের কাছে ফিসফিস করে বলে গেল, তুমি শেষ অব্দি খোলা চুলে বের হচ্ছ?

অনু আবার ঘরে ঢুকলো। তারপর ভোলা চুল খোঁপা করে বেঁধে ঘর থেকে বের হলো। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে তার আচমকা মন ভার হয়ে গেল। সেই সারাটা বিকেল তার মন আর হালকা হলো না। মেঘলা আকাশের মতো থমথমে মুখ নিয়ে হাসানের সাথে ঘুরে বেড়ালো। হাসান বলল, মন খারাপ আপনার?

উঁহু।

মিথ্যে কেন বলছেন?

মিথ্যে বলছি, কে বলল?

চোখ।

চোখ মিথ্যে বলতে পারে?

সত্য মিথ্যে দুটোই বলতে পারে, কেবল পড়তে জানতে হয়।

আপনি পড়তে পারেন?

সবারটা পারি না, আপনারটা পারি।

তাহলে চোখের কাছেই জিজ্ঞেস করুন।

হাসান হঠাৎ ভরাট গলায় আবৃত্তি করলো, মেঘের মতো ভার হয়ে রয় বুক, মেঘের মতো থমথমে কী ব্যথা, মেঘ তো তবু বৃষ্টি হয়ে ঝরে, আমার কেবল জমছে আকুলতা।

অনু মুখ ঘুরিয়ে বলল, বাহ্! সুন্দর তো! কার লেখা?

হাসান লজ্জা পাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, আমার।

আপনি কবিতা লেখেন জানতাম না তো!

আপনি কবিতা পড়েন জানতাম না তো!

হাসানের অবিকল অনুকরণ দেখে অনু হেসে ফেলল। অনু বলল, মেঘেরই আনন্দ, জল জমে ভারি হয়ে গেলেই বৃষ্টি হয়ে কেঁদে ফেলতে পারে।

হাসান বলল, মানুষও পারে।

উঁহু, পারে না। খুব কম মানুষ কাঁদতে পারে। বেশিরভাগ মানুষই কাঁদতে পারে না।

তাহলে কী করে তারা?

হাসে।

দুঃখ পেলেও?

হুম।

তাহলে তাদের দুঃখগুলো অন্যরা কী করে বোঝে?

বোঝে না। জগতে হাসির আড়ালে লুকিয়ে থাকা কান্না পড়তে পারা মানুষের খুব অভাব!

কী ছোট্ট একটা কথা! অথচ হাসানের বুকের ভেতরটা তিরতির করে কেঁপে উঠল। কেমন তোলপাড় হয়ে গেল গোটা বুকের এপাড়-ওপাড়। সে হাত বাড়িয়ে অনুর হাতটা ধরলো। অনু প্রথমে কিছুক্ষণ বুঝতে পারল না। তারপর হঠাৎ আবিষ্কার করলো তার শরীর কাঁপছে। সে খুব অবাক হলো, কোনো পুরুষের স্পর্শ যে তাকে আর কখনো এমন করে কাঁপিয়ে দিতে পারে, অনু তা কল্পনাতেও ভাবেনি। বরং পুরুষের স্পর্শের কথা ভাবলেই তার কেবল গা ঘিনঘিনে বিশ্রী এক অনুভূতি হতো। আজ এই মুহূর্তে সেই বিশ্রী অনুভূতিটা কী করে এমন অপার্থিব, অনিন্দ্য সুন্দর হয়ে গেল, অনু জানে না।

*

শামীম আজ একটু আগেভাগেই দোকান বন্ধ করছে। তনুর শরীরটা খারাপ করেছে হঠাৎ। সে দোকানের শাটার টেনে তালা লাগাতে যাবে, এই মুহূর্তে ফোনটা বাজলো। ওয়াসিমের ফোন। শামীম ফোন ধরে সালাম দিলো। ওয়াসিম অবশ্য সালামের জবাব দিলো না। সে বিড়বিড় করে বলল, সব ঠিক আছে শামীম?

জি ভাই।

কোথাও কোনো ঝামেলা হচ্ছে না তো!

না ভাই।

পুলিশ?

আর ঝামেলা করেনি ভাই।

আচ্ছা। আরেকটা কথা, টাকার হিসাবে একটু ঝামেলা হচ্ছে মনে হয়।

কোন টাকার হিসাব?

আমার একাউন্টে জমা হওয়া টাকার হিসাব। এখান থেকে তো রেগুলার চেক করার সুযোগ নেই। তারপরও মনে হলো, ঠিকঠাক নেই।

একটু ঝামেলা হচ্ছে জানেনই তো ভাই। আর আজম ভাই ছাড়া অন্যরা তো টাকা সেভাবে নিয়মিত দিচ্ছেও না। তাই যখন যা দেয়, ভাবি, একসাথে জমা করে দেবো।

আচ্ছা, ঠিক আছে। শোনো, হাতি বিপদে পড়লে চামচিকাও লাথি মারে, এই হচ্ছে জগতের রীতি বুঝলে? সমস্যা নেই, বিপদ যেমন আসছে, বিপদ যাবেও। সবার হিসেব তখন কড়ায়-গণ্ডায় আদায় হবে।

জি ভাইয়া, আপনি চিন্তা করবেন না। আমি আর আজম ভাই এদিকটা দেখছি।

তাড়াতাড়ি ভাবলেও শেষ পর্যন্ত বাসায় ফিরতে গভীর রাতই হলো শামীমের। পথে আজমের সাথে দেখা হয়ে গেল। আজম তাকে কী এক বিশেষ কাজে নিয়ে গেল মহাখালী। সেখান থেকে বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত বারোটা। তনুর শরীর যথেষ্টই খারাপ। খারাপ হাফসার শরীরও। সে সম্ভবত কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে। শামীমের মা বাসায় নেই। তনু দরজা খুলে দিয়ে শামীমের জন্য ভাত বাড়তে গেল। কিন্তু গোসল করে এসে শামীম আর খেতে বসলো না। সে তনুকে ঘরে ডেকে নিয়ে জানালাগুলো ভালো করে বন্ধ করে দিয়ে বলল, তুমি, মা আর হাফসা, পরশু শুক্রবার গ্রামে চলে যাবে।

শামীমের বলার ভঙ্গি দেখে তনু ভয় গেল। শামীম সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যেটা বলি সেটা শোনো। তোমরা যাবে আমার ছোট ফুপুর গ্রামের বাড়ি। ফুপুর ছেলে মেয়ে কেউ নেই। বয়স্ক মানুষ একা একা থাকে। তার বাড়ি কুড়িগ্রামের প্রত্যন্ত এক চরে। ঠিকানা না জানলে কারো সাধ্য নেই, ওখানে গিয়ে কাউকে খুঁজে বের করে। বর্ষাকালে তো নদী হয় সমুদ্রের মতো। আর খরার মৌসুমে অবস্থা আরো খারাপ, মাইলের পর মাইল ধূ ধূ বালু চর। গরু-মহিষের গাড়ি ছাড়া আর কোনো যানবাহনও চলে না।

তুমি কী করবে? তুমি যাবে না?

আমি যাব। পুলিশ নিয়ে তো আমার কোনো ভয় নেই, আসল ভয় ওয়াসিম। এই বিজনেস হঠাৎ করে ছেড়ে তো চলে যাওয়া যায় না। তাছাড়া তার ব্যবসার অনেক গলিখুঁজি, গোপন ব্যাপার-স্যাপার তো আমি জানি। সে এখন যদি জানে, আচমকা আমি চলে গেছি, তাহলে সন্দেহ করতে পারে। আর এমনিতেও বিজনেসে নানা ঝামেলাটামেলা হচ্ছে, এর মধ্যে আমি পালিয়ে গেলে সে আমাকে যেভাবেই পারুক, খুঁজে বের করবেই।

তুমি কখন যাবে তাহলে?

আমি সময় মতোই যাব। তুমি চিন্তা করবে না, আমি চিন্তাভাবনা করেই কাজ করছি। সব ঠিক হয়ে যাবে।

বড়'পুকে জানাবো না?

একদম কাউকে না, কাকপক্ষীও যেন না জানে।

আমার ডেলিভারির ডেট কিন্তু কাছাকাছি চলে আসছে। ওই চরে গিয়ে থাকলে কখন কি বিপদ আপদ হয়ে যায়, ডাক্তার, হাসপাতাল কোথায় পাবো?

সব ব্যবস্থা করা হবে, তুমি টেনশন নিও না। আগামী দুই দিনের মধ্যে গোছগাছ করে নাও। বেশি জিনিসপত্র নেয়ার দরকার নেই। ওখানে সবকিছুর ব্যবস্থা করা হবে। পাকা ঘরও তোলা হবে।

তনু ঝট করে মাথা তুলে বলল, এত টাকা তুমি কই পাবে?

তুমি তোমার কাজ করো। একবার তো বলছি, তোমার এত কিছু ভাবতে হবে না। তুমি শুধু আমি আসার আগ পর্যন্ত আমার বাচ্চা দুটো দেখে রাখবে। বৃহস্পতিবার শেষ রাতে শামীম আগেভাগে ঘুম থেকে উঠে গেল। তারপর তনুকে ডেকে ওঠালো। তনুর হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ দিয়ে বলল, এটার মধ্যে পাঁচ লাখ টাকা আছে। টাকাটা হাফসার কাপড়ের ব্যাগটার ভেতর ঢোকাও। কোনো টেনশন করবে না, খুব নরমালি যাবে। কুড়িগ্রাম সদরে গিয়ে কোনো দোকানের ফোন নম্বর থেকে এই টিএন্ডটি নম্বরে ফোন দিয়ে আমাকে চাইবে। শামীম কাগজে লেখা একটা টিএন্ডটি নম্বর দিলো তনুকে, তারপর আমাকে জানালেই হবে যে তোমরা পৌঁছে গেছ।

কেন, তোমার ফোন নম্বর?

আপাতত আমার ফোন নম্বরে ফোন দেয়ার দরকার নেই। আর তুমি যে গ্রামে যাচ্ছ, ওখানে নেটওয়ার্ক আছে বলেও মনে হয় না।

কিন্তু এত টাকা তুমি কই পেলে? এই টাকা আমি নেবো না শামীম। এই টাকার সাথে কোনো একটা বিপদ আছে। বড় বিপদ। আমি টের পাচ্ছি শামীম।

শামীম ঠান্ডা গলায় বলল, চুপ, একদম চুপ। যা বলেছি, তার উপর আর কোনো কথা না। আমি যত শীঘ্রই পারি চলে আসবো।

শামীম টাকার ব্যাগটা হাফসার কথা কাপড়ের বড় ব্যাগের ভেতর ঢোকাতে লাগল, আর তনু তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

.

ফোরকান আলী বসে আছেন শামীমের দোকানের সামনে। আজ তার সামনে কফি আর সিঙ্গারা। তিনি সিঙ্গারায় কামড় বসিয়ে কফিতে চুমুক দিলেন। তাকে দেখে মনে হচ্ছে আরামে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। শামীম বলল, স্যার, সিঙ্গারা আরেকটা আনাবো?

লাভ নাই শামীম সাহেব।

কিসের লাভ?

নির্দেশ অমান্য করে বউকে যে রাতের অন্ধকারে গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন, এখন যত যা-ই করেন, লাভ নাই। সিঙ্গারা, পুরি যা খাওয়ান, কোনো লাভ নাই।

শামীম গলে যাওয়া কণ্ঠে বলল, অন্যভাবে নিবেন না স্যার। আমার বউ প্রেগন্যান্ট, এই সময়ে ঢাকায় কেউ নেই, তাই তাকে গ্রামের বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। আমি একা এখানে তাকে নিয়ে এইসময়ে কী করতাম, বলেন!।

কিন্তু আপনার বউ তো আপনার গ্রামে যায় নাই, সে গেছে অন্য কোথাও। যদিও অন্য কোথায় গেছে, সেই খবর এখনো বের করতে পারিনি। আপনি বড় ধুরন্ধর মানুষ।

ফোরকান আলী কফিতে আবারো চুমুক দিয়ে বললেন, শোনেন, আপনার বউকে নিয়ে আমার আগ্রহ নেই, আমার আগ্রহ আপনার বড় ভাইকে নিয়ে। তার বিপক্ষে কেউ কোনো স্টেটমেন্ট দিলো না। কোনো স্ট্রং এভিডেন্স নেই, অথচ সবাই জানি কাজটা সে-ই করছে। অন্য কেউ হলে জেলে ঢুকিয়ে দু'দিন। প্যাদানি দিলেই সব বেরিয়ে আসতো। কিন্তু তার খুঁটি শক্ত, এইজন্য অকাট্য প্রমাণ হাতে না নিয়ে তাকে ধরতেও পারছি না, কী মুশকিল বলুন তো!

শামীম ম্লান গলায় বলল, খুনটা তো উনি নাও করতে পারেন।

ফোরকান আলীও হাসলেন, তাহলে কে করেছে, আপনি? চলেন, থানায় চলেন তাহলে।

ফোরকান আলী শামীমকে নিয়ে থানায় গেলেন। থানা থেকে শামীম বের হলো সন্ধ্যায়।

.

তনুর ফোন বন্ধ দেখে অনু চিন্তিত হয়ে পড়লো। শামীমকে এই সময়ে সরাসরি ফোন করতে চাইছিল না। বাধ্য হয়ে সেদিন সন্ধ্যায় শামীমকে ফোন করলো সে। শামীম অবশ্য ফোন ধরলো না। সে ফিরতি ফোন করলো গভীর রাতে, সরি আপু, একটা কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

তনু কই? ওকে ফোনে পাচ্ছি না।

ওর ফোনটা হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেছে আপু।

বাসায় আর কেউ নেই, যার সাথে ফোনে কথা বলা যেতে পারে?

মাও তো নেই। আমার ছোটবোনকে নিয়ে বড় খাঁলার বাসায় গেছে।

কিন্তু এই মুহূর্তে কী ওকে এভাবে একা রাখা ঠিক?

আপনি টেনশন নিয়েন না আপু। আমি দুয়েকদিনের মধ্যেই সব ব্যবস্থা করে ফেলছি।

অনু ফোন রেখেও চিন্তামুক্ত হতে পারল না। তার কেন যেন মনে হলো, শামীম তার সাথে মিথ্যে কথা বলেছে!

.

অনু পরদিন সন্ধ্যায় অফিস থেকে বের হতেই দেখলো হাসান দাঁড়িয়ে। চকিতে চারপাশটা একবার দেখে নিতে গিয়ে ভাবলো, এত মানুষের ভিড়ে কে তাকে চিনবে! তাছাড়া চিনলেই বা কী? কেউ একজন তার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, এটা নিয়ে লজ্জা পাওয়ার কী আছে! বরং খুশি হবার মতো ব্যাপার। কিন্তু অনু কেন। যেন খুশিটাকে লজ্জার আড়াল থেকে পুরোপুরি বের করে আনতে পারল না। তার বরং অবাক লাগছে, এই কদিন আগেও হাসানের সাথে কী নিরেট, রসকষহীন মানুষের মতো কথা বলেছে সে। অথচ মাত্র কয়েক মাসেই সেই মানুষটাকে দেখলেই তার কেমন অন্যরকম লাগে। কথা বলতে গেলে একটা অন্যরকম অনুভূতি টের পায়। হাসান বলল, আমার কাছে একশ কবিতা আছে।

বই বের করবেন?

হুম।

বইয়ের নাম কী হবে?

অনুর জন্য অণুকাব্য।

নাম সুন্দর, কিন্তু মানুষ এই বই পড়বে না।

পুরো পৃথিবীর মানুষ না পড়লেও আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু একজন মাত্র মানুষ না পড়লে আমার অনেক কিছু যায় আসে!

এই কথাগুলো কী খুব বেশি তরল হয়ে যাচ্ছে? অন্য কোনো সময় এমন কথা শুনলে অনু কী করত? কিন্তু অনুর কথাগুলো শুনে তরল মনে হচ্ছে না। বরং কথাগুলো কানে শুনতে যত তরল লাগছে, ভেতরে যেতে যেতে কখন যেন তা ছড়িয়ে যাচ্ছে গাঢ় ধোয়ার মতো। তারপর একটা আবেশে ঢেকে ফেলছে তাকে। এ এক অদ্ভুত রহস্যময় ব্যাপার। আচ্ছা, এমন করে কী আর কেউ তাকে কখনো কিছু বলেছে? এমন করে কী আর কখনো কেউ তার জন্য দাঁড়িয়ে থেকেছে?

অনুর আচমকা মন খারাপ হয়ে গেল। এই মুহূর্তগুলোতে তার মাহফুজের কথা মনে হয়। মাহফুজ তখন ঘন ভারি মেঘের মতো হয়ে যায়। সে ঝড়ের বেগে এসে তার হাসিমুখ সূর্যটাকে ঢেকে দেয়। অনু কী এখনো মাহফুজের এমন যখন তখন চলে আসা চায়? কোথায় সে? অনু জানে না। কিন্তু তার এমন সর্বগ্রাসী হয়ে নিমেষেই চলে আসাটা সে টের পায়।

.

হাসান রিকশায় বসে অনুকে বলল, আমার একটা নেশা আছে।

সিগারেটের? সমস্যা নেই। আপনি সিগারেট ধরাতে পারেন।

উঁহু।

তাহলে?

সুবাসের।

কিসের সুবাস।

চুলের।

মানে? অনু আঁতকে ওঠা গলায় মাহফুজের দিকে তাকালো। মাহফুজ বলল, আপনার চুলের গন্ধ। কতদিন আমি লুকিয়ে-চুরিয়ে ওই চুলের সুবাস নিয়েছি। আমার যেন নেশা হয়ে গেছে। মনে হয় এই নেশায় আমি ডুবে মরে যেতে পারি।

খুবই সস্তা ধরনের কথা। অনু মুখ ফিরিয়ে কথাটাকে পাত্তা না দেয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার শরীর বেয়ে, মন বেয়ে কথাটা যেন ছড়িয়ে যেতে থাকল, জলের ভেতর রং ছেড়ে দিলে রং যেমন ছড়িয়ে যায়, ঠিক তেমন। ধীরে ধীরে পুরোটা জুড়ে ছড়িয়ে গিয়ে রঙিন করে দিতে থাকল।

হাসান ফিসফিস করে বলল, এই যে বাতাস, এই যে শহর, এর কোথাও এমন সুবাসবিহীন বেঁচে থাকার মানে আছে, অথচ সেই সুবাসের উৎসটা যখন। আমার এত কাছে, এত?

অনু একটা অবাধ্য অনুভূতির কাছে হেরে যাচ্ছে। তার মনে হচ্ছে সে তার চুলগুলো মেলে দিক। তারপর এই বেপরোয়া হাওয়ায় সেই চুল উড়ে গিয়ে ঢেকে দিক হাসানকে। হাসান ডুবে যেতে থাকুক সুবাসে। সব মেয়েই কী চায়, তার সুবাসে কোনো পুরুষ ডুবে থাকুক?

অনুর সেই কত কত কাল পর নিজেকে আবার আর সকল মেয়ের মতো মনে হতে থাকল। যার ভালোবাসতে পারার সময় আছে, বুকের ভেতর তিরতির করে কেঁপে উঠে সুবাস ছড়িয়ে দেয়ার মতো মন আছে। প্রবল বিশ্বাসে, আস্থায় কারো স্পর্শে আন্দোলিত হবার মতো সুখ আছে। খানিকটা স্বপ্ন দেখারও কী? একটা ঘরের, একটা বারান্দার, একটা বিছানা, দুটো বালিশ আর নিজের একা একটা মানুষের?

তখন রাস্তার ল্যাম্পপোস্টগুলো জ্বলে উঠেছে। তারা হাতিরঝিলে একটা বেঞ্চির পাশে বসলো। হাসান অনুর হাতটা হাতের মুঠোয় নিয়ে বলল, আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি কী

জানেন?

উঁহু।

এই যে আপনার বুকের ভেতর জমে থাকা এত এত দিনের শক্ত বরফটা কিছুটা হলেও গলিয়ে দিতে পেরেছি।

অনু কথা বলল না। হাসানই বলল, আমি জানতাম, আপনি একদিন না একদিন বুঝতেই পারবেন, দেয়ার ইজ সামওয়ান ফর ইউ। সে আর দশজনের মতো নয়।

কিন্তু আমার তো বোঝার কথা ছিল না। আমার বরং জগতটাকেই কেমন বিষাক্ত মনে হতো। মনে হতো সবাই কেমন সুযোগের অপেক্ষায় ওঁত পেতে আছে।

এই জন্যই তো আমি ছিলাম।

কিন্তু আমি যদি বুঝতেই না পারতাম? যদি বুঝতে অনেক দেরি হয়ে যেত?

আমি অপেক্ষায় থাকতাম।

কতদিন?

যতদিন আপনি বুঝতে না পারতেন?

কেন?

ওই যে বললাম ভালোবাসি বলে।

ভালোবাসলেই সবাই অপেক্ষায় থাকে?

হুম থাকে। কেউ সরবে, কেউ নীরবে। সারা জীবনের জন্য হারিয়ে ফেলা মানুষের জন্যও মানুষ নিজের অজান্তেই অপেক্ষায় থাকে।

কিন্তু সে হয়তো তখন অন্যের?

পুরোপুরি পাওয়ার জন্য হয়তো নয়, এক চোখ দেখার জন্য হলেও।

কিন্তু নিজে যদি অন্যের হয়ে যায়, তারপরও অপেক্ষায় থাকে?

হুম, থাকে। কারো সাথে কাটিয়ে দেয়া জীবনজুড়েও বুকের ভেতর নীরবে সেই অন্য মানুষটাকে পুষে রেখে দেয়। এই কথা সে ছাড়া এই জগতে আর কেউ জানে না।

কথাটা অনুর বুকে গিয়ে লাগল! সেও কি তার বুকের ভেতর এমন করেই কাউকে পুষে রেখেছে? যার কথা সে কখনো কোনোদিন কাউকে বলতে পারেনি, পারবেও না কোনোদিন। থাকুক না কিছু কষ্ট নিজের একার, কিছু অনুভূতি খুব গোপন। এই

অনুভূতিগুলো আসলে মন খারাপের মুহূর্তের সঞ্চয়। তখন বুকের ভেতরের গোপন কুঠুরি থেকে আলগোছে এই অনুভূতিগুলো বের করে ছুঁয়ে দেখা যায়। সেই ছোঁয়াছুঁয়ি আরো একটা রুক্ষ্ম দিন মমতায় বেঁচে থাকায়।

৭

ফোরকান আলীর হাতে একটা মোবাইল ফোনের মেমোরি কার্ড। তিনি মেমোরি কার্ডটা শামীমের সামনে রাখতে রাখতে বললেন, এতে তো হবে না শামীম সাহেব, এটা যথেষ্ট না। আপনাদের কথাবার্তা খুবই অস্পষ্ট। ঘটনার বিষয়ে বিশদভাবে কিছু বলা নেই। তার ওপর ফোনের নেটওয়ার্কে মনে হয় ঝামেলা ছিল। তার কথাও স্পষ্ট শোনা যায় না।

শামীম জড়সড় গলায় বলল, এর বেশি কীভাবে করব স্যার?

কীভাবে করবেন, সেটা আমি কীভাবে বলব? আপনার জন্য আমি এত বড় উপকার করছি, আর আপনি আমার এইটুক উপকার করবেন না?

উনি আমাকে বিশ্বাস করেন ঠিক আছে। কিন্তু স্যার, ওই খুনের বিষয়টাতে তো আমার সাথে ওনার আলাপ করার কথা না। বিষয়টা নিয়ে যে আমি কথা বলব, কোন প্রসঙ্গে তুলব? আমার সাথে তো কোনোভাবেই প্রাসঙ্গিক না।

সেটা আপনি ঠিক করবেন। আমার একটা ভয়েস রেকর্ড দরকার, তাতে ওয়াসিমের ডিটেলস স্পষ্ট স্টেটমেন্ট দরকার, ব্যস।

কিন্তু স্যার...।

শোনেন শামীম সাহেব, আপনার স্ত্রীকে এতগুলো টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তার বাইরেও তো আপনি টাকা-পয়সা কম সরাননি। প্রথম দিন দেখেই বুঝেছিলাম, আপনি সেয়ানা লোক। তো এটা কেন বোঝেন না, আপনার বড় ভাই যদি নিরাপদে ফেরত আসে আর সহি সালামতে থাকেন। তবে সবচেয়ে বড় বিপদে পড়বেন আপনি!

শামীম কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বলল, বুঝি স্যার।

তাহলে? এই সুযোগ কী বারবার আসবে? শোনেন, আপনাকে নিয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই। আপনি টাকা সরান, যেখানে ইচ্ছে যান। এই নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। আমার মাথাব্যথা আপনার বড় ভাইকে নিয়ে। এখন মাথাব্যথাটা আপনারও। সে যদি ভালোভাবে ঢাকায় ফিরে আসতে পারে, আপনার ধারণা এই যে টাকা পয়সার হিসাব, তার অবর্তমানে আরো যেসব চালাকি করেছেন সেগুলো সে ধরতে পারবে না? এরপর আপনার অবস্থা কী হবে বুঝতে পারছেন? আপনার সামনে এখন সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ যেভাবেই হোক তাকে ধাক্কা দিয়ে খাদে ফেলে দেয়া। যাতে সে আর উঠতে না পারে। শুধুমাত্র তাহলেই আপনি নিরাপদ। আমার দিক থেকে আপনাকে নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই।

জি স্যার। সেটা জানি বলেই তো আপনার সাথে কাজ করছি। কিন্তু স্যার উনি ওই খুনের ব্যাপার নিয়ে আমার সাথে কেন কথা বলবেন?

কারণ আপনি তাকে কথা বলতে ইনফ্লুয়েন্স করবেন।

কীভাবে?

আপনি তাকে বলবেন যে আপনাকেও আমরা সন্দেহ করছি, মানে তার সহযোগী হিসেবে। আপনাকে যে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছি, এটাও বলেন। এগুলো আগে থেকে বলে দেয়ার কিছু নেই। আমি একটা ক্লু দিলাম, আপনি এখন বাকিটা নিজের মতো করে করেন।

শামীম মৃদু কণ্ঠে বলল, জি স্যার।

ফোরকান আলী উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, একটা কথা মনে রাখবেন শামীম সাহেব, এইটা ছাড়া কিন্তু আপনার সেফ এক্সিটের আর কোনো পথ নেই। আর এইটা না পারলে আপনাকে আমি ইয়াবা মামলায় ফাঁসিয়ে দেবো। সবার আগে। তারপর ক্রসফায়ার করে দেবো, মনে রেখেন।

.

তনু ঠিকঠাক পৌঁছেছে। কুড়িগ্রামের এই গ্রামে এসে তার মনে হচ্ছে, সে বাংলাদেশের বাইরে অন্য কোথাও চলে এসেছে। কুড়িগ্রামে একইসাথে রয়েছে ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, ধরলা নদী। এই সময়টায় সেই নদী শুকিয়ে মাইলের পর মাইল ধূ ধূ বালুচর হয়ে থাকে। বিস্তীর্ণ বালুচরের মাঝেমধ্যে আবার নদী, তারপর আবার বালুচর। এখানে মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক পাওয়াও দুরূহ ব্যাপার। কখনো কখনো সামান্য সিগন্যাল পাওয়া গেলেও পরক্ষণেই নাই হয়ে যায়। আর থাকলেও তাতে কথা বলা প্রায় অসম্ভব। শামীমের সাথে অবশ্য গত সাতদিনে একবার মাত্র কথা হয়েছে তনুর। তার শরীরটা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। শামীম বলেছে ডেলিভারির আগেভাগেই চলে আসবে। কিন্তু সেই চলে আসাটা যে কবে, তা জানার কোনো উপায় নেই। এদিকে সময়ও ঘনিয়ে আসছে। তনু ভয় পাচ্ছে তার শরীর নিয়ে। এখানে নানা কিছুর সমস্যা। তার ওপর এবার। প্রেগন্যান্সির পর থেকেই যে মানসিক ধকলটা গিয়েছে, তা অকল্পনীয়। শরীরটাও দিনদিন অসহযোগিতা করছে। এখানে আসার পর থেকে হাফসাও খুব যন্ত্রণা করছে। সারারাত, এক ফোঁটা ঘুমায় না। আশেপাশে কোনো ডাক্তার, হাসপাতালের সুবিধাও বলতে গেলে নেই। তনু দিনরাত অপেক্ষা করতে থাকে শামীমের।

.

হাসান সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে অনুকে সে বিয়ের কথা বলবে। তার ধারণা, এখন আর এ বিষয়ে অনুর কোনো সমস্যা বা আপত্তি থাকার কথা না। আপত্তি যদি কিছু থেকেও থাকে,

তবে তা হাসানের বাসায়। যদিও সেই সমস্যাও খুব একটা প্রকট হবে বলে হাসানের মনে হয় না। হাসানের মা জেসমিন জেবিন প্রগতিশীল নানান আন্দোলনের সাথে যুক্ত। নারীবাদী নেত্রী হিসেবেও তার বেশ পরিচিতি। টেলিভিশনের টক শো, পত্রিকার পাতায় তিনি নিয়মিত এসব নিয়ে কথাও বলেন। তবে সবার আগে জরুরি হচ্ছে অনুর কাছ থেকে সম্মতি নেয়া। এখানেই হাসান কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। প্রথমত, অনুকে এই কথাটা বলার জন্য যে মানসিক শক্তি তার দরকার সেটি নিয়ে সে নিশ্চিত নয়। অন্যদিকে, যদি কোনোভাবে অনু তাকে ফিরিয়ে দেয়, তখন সেই ধাক্কাটা সে সামলাতে পারবে কি-না, হাসান জানে না। বার কয়েক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনুকে সেই ইঙ্গিতও হাসান দিয়েছিল। কিন্তু অনু তাতে সাড়া দেয়নি। হাসান এখন সরাসরিই কথাটা বলতে চাইছে। এমনও তো হতে পারে যে অনু তার ইশারার ভাষাটা বোঝেনি।

অনুর সাথে পরেরদিন সন্ধ্যার পরে দেখা হতে হাসান বলল, আমার একটা ইচ্ছে হচ্ছে খুব।

কী ইচ্ছে?

বলতে ভয় হচ্ছে।

যে ইচ্ছে বলতে ভয় হয়, সেই ইচ্ছেয় অপরাধবোধ থাকে।

এটা সবক্ষেত্রে সত্যি নয়।

কোনো কিছুই সবক্ষেত্রে সত্যি না। যে ঘটনাগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘটে, আমরা সে ঘটনাগুলোকে রেফারেন্স ধরে নিয়ে বলি।

হাসান সামান্য চুপ করে থেকে বলল, আমরা কিন্তু এখন আপনি আপনি করেই বলছি।

অনু হাসলো, আমি তো বয়সে বড়, বড়দের আপনি করেই বলতে হয়।

হাসান আর কথা বলল না। তারা ফাঁকা রাস্তায় রিকশায় ঘুরছে। আজ পূর্ণিমা কি-না কে জানে, তবে আকাশে মস্ত বড় চাঁদ। শীতের প্রায় শেষ সময়, একটা বাসন্তী হাওয়া যেন মোলায়েম স্পর্শে ছুঁয়ে দিয়ে যাচ্ছে। হাসান আড়চোখে অনুর দিকে তাকালো। অনু তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। এই মেয়েটাকে সে অসম্ভব ভালোবাসে। কিন্তু কেন ভালোবাসে, সেই কারণটি সে জানে না। তবে একটা বিষয়ে হাসান নিশ্চিত, এই মেয়েটা যা বলবে, যা করবে, তার সবই সে অপার মুগ্ধতা নিয়েই দেখবে। তার কাছে মনে হবে, এটি এরচেয়ে ভালো আর কোনোভাবেই করা যেত না, বলা যেত না।

সে খানিক সময় নিয়ে প্রায় স্বগতোক্তির মতো করে অস্ফুটে বলল, বিয়ের পরও কী আমরা আপনি আপনি করেই কথা বলব?

অনু হাসানের দিকে তাকালো না অব্দি। যেমন ছিল, ঠিক তেমনই আকাশের দিকে মুখ করে বসে রইল। হাসান নিশ্চিত হতে পারছে না। অনু কী তার কথা শুনেছে, না-কি শোনেনি? সম্ভবত শোনেনি। শুনলে অন্তত তার চোখে মুখে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যেত। আর শুনবেই বা কেমন করে? অত আস্তে করে বললে কেউ শোনে? হাসানের এখন কেন যেন মনে হচ্ছে, সে আসলে কিছু বলেইনি। কেবল মনে মনে ভেবেছিল যে সে বলবে!

.

পরের দিন অফিস শেষে হাসানের সাথে দেখা হলো অনুর। হাসানের মুখটা থমথমে। তারা ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে হাইকোর্টের পাশটাতে চলে এলো। অনু বলল, কি হয়েছে?

হাসান হাসার চেষ্টা করলো, কিছু না।

বলেন।

কিছু না।

আচ্ছা, আমরা যদি বিয়ে করতে চাই, কিছু সমস্যা সামনে এসে দাঁড়াবে, সমস্যাগুলো প্রাথমিকভাবে আমাকে ফেস করতে হবে না। ফেস করতে হবে আপনাকে। আপনি কী সেটার জন্য প্রস্তুত?

হাসান আচমকা বুঝতে পারল না অনু কী বলছে! সে হতভম্ব হয়ে অনুর দিকে তাকিয়ে রইল। অনু ধীর-স্থির, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে। হাসান তার হাঁটার গতি সামান্য বাড়িয়ে আবার অনুর পাশাপাশি হলো। অনু বলল, কী, প্রস্তুত?

হাসান হড়বড় করে বলল, এমন তো নয় যে সিদ্ধান্তটা হুট করে নেয়া, কম করে হলেও চার বছর।

এই মুহূর্তে প্রস্তুত কি-না?

পুরোপুরি।

যদি বাসায় ঝামেলা হয়?

হবে না। আর হলেও আমি ম্যানেজ করে ফেলবো।

বিয়ের পরেও আমি চাকরি করলে কোনো সমস্যা নেই তো?

একদম না।

কোনোকিছুতেই না?

কোনোকিছুতেই না। কেবল এমন করে পাশে থাকলেই হবে। এমন একটা মানুষ পাশে থাকলে জীবনটা অনেক সহজ মনে হয়।

কঠিনও তো হতে পারে?

দুজন মিলে সামলে নেব।

অনু এই প্রথম নিজ থেকে হাত বাড়ালো। তার হাতের মুঠোয় হাসানের হাত। সে স্পষ্ট গলায় বলল, বাসায় কথা বলল।

.

হাসানের বাসায় বিষয়টা নিয়ে উচ্চবাচ্য না হলেও একটা থমথমে ভাব হয়ে রইল। হাসানের বাবা বললেন, তোমার জীবন তোমার সিদ্ধান্ত হাসান। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, কখনো কখনো ভুল সিদ্ধান্তের জন্য সারা জীবন পস্তাতে হয়।

হাসান বলল, তুমি ভেবো না বাবা, আই উইল ম্যানেজ।

হাসানের বাবা তেমন আর কিছু বললেন না। তবে হাসানের মা জেসমিন জেবিন ভার হয়ে রইলেন। সেদিন রাতেই তিনি দক্ষিণ এশীয় নারীদের অধিকার সচেতনতা বিষয়ক এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশ নিতে দিল্লি যাচ্ছেন। যাওয়ার আগে তিনি শুধু বললেন, বিয়ের ক্ষেত্রে ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হাসান। এটা মাথায় রেখো, বাদবাকি কথা আমি দিল্লি থেকে এসে বলছি।

.

রাতে অনুকে ফোন করলো হাসান, রাতের খাবার হলো?

হ্যাঁ, তোমার?

আমারও। কাল অফিস আছে?

আছে।

এখন কি ঘুম?

নাহ্, আরো কিছুক্ষণ জেগে থাকব।

জেগে জেগে কী?

স্বপ্ন দেখবো।

জেগে জেগে স্বপ্ন?

স্বপ্ন জেগে জেগেই দেখতে হয়। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলে ঘুম ভাঙার সাথে সাথেই তা ভেঙে যায়।

তা ঠিক।

তুমি কী করবে?

আমি? জানি না। আমার ঘুম আসছে না।

কেন?

আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না।

বাসায় সব বলা হয়ে গেল?

হুম।

কী বলল সবাই?

সব ঠিক আছে।

সত্যি তো?

না মানে, একটু অফ মনে হলো সবাইকে। বাট ম্যানেজ হয়ে গেছে। আমার ফ্যামিলি তো আমি চিনি। ওরা সবাই অনেক ভালো। এ বাসায় আসলে মন ভালো হয়ে যাবে।

অনু মৃদু হাসলো, তাহলে তো ভালোই।

আমি রাখবো তাহলে?

রেখে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে?

উঁহু।

তাহলে?

কথা বলতে ইচ্ছে করছে।

বলল তাহলে।

কিন্তু কী কথা বলব বুঝতে পারছি না।

যা ইচ্ছে বলো।

হাসান অবশ্য কিছু বলতে পারল না। সে ফোন কানে চুপচাপ বসে রইল। অনু বলল, তোমার ওই ব্যাপারটা আমার খুব ভালো লেগেছে।

কোন ব্যাপারটা?

যেভাবে আমাকে বিয়ের কথা বললে! আমার ধারণা পৃথিবীতে আর কেউ কাউকে এভাবে বিয়ের প্রস্তাব দেয়নি।

কীভাবে?

এই যে দুম করে বলে বসলে, আচ্ছা, বিয়ের পরও কী আমরা আপনি আপনি করেই বলব?

হাসান কথা বলল না। অনু বলল, কী অদ্ভুত না? না আমাদের কখনো প্রেমের কথা হলো, না ভালোবাসাবাসির কথা হলো। কিন্তু তুমি সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ফেললে? তাও আবার এভাবে!

হাসান হাসলো, আমার খুব ভয় হচ্ছিল। পরে মনে হচ্ছিল হয়তো আমি কিছুই বলিনি, মনে ভেবেছিলাম কেবল।

কেন?

কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি যে?

কার?

হাসান কিছু একটা বলতে গিয়েও থমকে গেল।

অনু বলল, বলো, বলো, কার?

হাসান এবারও চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, আপ...।

অনু শরীর কাঁপিয়ে হেসে উঠল। তারপর বলল, আমি এতক্ষণ ধরে খেয়াল করছিলাম, এই পুরো কনভার্সেশনে তুমি একবারের জন্যও আমাকে আপনি বা তুমি কিছু বলেনি! কী ব্যাপার ভয় পাচ্ছ?

সেদিন যে বয়সে বড়'র অজুহাত ছিল?

তো? বয়সে বড় হলে তাকে বিয়ে করা যাবে, আর তুমি করে বলা যাবে না? আচ্ছা, ডিল ফাইনাল, আমি তোমাকে তুমি করেই বলব। কিন্তু তুমি আমাকে আপনি, ওকে?

হাসান জবাব দিলো না। অনু হঠাৎ ফিসফিস করে বলল, আমারও বিশ্বাস হচ্ছে না হাসান।

কী?

আমারও কোনোদিন নিজের একটা সত্যিকারের ভালোবাসার মানুষ হতে পারে। একটা ঘর হতে পারে।

কেন হতে পারে না?

তা তো জানি না। তবে এই এতটা কাল নিজেকে যে কী একা, নিঃসঙ্গ লাগত, কাউকে বোঝাতে পারব না। সেই একা, নিঃসঙ্গ, শূন্য মানুষটাকে তুমি কানায় কানায় পূর্ণ করে দিচ্ছ হাসান।

পারছি তো?

অনেক বেশি। আমার কল্পনার চেয়েও বেশি। আমার খুব সিনেমার মতো করে বলতে ইচ্ছে করছে, আমাকে ছেড়ে কখনো চলে যাবে না তো? কিন্তু আমার মতো কঠিন কোনো মেয়ের মুখে কথাটা খুব উদ্ভট শোনাবে। এইজন্য বলতে পারছি না।

হাসান গাঢ় কণ্ঠে বলল, কখনো যাব না।

একটা কথা কী জানো?

কী?

তুমি যত কঠিন মানুষই হও না কেন, ভালোবাসার কাছে মানুষ খুব অসহায়। একটুখানি সত্যিকারের ভালোবাসার জন্য মানুষ জীবনভর হাহাকার করে, বুকের ভেতরের কঠিন পাথরটাকেও গলিয়ে দেয়। এই ভালোবাসাটা ব্যাপারটা কেমন, জানো?

কেমন?

ধরো, তুমি কঠিন বা খুব লজিক্যাল একটা মানুষ। আশেপাশের প্রেমিক প্রেমিকাদের কাণ্ডকারখানা দেখে হাসি পায়, বা নাক সিটকায়। মনে হয়, কী সব ন্যাকামি, আদিখ্যেতা! কিন্তু সেই তুমিই যখন সত্যিকারের কারো প্রেমে পড়ে যাবে, তখন দেখবে, ওইসব আদিখ্যেতা তোমারও করতে ইচ্ছে করছে। তোমারও তাকে চুপিচুপি বলতে ইচ্ছে করছে, আমাকে ছেড়ে কখনো চলে যাবে না তো? তোমাকে ছাড়া কিন্তু আমি বাঁচব না। কী অদ্ভুত না?

হাসান হাসলো, ঠিক তাই।

বিষয়টা খুব অদ্ভুত। মানুষ এমনই বুঝেছ, খুব ভালোবাসার কাঙাল। শুধু একটু সত্যিকারের ভালোবাসার জন্য সে অপেক্ষায় জীবন কাটিয়ে দিতে পারে।

আমি জানি।

আমাকে জানো?

হু।

অনু মৃদু হেসে বলল, আমাকে ছেড়ে কখনো যাবে না তো, এটা জিজ্ঞেস করে, একটু অন্যভাবে জিজ্ঞেস করি?

কীভাবে?

আমরা কী বাকিটা জীবন একসাথেই থাকছি?

শেষ মুহূর্ত অব্দি।

যদি কখনো চলে যাও? কেন চলে যাব?

চলে যাওয়ার জন্য আসলে কারণ লাগে না হাসান, অজুহাত লাগে। আর অজুহাত সবারই থাকে।

হাসান গাঢ় কণ্ঠে বলল, আমরা একসাথেই থাকছি, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

অনু হাসলো। তার এইটুকু জীবনে এমন আনন্দময় হাসি আর সে কখনো হাসেনি।

*

তনুর সাথে আজ কথা হয়েছে শামীমের। তাকে নিয়ে কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতালে এসেছিল শামীমের মা। সেখান থেকেই শামীমের সাথে কথা হয়েছে। শামীমের গলা শুনে তনুর মনে হলো বহুকাল তেষ্টার পর কনকনে এক গ্লাস ঠান্ডা পানি পান করলো সে। শামীম বলল, তোমার গলা এমন শোনাচ্ছে কেন?

তনু বলল, তোমার গলা এমন শোনাচ্ছে কেন?

আমার গলা ঠিক আছে।

ঠিক নাই। তুমি আগে আমার সাথে কথা বলতে বাসের হেল্পারদের মতো, এখন কথা বলছ প্লেনের এয়ার হোস্টেসদের মতো।

তুমি কখনো প্লেনে চড়েছ? এয়ার হোস্টেসরা কীভাবে কথা বলে বুঝলে কী করে?

টিভিতে দেখেছি। তুমি একটা কাজ করতে পারবে?

কী কাজ?

আমার সাথে বাসের হেল্পারদের মতো কথা বলতে পারবে?

মানে কী?

মানে হলো তোমাকে আমার অচেনা লাগছে। তুমি যত খারাপভাবেই আমার সাথে কথা বলো না কেন, আমার তেমন তোমাকেই লাগবে, আগের তোমাকে।

শামীম রেগে যাওয়া গলায় বলল, ঢং করো না তো তনু, আমার ঢং ভালো লাগে না। তুমি তো আছে শান্তিতে, বুঝবে কী করে!

শামীম রাগী রাগী গলায় আরো কী সব বলে যাচ্ছিল, অদ্ভুত ব্যাপার হলো শামীমের সেই রাগী গলা শুনে তনু হাসছে। সে কিশোরী মেয়ের মতো ঝলমল করে হাসছে। শামীম ধমক দিয়ে বলল, তুমি কী পাগল হয়ে গেছ না-কি, হ্যাঁ? এ কী অভ্যাস?

তনু হাসতে হাসতেই বলল, পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম, এখন সুস্থ হয়ে গেছি।

মানে কী?

মানে হলো তোমার এই গলা না শুনতে-না শুনতে, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। এখন গলা শোনার পর সুস্থ লাগছে।

শামীম আরো একবার তনুকে ধমক দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কী ভেবে আর ধমক দিলো না। সে বলল, তোমার শরীরের কী অবস্থা?

ভালো ছিল না, এখন ভালো।

হেঁয়ালি রেখে সত্যি কথা বলো।

এখন কি বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথা বলব?

ডাক্তার ডেট দিয়েছে?

হুম, হাতে আর সময় বেশি নাই। অল্প কয়েক দিন।

আচ্ছা। তুমি টেনশন করো না, আমি তার আগেই চলে আসবো। এখানকার কাজ আমি প্রায় গুছিয়ে এনেছি।

তনু বলল, আচ্ছা। সে ফোন রাখার আগে হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। শামীম বলল, কী হয়েছে?

তনু কান্নার দমকে কথা বলতে পারল না। শামীমের বিরক্ত লাগছে। সে রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে বলল, তুমি গাধার মতো কাঁদছ কেন?

গাধা কী কাঁদতে পারে?

কথা প্যাচাবে না। কেন কাঁদছ, সেটা আগে বলো।

তনু বলল, আনন্দে কাঁদছি।

শামীম এবার চূড়ান্ত বিরক্ত হলো। সে রীতিমত চেঁচিয়ে বলল, আমার সাথে ফাজলামো করবে না। খুব তো আরামে আছ ওখানে, আর আমি এখানে খেটে মরছি, আনন্দে থাকলে ভালো লাগে না, না?

তনু কান্না থামিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর শান্ত গলায় বলল, চোখ মোছো শামীম।

শামীম ফোনটা রেখে দাঁড়িয়ে রইল, তার এখুনি চোখ মুছে ফেলা উচিত। এখন যদি দোকানে কেউ আসে তাহলে সে স্পষ্ট দেখতে পাবে যে শামীম কাঁদছে। বিষয়টা তার জন্য খুবই বিব্রতকর। কিন্তু শামীমের এই মুহূর্তে চোখ মুছতে ইচ্ছে করছে না, তার ইচ্ছে করছে কাঁদতে। বিকেলের দিকে ওয়াসিমের সাথে দীর্ঘ কথোপকথন হয়েছে শামীমের। ওয়াসিম জানিয়েছে, সে এখনো নিশ্চিত নয় যে কবে কখন ঢাকায় ফিরতে পারবে। শামীম অবশ্য এক ফাঁকে জায়েদের খুন সম্পর্কিত বিষয়টাও তুললো। পুলিশ তাকেও সন্দেহ করছে শুনে ওয়াসিম রীতিমত ক্ষেপেই গেল। সে পুলিশের। উদ্দেশ্যে ইচ্ছেমতো গালাগাল করে বলল, খুন করছে একজন, আর এখন দেখি এরা জেল খাটাবে দুনিয়ার সব মানুষজনকে। এইজন্যই এই দেশের পুলিশের উপর কোনো আস্থা নেই মানুষের, বুঝলা শামীম? আসল অপরাধীর খবর নাই, নকল লোকজন নিয়ে টানটানি।

শামীম এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। তার ফোনের রেকর্ডার অন করা, সে যতক্ষণ সম্ভব ধৈর্য ধরে ওয়াসিমকে দিয়ে এই বিষয়ক নানান কথাবার্তা বলিয়ে নিলো। ওয়াসিম অবশ্য এমনিতেও পুরো বিষয়টা নিয়েই ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে ছিল, ফলে রাগের মাথায় ঝালটা যেন শামীমের সাথেই ঝাড়লো। শামীম ফোন রেখে বার দুই লম্বা নিঃশ্বাস নিলো। সে জানে না কেন, কিন্তু তার বুক কাঁপছে। দোকান বন্ধ করে বড় রাস্তায় উঠে সে ফোরকান আলীকে ফোন দিলো।

ফোরকান আলী কোথায় আছে জেনে নিয়ে তার কাছে মেমোরি কার্ডটা জমা দিয়েই স্বাধীন হয়ে যাবে সে। তারপর শুধু মুক্ত পাখির মতো ডানা মেলে ওড়া। তার আগে অবশ্য আজমের সাথে বসে টাকা-পয়সার একটা বন্দোবস্ত করে ফেলতে হবে। শামীমের অবশ্য অত টাকার দরকার নেই। সামান্য কিছু টাকা হলেই সে খুশি। হতে পারে তা দশ বা পনেরো লাখ। এতেই তার ভালোভাবে চলে যাবে। এই টাকায় কুড়িগ্রাম গিয়ে কিছু একটা শুরু করতে পারবে সে।

আজমের সাথে তার সবকিছু ঠিকঠাকই হয়ে আছে। ওয়াসিম ধরা পড়লে পুরো ব্যবসাটাই চলে যাবে আজমের দখলে। আর ওয়াসিম যদি একবার ধরা পড়ে, তবে তার ছাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা আর নেই বললেই চলে। পুলিশের হাতেও এখন অকাট্য প্রমাণ।

ওয়াসিম যদি কোনোদিন ছাড়া পায়, তবে তা কুড়ি পঁচিশ বছরের আগে নয়, ততদিনে রাজত্ব পুরোপুরি আজমের। আজমও জানতো, এই সুযোগ বারবার আসবে না। তাছাড়া এখানে কেউ কাউকে দ্বিতীয় সুযোগ দেয়ও না। তা ওয়াসিমের জন্য যেমন সত্য, সত্য আজমের জন্যও।

ফোরকান আলীর ফোন বন্ধ। বন্ধ ফোনেও বারবার চেষ্টা করলো শামীম। যত দ্রুতসম্ভব মেমোরি কার্ডটা ফোরকান আলীর হাতে পৌঁছে দিতে চাইছে সে। তারপর টাকা-পয়সা নিয়ে কাল পরশুর মধ্যেই কুড়িগ্রাম। তনুর ডেলিভারি ডেটও এর মধ্যেই। সবচেয়ে ভালো হয় তনুর ডেলিভারির আগেই পৌঁছে যেতে পারলে। শামীম আরো একবার ফোরকান আলীর নম্বরে ডায়াল করলো। কিন্তু ফোন বন্ধই। একবার সরাসরি থানায় চলে যাওয়ার কথাও ভাবলো সে, তবে পরক্ষণেই আবার ভাবলো তার আগে আজমের সাথে একবার কথা বলে নিলে ভালো হয়।

বার দুই ফোন বাজার পর আজম ফোন ধরলো। কিন্তু কিছু একটার প্রচণ্ড শব্দে সে কথা বলতে পারল না। শামীম আরেকবার ফোন দিতেই আজম চেঁচিয়ে বলল, পরে ফোন দিতাছি, এইখানে গাড়ির শব্দে কিছু শোনা যায় না।

শামীম ফোন রেখে হেঁটেই থানার দিকে যাচ্ছিল। এই সময়ে রাস্তার পাশের টেলিভিশন শোরুমের সামনে ভিড় দেখে সে কৌতূহলী হয়ে দাঁড়ালো। শামীম ভেবেছিল টেলিভিশনে হয়তো বাংলাদেশের কোনো ক্রিকেট খেলা দেখাচ্ছে। কিন্তু কাছে যেতেই তার ভুল ভাঙলো। টেলিভিশনে খবর দেখাচ্ছে। রাস্তা ঘাটের মানুষকে এত আগ্রহ নিয়ে খবর দেখতে দেখে শামীম ভারি অবাক হলো। খানিক কৌতূহল নিয়ে মানুষের ভিড়ে সে নিজেও দাঁড়িয়ে গেল। টেলিভিশনে তখন লাইভ সংবাদ দেখাচ্ছে, গুলশানে একটি রেস্টুরেন্টে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটেছে। সেখানে একটি সশস্ত্র দল ঢুকে পড়ে দেশি বিদেশি অনেক নাগরিককে জিম্মি করে রেখেছে। তাদের কী সব দাবি-দাওয়া রয়েছে। সেই দাবি দাওয়া না মানলে, তারা সব জিম্মিকে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। হাজার হাজার পুলিশ আর স্পেশাল ফোর্সের সদস্যরা রেস্টুরেন্টের বাইরে সতর্ক অবস্থান নিয়েছে। সেনাবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ভারি যানবাহনও ছোটাছুটি করছে। অ্যাম্বুলেন্স, পুলিশের গাড়ির বিরামহীন সাইরেন। কেমন একটা যুদ্ধযুদ্ধ ব্যাপার।

.

ঘটনা বুঝতে কিছুটা সময় লাগল শামীমের। ঘটনায় পুরো দেশ মুহূর্তেই থমকে গেছে। রুদ্ধশ্বাস আতঙ্ক আর উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে দেশের প্রতিটি মানুষ। কিন্তু শামীমের ভয় তখন অন্য জায়গায়। সে দৌড়ে থানার সামনে গেল। কিন্তু পরিচিতি পুলিশ সদস্যও তার সাথে অপরিচিত মানুষের মতো আচরণ করতে লাগল। ফোরকান আলী অবশ্য থানায় নেই। তাকে জরুরি ভিত্তিতে পাঠানো হয়েছে গুলশানের ঘটনায়। শামীম এতক্ষণে ফোরকান আলীর ফোন বন্ধ থাকার কারণ বুঝতে পারল। দেশের সকল মানুষ

চরম আতঙ্ক নিয়ে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেও শামীম কোনো আগ্রহ পেল না। সে বরং রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে বাসার দিকে হাঁটা দিলো। এই ঘটনা কবে শেষ হয় কে জানে! যদি এমন হয় যে এই ঘটনা নিয়েই ফোরকান আলী ব্যস্ত হয়ে পড়ে, আর ওয়াসিমের বিষয়টা ধামাচাপা পড়ে যায়, তখন? তখন একটা বড় বিপদেই পড়তে হবে তাকে। শামীম বাসায় গিয়ে একা একা অনেক রাত অব্দি বসে রইল। আজমকে বার কয়েক ফোনও দিলো এর মধ্যে। কিন্তু আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো আজমের ফোনও বন্ধ!

দুশ্চিন্তায় সারারাত এতটুও ঘুম হলো না শামীমের। শেষ রাতের দিকে সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, আর মাত্র দুটো দিন তার হাতে আছে। এর মধ্যে যদি ঘটনার কোনো সুরাহা না হয়, তবে সে ফোরকান আলীকে না জানিয়েই চলে যাবে। যাওয়ার আগে থানায় গিয়ে ফোরকান আলীর নামে মেমোরি কার্ডটা রেখে যাবে।

পরদিন দুপুরের মধ্যে অবশ্য রেস্টুরেন্টের ঘটনা স্মরণকালের সবচেয়ে খারাপ দিকে মোড় নিলো। জিম্মিকারীরা ঊনিশজন জিম্মিকে হত্যা করেছে। তার মধ্যে বিদেশি নাগরিকই বেশি। ঘটনা নিয়ে দেশ-বিদেশে তুমুল উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। শামীম স্পষ্ট বুঝে গেল, ওয়াসিমের ঘটনা নিয়ে এখন আর কারো কোনো মাথাব্যথা থাকার কারণ নেই। এই ঘটনার রেশ চলবে আগামী কয়েকবছর। ইতোমধ্যেই বিরোধী দল এটিকে ইস্যু করে যেমন রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে শুরু করেছে, তেমনি সরকারি দলও। এই বক্তব্য-পাল্টা বক্তব্যের তোড়ে দেশে এখন ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস হয়ে গেলেও কেউ টের পাবে বলে মনে হচ্ছে না। আর ওয়াসিমের ঘটনা তো সেখানে তুচ্ছাতিতুচ্ছ!

শামীমের চলে যাওয়ার জন্যও এটি একটা সুবর্ণ সুযোগ, কেউ খেয়ালই করবে না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আজম। রাত থেকে তার ফোন বন্ধ। তার সাথে দেখা না হলে টাকা পাওয়া যাবে না। পুলিশের ভয়ে শামীম নিজের কাছে নগদ। বা ব্যাংক একাউন্টেও কোনো টাকা রাখেনি। এই টাকার জন্য শামীম আরো দুটো দিন আটকে রইল। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় ঢাকায় এলো ওয়াসিম। অবশেষে ফিরে আসার জন্য তাকে ঢাকা থেকে সবুজ সংকেত পাঠানো হয়েছে।

পরদিন ভোর রাতে শামীমের লাশ ভেসে গেল শীতলক্ষায়। ওয়াসিম সামনে দাঁড়িয়ে ঠান্ডা চোখে সিগারেট টানছিল। শামীমের দুই চোখের মাঝ বরাবর গুলি করে তাকে মেরেছে আজম। মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তেও শামীমের বিশ্বাস হচ্ছিল না আজম তাকে সত্যি সত্যি গুলি করবে। সে ওয়াসিমের পা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, ফোনের রেকর্ডটা তার কাছেই আছে, সে পুলিশে জমা দেয়নি। ওয়াসিম মেমোরি কার্ডটা হাতে নিতেই আজম তার কপাল বরাবর গুলি করলো। শামীম কেবল একবার ডাকলো, আমার হাফসা!

শামীম অবশ্য জেনে যেতে পারল না যে তার একটা পুত্র সন্তানও রয়েছে। তনু সেই পুত্র সন্তানের নাম রাখেনি, কাউকে রাখতেও দেয়নি। সে বলেছে, ছেলের নাম রাখবে ছেলের বাবা। ছেলের বাবা যতদিন না আসবে, ততদিন ছেলের নাম রাখা হবে না।

*

শামীমের খুনের খবর তেমন কেউ জানলো না। রেস্টুরেন্টের জঙ্গি ঘটনার তীব্রতায় চাপা পড়ে গেল আর সবকিছুই। তনুর সাথে অনেকদিন কোনো যোগাযোগও নেই অনুর। সে বার কয়েক ফোনও দিয়েছিল। কিন্তু তনুর ফোন বন্ধ। পুলিশের কথা ভেবে অতি সতর্কতায় শামীমকেও এতদিন ফোন দেয়নি অনু। কিন্তু তনুর জন্য খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল তার। তনুর ডেলিভারি ডেটও এতদিনে কাছাকাছি চলে আসার কথা। উদ্বিগ্ন অনু শেষ অব্দি শামীমকে ফোন। করলো। কিন্তু শামীমের ফোন বন্ধ। প্রথমে বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিলেও সন্ধ্যা নাগাদ অস্থির হয়ে উঠল সে। পরদিন হাসানের সাথে দেখা হতে ঘটনা কিছুটা বলল অনু। হাসান বলল, এক কাজ করো না কেন? পুলিশ অফিসারের সাথে কথা বলো?

সেটা কী ঠিক হবে? এমনও তো হতে পারে যে তনুকে নিয়ে ও চলে গেছে কোথাও। এমন একটা প্ল্যানও ওদের ছিল।

তাহলে তো অন্তত তোমাকে জানিয়ে যাওয়া উচিত ছিল?

হয়তো কোনো কারণে জানায়নি। পুলিশ ফোন কল ট্র্যাক করছে ভেবেও করতে পারে।

তাহলে আর কী! টেনশন করো না। কয়েকটা দিন একটু অপেক্ষা করো।

অনু অপেক্ষা করলো ঠিকই। কিন্তু কেন যেন এক মুহূর্তের জন্যও স্বস্তি পেল না। হাসানের বাসায় বিয়ের কথা অনেকটাই এগিয়েছে। তবে বাসার ঘটনায় হাসান কিছুটা অবাক হয়েছে। সে ভাবেনি তার পছন্দ নিয়ে বাবা-মায়ের এমন প্রতিক্রিয়া হতে পারে! ছোটবেলা থেকেই সে দেখে এসেছে তার বাবা-মা দুজনই প্রচণ্ড আধুনিক এবং উদারমনা। বিশেষ করে তার মা জেসমিন জেবিন। কিন্তু এই ঘটনায় দুজনের প্রতিক্রিয়াই হাসানকে বেশ খানিকটা আহত এবং বিস্মিত করেছে। যদিও শেষ অব্দি হাসানের যুক্তিতর্কের কাছে হেরে তারা বিষয়টি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু এ যেন সেই মেনে নেয়া, কিন্তু মনে নেয়া নয়।

তনুকে নিয়ে অনুর দুশ্চিন্তা যেমন হচ্ছে, তেমন আবার কিছুটা নির্ভারও লাগছে। এমনও তো হতে পারে যে ওরা নিরাপদেই কোথাও চলে গেছে। তনুও তেমনটাই চাইছিল। শেষ অব্দি হয়তো শামীমকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করে ফেলতে পেরেছিল সে।

শুক্রবার ভোরে হাসান এলো। তার পরনে কিছুটা ভারি কাজ করা অফহোয়াইট পাঞ্জাবি। অনু দুষ্টুমি করে বলল, আজই?

চাইলে আজই, শুক্রবার শুভদিন। আর কথায় আছে না, শুভস্যম শীঘ্রম?

তা আছে, কিন্তু বিয়ে যে শুভ, তার নিশ্চয়তা কী? আশেপাশে যা ঘটনা দেখি, তাতে বিয়েকে তো মনে হয় অশুভস্যম শীঘ্রম।

হাসান হাসলো, ডেটটা ফেলতে একটু সমস্যা হচ্ছে। মায়ের আর বাবার ডেট মিলছে না। এদিকে আমি চাইছি যতদ্রুত সম্ভব বিয়েটা সেরে ফেলতে।

আমাকে ওনারা দেখতে চাননি?

হুম। এর আগে কোনো একটা রেস্টুরেন্টে আমরা সবাই মিলে একদিন ডিনার করব।

অনুর কেন যেন ভীষণ লজ্জা লাগছিল। এই অনুভূতিটার সাথে সে একদমই পরিচিত না। কখনো এমন অনুভূতি তাকে স্পর্শ করতে পারবে বলেও সে ভাবেনি। মেয়েলি আবেগে পরিপূর্ণ এই তীব্র, গভীর এবং ক্রমশই সর্বপ্লাবী হয়ে ওঠা অনুভূতি সে আগে কখনো টেরও পায়নি। হাসান বলল, একটা কথা, মন খারাপ করবে না তো?

একদম না।

মা-বাবা চাইছেন না বিয়েতে বড় কোনো প্রোগ্রাম হোক। একদমই ঘরোয়া।

অনু হাসলো, আমিও তাই চাই।

কিন্তু আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

কী সিদ্ধান্ত?

আমরা বিয়েতে ইচ্ছে মতো কেনাকাটা করব, যত ইচ্ছে তত।

কেন?

কেন মানে? বিয়ে তো জীবনে একবারই করব, বারবার করব না-কি?

চাইলে করতে পারো।

হাসান হাসলো, শোনো যা বলছিলাম। আমাদের কিন্তু প্রতিদিনই একটু একটু শপিং করে রাখতে হবে। না হলে দেখবে পরে আবার ঝামেলা হয়ে যাবে। তখন দুজনের কেউই আর সময় করে উঠতে পারব না।

অনুও হাসলো, আচ্ছা।

চলো তাহলে, আজ থেকেই শুরু করে দেই।

আজই?

হুম, আজই। আজ শুক্রবার, শুভদিন। ছুটির দিনও।

হয়ত একটা চাপা কৌতূহল আর হাসানের তীব্র উচ্ছ্বাস অনুকে সেই সারাটা দিন আটকে রাখলো এই মার্কেট থেকে ওই মার্কেটে। এ দোকান থেকে ও দোকানে। রাতে ঘরে ফিরতে ভীষণ লজ্জা করছিল অনুর। সে তার রুমমেট নাবিলাকে অব্দি কিছু বলেনি। এখন দু'হাত ভর্তি এত এত জিনিসপত্র নিয়ে ঘরে ঢুকতে তার লজ্জাই লাগছে। কিন্তু অনুর ভাগ্য ভালো, নাবিলা ঘরে নেই। সে ঘরে ঢুকে তড়িঘড়ি জিনিসপত্রগুলো আলমারিতে ঢোকালো। একটা বড় সোনালি বাসো। বাসোটা রাখার আগে আরো কিছুটা বেশি সময়ই বোধহয় সে ছুঁয়ে রাখলো। লাল টকটকে শাড়িটা এই বাসোটার ভেতর। হাসান আক্ষরিক অর্থেই পাগল। সে এই একটা শাড়ির জন্য কত পাগলামিই না করলো! শেষ পর্যন্ত তারা গেল মিরপুরের বেনারশি পল্লিতে। কিন্তু সেখানে গিয়েও অনু চুপচাপ বসেই রইল। হাসান বলল, তুমি কী এমন করেই থাকবে? বলবে তো, কোনটা তোমার পছন্দ?

অনু বলল, আমি তো একবার বলেছিই, আমি খুব একটা বুঝি না।

এটা কোনো কথা হলো? তোমার বিয়ের শাড়ি আর তুমি বুঝবে না?

অনু হাসলো, আগে তো কখনো বিয়ে করিনি, বুঝবো কী করে?

বিয়েতে গিয়েছ তো? আর আজকাল ফেসবুক ভর্তি বিয়ের ছবি...। বলেই হাসান খানিক থমকালো, ওহ্, তোমার তো আবার ফেসবুক নেই। আজই একটা খুলে দেই? দেখবে কত কত মেয়েদের বিয়ের ছবি, কত কত কী!

দরকার নেই।

কেন?

এমনি। আগে নানান ঝামেলায় কখনন করা হয়নি। আর এখন ওসব ভালোও লাগে না, সম্ভবত আমি একটু ওল্ড ফ্যাশানড।

হাসান হাত জোড় করে বলল, মানছি। লেট মি ট্রাই।

হাসান নিজেই পছন্দ করে কিনলো। অনুর কাছে দারুণ লেগেছে শাড়িটি। সে ফিরতে ফিরতে বলল, তুমি কী আগে বিয়ে-টিয়ে করেছ নাকি?

কেন?

এই যে দেখে মনে হচ্ছে বউয়ের জন্য রোজ কয়েকটা করে শাড়ি কেনার অভ্যেস আছে।

হাসান হাসলো, প্রথম প্রাকটিস ম্যাচেই তো দেখছি সিলেকশন বোর্ড হেব্বি কনভিন্সড। তো আর টেনশন কী? হয়ে যাক।

*

তনুকে নিয়ে দুশ্চিন্তাটা মাথা থেকে কিছুতেই যাচ্ছিল না অনুর। পরদিন নিজ থেকেই সে থানায় গেল। ফোরকান আলী অসম্ভব ব্যস্ত। তিনি অনুকে সময় দিতে পারলেন না। বললেন পরদিন সন্ধ্যায় আবার আসতে। কিন্তু পরদিন সন্ধ্যায় হাসানের সাথে বাইরে যাওয়ার কথা ছিল অনুর। অনু শেষ মুহূর্তে এসে বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনাটা বাদ দিলো। তবে অনু বের হলো না বলে হাসানের খানিক মন খারাপই হলো। আজকের সন্ধ্যাটা তার কাছে একদমই আলাদা। আজ থেকে বছর কয়েক আগে ঠিক এই দিনটাতেই সে অনুকে প্রথম দেখেছিল। তারপর ক্রমেই বেড়েছে তার অবচেতন মুগ্ধতা। সেই দিনটির কথা ভেবেই হাসানের কিছু পরিকল্পনাও ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কিছুই হলো না।

ফোরকান আলী বললেন, আমরা খুব বাজে অবস্থায় আছি অনু। ইনফ্যাক্ট শুধু আমরা না, পুরো দেশ। সরকার দেশে-বিদেশে ভয়াবহ চাপের মুখে আছে। বুঝতেই পারছেন। ঘটনা যেটা ঘটে গেছে, সেটার ফলাফল আমাদের সবারই বহুবছর বয়ে বেড়াতে হবে।

অনু ম্লান গলায় বলল, জি, বুঝতে পারছি।

না বুঝতে পারছেন না। কারণ, বিষয়টা মিডিয়াতে নেই। সরকার চাইছে না, এটা নিয়ে মিডিয়াতে হৈ চৈ হোক। সাধারণ মানুষ আলোচনা করুক, আতঙ্কিত হোক। কারণ তাহলে বিরোধী দলও সুযোগ পেয়ে যাবে। এইজন্য এটাকে একদম আড়াল করে রাখা হয়েছে। তবে ভেতরে ভেতরে আমরা জানি কী চলছে! সবগুলো সিকিউরিটি ফোর্স দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করছে। সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় তাদের রাখা হয়েছে। গুরুত্ব বিবেচনায় খুব ইম্পর্টেন্ট নয়, এমন সব এনগেজমেন্ট থেকে ফোর্সদের সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

বুঝতে পারছি। কিন্তু এতদিন হলো, তনু আর শামীমের জন্য খুব টেনশন হচ্ছে।

ফোরকান আলী কাগজে কলমে কী একটা নোট করছিলেন। একজনকে ডেকে কাগজটা ধরিয়ে দিয়ে সেই বিষয়ে নানান ধরনের নির্দেশনা দিলেন। তারপর অনুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার বোন, কী যেন নাম? তনু, হ্যাঁ, তনু সম্ভবত ভালোই আছে। তবে শামীমকে নিয়ে আমি নিশ্চিত না।

ওরা এক সাথে নেই?

নাহ।

তাহলে?

আমি যতদূর জানি, তনুকে বহু আগেই শামীম ঢাকার বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আমাদের ধারণা ছিল সে শামীমের গ্রামের বাড়িতেই যাবে। কিন্তু তনু সেখানে যায়নি।

তাহলে কোথায় গিয়েছে?

সেটা আমরা জানি না। তবে শামীমের মা ছিলেন তনুর সাথে। আমার ধারণা, তনু যেখানেই থাক, ভালোই আছে। আসলে তনুকে নিয়ে আমাদেরও তেমন কনসার্ন ছিল না। আমরা চেয়েছিলাম শামীমকে।

কিন্তু শামীম তাহলে কই?

ফোরকান আলী কিছুটা দম নিয়ে বললেন, আমার ধারণা সে খুন হয়েছে!

অনুর মনে হলো তার পায়ের তলার মাটি কাঁপছে। সে আতঙ্কিত গলায় বলল, কী?।

আমার ধারণা শামীম, খুন হয়েছে। বেঁচেও থাকতে পারে, তবে তার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কারণ ওয়াসিম যেদিন ফিরে এলো সেদিনও শামীমকে দেখা গেছে। তারপর সন্ধ্যা থেকেই সে নিখোঁজ। আর তার সাথের যে ছেলেটা, আজম, যাকে সাথে নিয়ে শামীম নানান প্ল্যান করেছিল, তাকে দেখছি ওয়াসিমের সাথে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। শামীমকে আমি একটা কাজও দিয়েছিলাম। আমার ধারণা সেটাতেও সে ধরা পড়ে গিয়েছিল।

অনু অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না। সূক্ষ্ম কিন্তু তীব্র শীতল জলের চোরা একটা স্রোত যেন তার বুক বেয়ে নেমে যাচ্ছিল। সে কোনোমতে বলল, তাহলে ওয়াসিমের বিষয়টা?

ফোরকান আলী বললেন, দেখুন অনু, নানাসময়ে পুলিশদের নানারকম দোষ দেয়া হয়। কিন্তু পুলিশের আসলে করার থাকে কতটুকু? এই যে ওয়াসিমের ঘটনাটাতেই দেখুন, আমি কী আমার চেষ্টার কমতি রেখেছিলাম? আমার উপরেও কিন্তু নানা দিক থেকে প্রেসার কম ছিল না। কিন্তু তারপরও আমি চেষ্টা কম করিনি। সমস্যা হচ্ছে জায়েদের খুনের বিষয়টি এখন আর কারো কাছেই তেমন গুরুত্ব বহন করে না। সবার সামনেই এখন এর চেয়ে বড় ইস্যু চলে এসেছে। জায়েদের ইস্যু দিয়ে তার দল সরকারকে নাড়াতে পারত না। হয়তো এলাকাভিত্তিক পলিটিকসে সামান্য একটু ঢেউ তুলতে পারত। কিন্তু তাদের সামনে এখন জাতীয় ইস্যু। এটিকে তারা ঠিকঠাক ধরতে পারলে তাদের জন্য বিশাল বড় সুযোগ। সো তারাও আর জায়েদের বিষয়টাকে গুরুত্ব দেবে না। ইনফ্যাক্ট, সেটা আর নেইও।

তাহলে শামীম? শামীমের...।

ফোরকান আলী হাত তুলে অনুকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, শুনুন, শামীমের বিষয়টা নিয়ে মামলা করবে কে? আপনি? কিসের মামলা করবেন, খুনের? না কি গুমের? তারপর দেখুন, সে ইনভলভ ছিল ড্রাগস বিজনেসের সাথে। আর মাদক সংক্রান্ত মামলাগুলোর মধ্যে ইয়াবা কিন্তু এইসময়ের সবচেয়ে সেনসিটিভ বিষয়। সো, এই বিষয়টাও তখন উঠে আসবে। আর এটা হলে তা বরং আপনার জন্যই সবচেয়ে খারাপ হবে। আপনি ভালো করেই জানেন, এখানে আসলে খুব একটা কিছু করার নেই।

*

পরের কয়েকটা দিন থম ধরে বসে রইল অনু। একবার মনে হলো বিষয়টা নিয়ে ছোটবোন বেনুর সাথে কথা বলে। কিন্তু বেনু তার স্বামী আরিফুলকে নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তায় আছে। আরিফুলের গ্রিসের সমস্যার সমাধান এখনো হয়নি। এরমধ্যে তাকে আর অতিরিক্ত দুশ্চিন্তায় ফেলতে চাইলো না অনু। এদিকে হাসান বিয়ের ডেট কনফার্ম করে ফেলেছে। এই নিয়ে অনু অবশ্য কিছু বলতে পারল না।

সে জানে, এই ডেট নিয়েও হাসানকে অনেক ঝক্কি ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। এখন সে যদি আবার কিছু বলে, তবে সেটি হবে সবচেয়ে বাজে ব্যাপার। অনুর পক্ষ থেকে কাকে কাকে বিয়েতে বলবে অনু? আজিজুল মিয়া আর তার পরিবার। বড় চাচা-চাচি, মামা-মামি, এদেরকে কী বলবে সে? অনু সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। কিংবা অদিতি আর তোহা ইকরামকে? তারা কী। আসবেন? অনুর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে শুনে অদিতির অবশ্য খুশিই হওয়ার কথা। তার স্বামীকে নিয়ে দুশ্চিন্তা থেকে সে হয়তো মুক্তি পাবে। অনুর সত্যি সত্যিই নিজেকে বড় একা মনে হতে লাগল। জীবনের এই অনন্য, এই সবচেয়ে আনন্দময় মূহূর্তটিতেও স্রেফ পাশে বসে থাকার জন্যও একজন মানুষকেও সে খুঁজে পাচ্ছে না!

আজ মা থাকলে কী করতো? কিংবা অয়ন? অনু দীর্ঘসময় চুপচাপ বসে থাকল। সে বার কয়েক একা একা চোখ বন্ধ করে যেন ভাবতে চাইলো। কিন্তু কিছুই ভাবতে পারল না। বিয়ে মানে রং, রঙের ভেতর আনন্দ, সেই রং আর আনন্দে মা থাকবে না, অয়ন থাকবে না, তনু, বেনু কেউ থাকবে না! এমন কেমন নিঃসঙ্গ জীবন তার! এমন একা কেন সে!

অনু বিছানার তলা থেকে অয়নের নোটবুকটা টেনে নিলো। বুকে চেপে বসে রইল কিছুক্ষণ তারপর অয়নের উপর খুব অভিমান হতে লাগল। এই নোটবুটার কোথাও অয়ন তাকে নিয়ে কিছু লেখেনি, কিচ্ছু না! কী এক আশ্চর্য অভিমান নিয়ে অনু নোটবুকটার পাতা উল্টাতে থাকল। অয়ন কী সত্যিই তাকে নিয়ে কিছু লেখেনি?

অনু একের পর এক পাতা উল্টাতে থাকল। নুহাকে নিয়ে আরো কত কত কিছু লিখেছে অয়ন! মাকে নিয়ে লিখেছে, তনু, বেনু, হাফসা এমনকি শামীমকে নিয়েও লিখেছে। কিন্তু এই নোটবুকের কোথাও কী সে নেই?

অনু তাকে পেল। নোট বুকটার একদম শেষের বেশ কিছু পৃষ্ঠা আগে অয়ন বড় বড় করে লিখে রেখেছে কাজলা দিদি। তারপর লেখাটা আবার কেটেও দিয়েছে সে। কেটে দিয়ে নিচে লিখেছে

মা বলতো, কাজলা দিদিটা না-কি ভাইটাকে খুব আদর করতো। ছোটবেলায় বাংলা বইতে কবিতাটা ছিল, বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই, মাগো আমার শোলক বলা কাজলা দিদি কই? সেই থেকে কবিতাটা পড়লেই আমার বড়পুর কথা মনে হতো।

আমি মনে মনে বলতাম অনুদি। মাকে বলতাম, মা, এত ডাকলেও কবিতার কাজলা দিদিটা আর আসে না কেন? মা বলতো, দিদিটা তো আর নেই। আমি বলতাম, কেন? বাঁশবাগানের ভেতর লুকিয়ে আছে? মা বলতো, না, দিদি মরে গেছে। সেই থেকে বড়পুকে আমি আর কখনো দিদি বলে ডাকিনি। মনে মনেও না। আমার খুব ভয় হতো, দিদি বলে ডাকলে যদি কবিতার কাজলা দিদির মতো বড়পুও মরে যায়!

স্কুলে একদিন বাংলা স্যার মাকে ডেকে বললেন, আপনার ছেলে এ কী করেছে? মা বলল, কী করেছে? স্যার বাংলা বই খুলে মাকে দেখালেন, আমি কাগজে আঠা লাগিয়ে বইয়ের সব দিদি শব্দগুলো ঢেকে দিয়েছি। কাজলাদিদি কবিতার নামটাও। মা আমাকে খুব বকাঝকা করলেন। বাসায় এসে বললেন, এমন করলি কেন? আমি মাকে কিছু বলিনি। আমার নিজের কথা কাউকে বলতে ভালো লাগে না। আমার সেইদিন থেকে কেবল ভয় হতো, খুব ভয়, কাজলা দিদি শব্দটা থাকলে বড়পুর সত্যি সত্যি যদি কিছু হয়ে যায়! বড়পুর কিছু হয়ে গেলে বড়'পুকে ছাড়া আমি কী করে থাকব!

সত্যিই তো, বড়পুকে ছাড়া আমি কী করে থাকব! আমার আজকাল মনে হয়, আমি আসলে মরে যেতে ভয় পাই না। আমি বড়পুকে ছাড়া থাকতে ভয় পাই। আমার আরো একটা জিনিস মনে হয়, আমার মনে হয়, আমি এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি যে মানুষটাকে ভালোবাসি, সেই মানুষটা হচ্ছে বড়পু। এমনকি মা'র চেয়েও একটু বেশি।

আচ্ছা, মরে গেলে কী আমি সত্যিসত্যিই আর কখনো বড়পুকে দেখতে পাব না?

আমি মরে গেলে বড়পু কী করবে? আমার ধারণা বড়পু কিছুই করবে না। এমনকি কাঁদবেও না। একমাত্র সে-ই চুপচাপ কোথাও গিয়ে একা একা বসে থাকবে।

আমার আরো একটা ধারণা। আমার ধারণা, আমি মরে গেলে বড়পু আমাকে দেখতেও আসবে না। মৃত আমাকে দেখলে আমার লাশের ছবিটা বড়পুর মাথায় গেঁথে যাবে। সে সারাজীবন আর সেই লাশের ছবিটা মাথা থেকে তাড়াতে পারবে না। তার চেয়ে জীবিত আমার ছবিটা নিয়েই সে বেঁচে থাকতে চাইবে।

বড়'পুকে মাঝেমধ্যে আমার বড় কোনো নদীর মতো মনে হয়। না ঠিক নদী না, হিমালয়ের মতো। সত্যি সত্যি হিমালয়ের মতো। অতবড় একটা মানুষ আর ঠিক অমন ঠান্ডা। অমন শান্ত, শীতল, স্থির। এইজন্যই বড়পু ক্ষয়ে গেলেও বোঝা যায় না। অতবড় হিমালয় ক্ষয়ে গিয়ে যদি আস্ত একটা সমুদ্রও নেমে আসে, তারপরও কী তাকে দেখে বোঝা যায়? যায় না। এইজন্য বড়পুর কান্নাও বাইরে থেকে বোঝা যায় না।

বড়পু যে কখনোই কাঁদে না, এটা সবাই দেখে। কিন্তু সে যে কতটা ক্ষয়ে যায়, তা কেউ দেখে না।

আমার একটা অদ্ভুত বিদঘুটে ইচ্ছে হচ্ছে। আমার মৃত্যুর পর বড়পু যখন একা একা চুপচাপ বসে থাকবে, তখন আমি যদি গিয়ে একটু ওর পাশে বসে থাকতে পারতাম! ও আমাকে দেখতে পাবে না। কিন্তু আমি ঠিকঠিক ওকে দেখতে পাবো। তারপর আলতো করে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেবো। ও আমার হাতের স্পর্শ টের পাবে না। কিন্তু কিছু একটা টের পাবে, সেই কিছু একটা ওকে ঝরঝর করে কাঁদিয়ে ফেলবে। আমি চাই, ও কাঁদুক, অনেক কাঁদুক। এত কান্না বুকের ভেতর চেপে রেখে বেঁচে থাকা যে কী কষ্টের! কী ভয়ানক কষ্টের!

অনু হঠাৎ আবিষ্কার করলো তার চোখে বেয়ে টুপ করে এক ফোঁটা জল পড়লো পাতাটার উপর। তারপর আরেক ফোঁটা, তারপর আরেক ফোঁটা। তারপর পড়তেই থাকল। অয়নের লেখার কালো অক্ষরগুলো ভিজে আরো কালো হয়ে যেতে থাকল, আরো বেশি স্পষ্ট। কিন্তু অনু তারপরও সেই স্পষ্ট অক্ষরগুলো আর পড়তে পারল না। সে জানে না, চোখ এমন ঝাপসা হয়ে গেলে মানুষ পড়ে কী করে?

*

সেদিন সন্ধ্যার পর থেকে হাসান যেন খানিক মন খারাপই করেছিল। অনু বার কয়েক জিজ্ঞেসও করেছিল। কিন্তু কিছু হয়নি বলে প্রতিবারই এড়িয়ে গেছে সে। গতকাল সন্ধ্যায় অবশ্য একরকম চেপে ধরেই হাসানের কাছ থেকে কথাটা বের করে নিয়েছে অনু। আর সেই থেকে ভেতরে ভেতরে সূক্ষ্ম একটা অপরাধবোধও কাজ করছিল তার। এই ছেলেটা বছরের পর বছর কী নীরবে, কী গভীর নিবেদনে অপেক্ষা করে গেছে। অথচ তার বিনিময়ে কী করেছে অনু? কিছুই না। বরং এখনো যা কিছু ঝড়ঝাপ্টা আসছে, যা কিছু এলোমেলো করে দিতে চাইছে তাও সে ওই একা হাতেই সামলাচ্ছে।

অনু মনে মনে ঠিক করে ফেলল, যেভাবেই হোক হাসানকে আজ সে চমকে দিবেই। ভেতরে ভেতরে শামীম আর তনুকে নিয়ে সে যতই উদ্বিগ্ন থাকুক, যতই এলোমেলো থাকুক, হাসানকে তা আর একটুও বুঝতে দিবে না। হাসানকে সে আর মন খারাপ করে থাকতে দিবে না। অন্তত তার কারণে তো নয়ই।

পরদিন শুক্রবার। অনু সকাল সকাল হাসানকে ফোন দিয়ে বলল, একটা কাজ করতে পারবে?

কী কাজ?

তুমি এখন আমার হোস্টেলের সামনে না এসে সন্ধ্যার দিকে ধানমন্ডি সাতাশ নম্বর আসতে পারবে?

কখন?

সন্ধ্যায়। বেঙ্গল আর্ট গ্যালারিটা আছে, ঠিক ওটার সামনে থাকবে। সন্ধ্যা ছটায়।

সন্ধ্যায় কেন?

একটু কাজ আছে। আমি এখন যাচ্ছি। তুমি ওখান থেকে আমাকে তুলে নিও।

হাসানের ভারি মন খারাপ হলো। আজকের দিনটা নিয়েও তার নানান রকম পরিকল্পনা ছিল। তাছাড়া হাতে সময়ও বেশি নেই, এখনো বহু কাজ বাকি। বাবা-মায়ের সাথে অনুকে একদিন দেখাও করাতে হবে।

সেই সারাটাদিন নিজের ঘরে গুম হয়ে বসে রইল হাসান। সন্ধ্যাবেলা ইচ্ছে করেই একটু দেরি করে এলো সে। কিন্তু এরমধ্যে অনু তাকে একবারের জন্যও ফোন দিলো না। এমনকি বেঙ্গল আর্ট গ্যালারির গেটেও সে কাউকে দেখতে পেল না। হাসানের এবার ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। সে একা একা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শেষে অনুকে ফোন দিলো। অবাক ব্যাপার হচ্ছে, অনু তার

ফোনও ধরলো না। হাসানের এবার মন খারাপের বদলে রাগ লাগতে লাগল। প্রচণ্ড রাগ। তার ইচ্ছে হচ্ছিল অনুকে রেখেই সে চলে যায়। অনু আসলে আসুক, না আসলে না আসুক।

অনু এলো তার কিছুক্ষণ বাদেই। হাসান অবশ্য অনুকে দেখে প্রথমে চিনতে পারেনি। সন্ধ্যাবেলা সাতাশ নম্বরের রাস্তাটাতে খুব ভিড়। সাইসাই করে গাড়ি চলে যাচ্ছে। সেই গাড়ির ভিড়ে এক তরুণীকে সতর্ক ভঙ্গিতে রাস্তা পার হতে দেখা গেল। তরুণীর পরনে বিয়ের লাল শাড়ি। সে রাস্তার উল্টো পাশের বড় বিউটি পার্লারটা থেকে যত্ন করে সেজে এসেছে। ল্যাম্পপোস্টের হুলুদ আলোয় তাকে লাগছে পরির মতো সুন্দর। তরুণীর হেঁটে আসার ভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছে, সে শাড়িতে খুব একটা অভ্যস্ত নয়। এমনকি তার চারপাশ থেকে অসংখ্য চোখ যে তাকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে, তরুণী সেটিও বুঝতে পারছে। এই ব্যাপারটি তাকে আরো আড়ষ্ট করে ফেলছে।

হাসানের বুঝতে সময় লাগল যে মেয়েটি অনু। যতক্ষণে সে বুঝতে পারল, ততক্ষণে তার রাগ বাষ্প হয়ে কোথায় উড়ে গেল! অনু বলল, চলো, আমরা আশেপাশে কোথাও খাই।

হাসান সম্মোহিতের মতো বলল, চলো।

তারা একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে দীর্ঘসময় নিয়ে খেলো। রেস্টুরেন্ট থেকে বের হতে হতে রাত প্রায় ন'টা। হাসানের একটুও যেতে ইচ্ছে করছিল না। সে রেস্টুরেন্ট থেকে বের হতে হতে বলল, চলো না, আরো কিছুক্ষণ থাকি।

কোথায় থাকবে?

হাসান খানিক ভাবলো। তারপর বলল, চলো, হাতিরঝিলের দিকটাতেই যাই। ভালো লাগবে।

অনু বলল, রাত হয়ে গেছে এমনিতেই। বেশি দেরি হলে কিন্তু হোস্টেলে ঢুকতে পারব না। যদিও আজ একটু অনুমতি নিয়েই এসেছিলাম।

সমস্যা নেই, দেরি হবে না। আর দুয়েকদিন তো একটু দেরি হতেই পারে, পারে না?

অনু হাসলো, অবশ্যই পারে।

তাদের হাতিরঝিল পৌঁছাতে সময় লেগে গেল অনেক। আজকাল শুক্রবার বিকেল থেকে কী এক অসহনীয় জ্যাম শুরু হয় রাস্তায়! অনু বলল, রাত হয়ে গেছে কিন্তু অনেক।

হাসান একটা অন্ধকার আর নির্জন জায়গা দেখে বসলো। তারপর অনুর গলার কাছটায় ঠোঁট চুঁইয়ে বলল, হোক।

অনু কেমন শিউরে উঠল। হাসান বলল, বিয়ের শাড়িটা আগেই পরে ফেললে?

ইচ্ছে হলো যে!

এখন? বিয়ের দিন কী পরবে?

আরেকটা কিনে দিও।

হাসান হাসলো। অনু আচমকা আকশের দিকে আঙুল তুলে বলল, ওই যে দেখো?

কী?

আকাশ জুড়ে কত কত তারা।

সে তো রোজ দেখি।

শুধু তারা দেখো। কিন্তু আর কিছু কী দেখো?

আর কী দেখবো?

ওই অজস্র, অসংখ্য তারার ভিড়েও প্রত্যেকটা তারা যে কী ভীষণ একা, কী ভীষণ নিঃসঙ্গ?

হাসান অবাক চোখে অনুর দিকে তাকালো। অনু বলল, আমার নিজেকে সারাটা জীবন ওই নক্ষত্রগুলোর মতো নিঃসঙ্গ মনে হতো, ভীষণ একা মনে হতো।

নক্ষত্ররা নিঃসঙ্গ হবে কেন? ওরা তো সংখ্যায় অসীম!

অনু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হাসানের কাঁধে মাথা রাখলো। তারপর বলল, কিন্তু ওই নক্ষত্রগুলো আসলেই ভীষণ নিঃসঙ্গ।

কীভাবে?

আমরা এত দূর থেকে দেখি তো, তাই বুঝতে পারি না। ওই একেকটা নক্ষত্রের মাঝে যে কী অসীম দূরত্ব, আমরা কল্পনাও করতে পারি না। অনেকটা মানুষের মতোই। আমরা একে অন্যের থেকে এত দূরে থাকি যে পরস্পরের নিঃসঙ্গতা বুঝতে পারি না।

হাসান হঠাৎ দু'হাতে শক্ত করে অনুকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর বলল, এখনো নিঃসঙ্গ মনে হয়?

উঁহু, তুমি সেই নিঃসঙ্গতাকে কানায় কানায় পূর্ণ করে দিয়েছ।

অনু সামান্য থেমে গাঢ়, গভীর, উষ্ণ কণ্ঠে বলল, একটা কথা বলব হাসান?

হাসান তাকালো, বলো?

আমি খুব একা একটা মানুষ, আমাকে ছেড়ে কখনো যেও না?

হাসান হাসলো, কক্ষনো না।

সত্যি তো?

একদম সত্যি।

হাসান তার হাতের মুঠোয় শক্ত করে অনুর হাত চেপে ধরে রাখলো। অনু আচমকা হাসানের কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে গিয়ে বলল, আমি তোমাকে ভালোবাসি হাসান, আমি তোমাকে অসম্ভব ভালোবাসি।

তারা বসে রইল আরো কিছুক্ষণ। ততক্ষণে রাত বেড়ে গেছে। হাতিরঝিলটা ক্রমশই নির্জন হয়ে উঠছে। মাঝেমধ্যে কেবল বেপরোয়া গতিতে দুয়েকটা গাড়ি হুশহাশ ছুটে যাচ্ছে। ঠিক এমনই সময় একটা গাড়ি ধীরে এসে তাদের পেছনে থেমে দাঁড়ালো। অনু আর হাসান তখনো গাড়িটাকে লক্ষ্য করেনি!

.

রাত তখন দু'টা। ওয়াসিমের কোচিং সেন্টারের উপরতলার অসমাপ্ত ঘরগুলোর একটাতে অনু বসে আছে। তার সামনে বসে আছে ওয়াসিম। ওয়াসিম বলল, তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে অনু।

অনু ওয়াসিমের কথার জবাব দিলো না। সে তাকিয়ে আছে মাথার উপরের একশ ওয়াটের হলুদ বাটার দিকে। বাল্বটা ঘিরে অসংখ্য পোকামাকড় ঘুরছে। একটা দশাসই আকৃতির টিকটিকি সেই পোকামাকড়গুলোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওয়াসিম বলল, তোমাকে কতটা সুন্দর লাগছে জানো?

অনু যেমন বসেছিল তেমন বসেই রইল। তাকে দেখতে লাগছে নির্বিকার, ভাবলেশহীন, চোখজুড়ে নিপ্রাণ শূন্য দৃষ্টি।

ওয়াসিম বলল, তোমাকে বিয়ে করে ফেলার মতো সুন্দর লাগছে অনু। আমার মনে হচ্ছে, আমি এখুনি কাজি ডেকে তোমাকে বিয়ে করে ফেলি। কিন্তু আমার ধারণা, আমার মতো খারাপ মানুষকে তোমার বিয়ে করতে ভালো লাগবে না।

ওয়াসিম চোখ বন্ধ করে লম্বা টান দিলো সিগারেটে। তারপর মুখভর্তি গলগলে ধোয়া ছেড়ে বলল, তোমাকে আমার খুনও করে ফেলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সেটা আমি করব না। খুন করে ফেললে তো সব শেষ। আমি তোমার শেষ দেখতে চাই না। শেষের আগ পর্যন্ত দেখতে চাই।

ওয়াসিম তার হাতের সিগারেটটাতে শেষ টান দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। তারপর বলল, শামীমের এত সাহস আর বুদ্ধি কোত্থেকে হলো অনু? তোমার থেকে? এত সাহস আর বুদ্ধি তোমার? দেখি, কোথায় কোথায় আর কী কী লুকিয়ে রাখছ? আজ সব খুঁজে খুঁজে বের করব।

.

দু'দিন বাদে ঠিক ফজরের আজানের পরপর অনুকে রেখে যাওয়া হলো তার হোস্টেলের সামনে। অনু ফুটপাতে চুপচাপ বসে রইল। তার পাশেই বড় একটা ডাস্টবিন। ডাস্টবিনে অজস্র ছিন্নমূল মানুষ জিনিসপত্র খুঁজছে। একটা কুকুর অনুর গা ঘেঁষে চলে গেল। তারপর ডাস্টবিনে মুখ ডুবিয়ে খাবার খুঁজতে লাগল। কতগুলো কাক একটানা কা কা শব্দে জানান দিতে লাগল কর্মব্যস্ত ঢাকার আরেকটা দিন শুরুর। অনুর কেবল কোনো কাজ নেই। সে নীরব নিস্তব্ধ একা বসে রইল। সময় বয়ে যাচ্ছে অনন্তে। সেই অনন্ত সময়ের বুকের ভেতর থেমে আছে অনু। তার এই থেমে থাকা অন্তহীন কে না কে জানে!

তখন সূর্য উঠছে দেয়ালের ফাঁক গলে। সূর্যের রং লাল।

.

পরিশিষ্ট : কিছু গল্প এমন নয়, সেই গল্পগুলো হয়তো সুন্দর। কিছু গল্প এমন, অসুন্দর। কিছু গল্পে এরপরও হাসানরা ফিরে আসে, কিছু গল্পে আসে না। তবে ওয়াসিমদের গল্পগুলো এমনই, তারা বারবার ফিরে আসে। আর তাদের সেই ফিরে আসার গল্পে বারবার ফিরে আসে অনুরাও। সেই অনুদের কেউ কেউ কোনো একদিন হয়তো এই গল্পটাকে বদলে দেবে। বদলে দেয়া সেই অনুদের গল্পের শেষটা হবে ভীষণ সুন্দর। সেখানে অনুদের বুকের ভেতর জমে থাকা দহনের ক্ষতজুড়ে টুপটাপ ঝরে পড়তে থাকবে মায়ার শিশির। সেই শিশিরের শব্দে ডুবে যাবে আর সব কোলাহল। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে ঠিক পাশ বালিশটাতে তাকালেই দেখা যাবে জোছনার ছায়া। সেই ছায়ার

ভেতর মায়া হয়ে তাকিয়ে থাকবে একজোড়া চোখ। সেই চোখের ভেতর মন। মনের ভেতর মানুষ। সেই মানুষের নাম হবে ভালোবাসা। আর সেই ভালোবাসায় ডুবে রইবে অনুদের জীবন ও জগত।

ইবুক প্রস্তুতকারক
বইয়ের নামঃ নিঃসঙ্গ নক্ষত্র
লেখকঃ সাদাত হোসাইন
ভাষাঃ বাংলা
বইয়ের ধরণঃ উপন্যাস
প্রকরনঃ ইপাব (epub), মোবি(mobi)
ই-বই তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ